তাপসীর প্রেম

প্রভাত চট্টোপাধ্যায়

॥ জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ॥
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৬৪

মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রচ্ছদপট : পূর্ণেন্দু পত্রী

১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯, জাতীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে এস, দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৮০, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪, শতাব্দী প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড হইতে শ্রীমুরারিমোহন কুমার কর্তৃক মুদ্রিত।

সহধর্মিনী বিভারাণীকে

"জীবনে যে ব্যক্তি কোনো বড় দুঃখ পেয়েছে অথচ সেই দুঃখের দ্বারা যে কোনো সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পায়নি, জগতে যার কোনো অধিকার বেড়ে যায়নি, সে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য কেননা সে মূল্য দিয়েছে, অথচ সেই মূল্যের পরিবর্তে তার যা প্রাপ্য সেইটি সে গ্রহণ করল না, ফেলে রেখে গেল। দুঃখ তার পক্ষে কেবল মাত্র দুঃখই, কেবল মাত্র ক্ষতি।

আমাদের কাছে জীবনের যেমন দাবী আছে, মৃত্যুরও তেমন দাবী আছে। যাদের আমরা ভালবাসি তারা যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন আমরা তাদের সেবা করি, সেই সেবার অর্থই ত্যাগ করা, নিজের সুখ নিজের আরামকে ত্যাগ করে আনন্দিত হওয়া। এমনি করে জীবিত প্রিয়জনের জন্য আমরা প্রতিদিন নিজেকে নিজে খর্ব করি; এইরূপে জীবন যেমন আমাদের কাছে প্রতিদিন অল্প অল্প করে ত্যাগ গ্রহণ করে, মৃত্যু তেমনই আমাদের কাছ থেকে সকলের চেয়ে বড় ত্যাগ একেবারে গ্রহণ করে—চরম ত্যাগ, প্রেমের সর্বস্ব বিসর্জন। জীবনে আমরা যা ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করি, উৎসর্গ করি, তা যদি আমাদের প্রিয়জনের মঙ্গলের কারণ হয়, তবে তার মৃত্যু উপলক্ষে আমরা যে এত সাধ একেবারে বিসর্জন করি সে কি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে? ব্যর্থ হয় যদি এর সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধ ঘটে।"

—**রবীন্দ্রনাথ**

[১]

রৌদ্রক্লান্ত পৃথিবী। বৃষ্টিহীন নীল আকাশের নীচে নিরস প্রকৃতি। মহুয়া আর শাল গাছের মধ্যে আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথ। পথে লোক নাই। বহুদূরে এক বাউল তার একতারাটি হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরছে। হঠাৎ একটা কাল মেঘ আকাশে দেখা দিল। নীড় প্রত্যাগামী বলাকার দল পক্ষ সঞ্চালনে উড়ে যায়।

দেখতে দেখতে কাল মেঘে আকাশ ছেয়ে অন্ধকার করে আসে। বিভ্রান্ত বলাকার দল সুর করে চীৎকার করে ওঠে। ঝড়ের প্রতিকূলেও পক্ষ সঞ্চালন করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইনকটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওদের প্রচেষ্টায় ওদের কণ্ঠে—ওরে বিহঙ্গ এখনি অন্ধ বন্ধ করোনা পাখা। বাউলের একতারায় শীর্ণ আঙ্গুল কটা নিস্‌পিস্‌ করে ওঠে। বৃষ্টির শব্দে, ঝড়ের দাপটে একটি তারে জেগে ওঠে সাতটি ঘুমন্ত সুর—আর আকাশে বাতাসে ওঠে সাত সাগরের ঢেউ—প্রকৃতির উদাত্ত সংগীত।

বৃষ্টির জলেও বাউলের পা চলে। গলায় চলে গুন্‌গুন্‌ গান। বৃষ্টির জলে ভিজে ভিজে গেরুয়া রঙের আলখাল্লাটা গায়ে এঁটে বসে যায় ওর। ঘণ্টা-দুয়েক পরে বৃষ্টি থেমে যায়—চলাও যায় থেমে। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন পরিপূর্ণভাবে পৃথিবীতে নেমে এসেছে। পথে ঘাটে জল দাঁড়িয়েছে। মত্ত দাদুরী একঘেয়ে সুরে সম্বর্দ্ধনা জানায় নববর্ষাকে। মাঝে মাঝে কড়্‌ কড়্‌ শব্দে বিজলী চমক দেয়। বৃষ্টির শেষে আরও গাঢ় হয়ে উঠেছে অন্ধকারটা। ঠাণ্ডা বাতাস এসে পড়ে—ভিজে আলখাল্লার ভিতর পথযাত্রী বাউল ঠক্‌ঠক্‌ করে কেঁপে উঠল। এই শীতে একটা বিড়ি হ'লে হ'ত। থলি থেকে একটা বিড়ি আর দেশালাই বার করল। প্রতিটি আঘাতে কাঠির মাথার বারুদ খসে-খসে পড়ল। বাক্সের মাথার ফসফরাসটা উঠে

গেল, তবু জ্বলল না। বিদ্যুতের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠল রাস্তাটা। কড়্-কড়্ শব্দে চমকে উঠল—সামনের রাস্তা ছেড়ে বাউল গ্রামে ঢুকল। ছোট গ্রাম, কিন্তু সমৃদ্ধিশালী। বিদ্যালয় না থাকলেও বিদ্যার চর্চা রাখে। দাদুরীর ইমন রাগিণীর ঘ্যাং-অর-ঘ্যাং সুর ছাপিয়েও বি, এ পরীক্ষার্থী সুধীরের পড়ার শব্দ ভেসে আসে। বাউল যতই এগিয়ে চলে ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে নজরুল কবিতার ছন্দ। সুধীর তারস্বরে পড়ছে:

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার

বাউল দাঁড়িয়ে পড়ে। মনের প্রতিটি তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এই লাইন কটা বিচিত্র সুরে, বিচিত্র ভাবে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। কোন্ বিস্মৃতির যুগে তার মন ফিরে যায়। তার জীবনতরীও ভাসতে ভাসতে কোথায় এসে পড়েছে। সামান্য হুঁশিয়ারীর অভাবেই আজ সবই সে হারিয়েছে। রাতের একতারাটিই তার সম্বল।—তাই হয়তো চেয়েছিল; কিন্তু পেয়েই বা কি হ'ল?—সে যা চেয়েছিল ঠিক তাই কি সে পেয়েছে? তার মনে পড়ে সে তার বন্ধুকে লিখেছিল: সমাজ ও সংসার তার ভাল লাগছে না। তার এই ক্লান্ত মন চাইছে—এক টুকরো নীল আকাশ, উদার প্রান্তর, একজন বাউল, হাতে তার একতারা। আর সে!

যদিবা কিছু মিলেছে, মনটা পালটেছে। মন যেমনটি চেয়েছিল তেমনটি পায়নি, বা গ্রহণ করতে পারেনি। বাউল সে নিজেই। সংসার ছাড়লেও সমাজের আওতায় সে এখনও। একতারা সেদিনের সুর তুলতে অক্ষম—জীবন তার ব্যর্থ! তার মুখ দিয়ে সেই কবিতারই একটা লাইন বেরিয়ে পড়ল—

ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান।

অন্ধকার বিদীর্ণ করে চমকে উঠল বিদ্যুতের আলো। কড়্কড়্ শব্দে যেন ভেঙে পড়ল আকাশ। একটা গোসাপ তার পায়ের উপর দিয়ে ছুটে গেল।

আবার বৃষ্টি নামল। বাউলের স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল। আবার শুনতে পেল সুধীর সুর করে পড়ছে:—

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান?

বাউল ক্ষণেক চিন্তা করে কি করবে!—ঝরঝর বরষায় সে ঝপ্-

ঝপ্ পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাবে, না কারু ঘরে এখানেই ঠাঁই নেবে একটু এক রাত্রির মতো। বৃষ্টির ধারা মাথায় এসে পড়ছে। দু'একটা ব্যাং পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সমস্যা সমাধানের পূর্বেই সুধীরের পাঠাগারে উপস্থিত হ'ল।—গ্রামে ঢুকতে সুধীরের ঘরটাই প্রথমে চোখে পড়ে। পিছনেই এ ঘরটার লাগাই ওদের বেড় বাড়ি। বাউল দরজায় দাঁড়িয়ে তারে দেয় ঘা। আঙুলের আঘাতে তারটা সুরে সুরে কেঁপে উঠল।

সুধীর মাথা তুলে বলল—কে, বাবাজী ?

—হ্যাঁ, একবার দেশালাইটা দাও তো।

দেশালাইটা ছুড়ে দিয়ে বলল—বিড়ি দেব কি ?—বড় ভিজে গেছ যে !—আজ এখানেই থেকে যাও, আর যেতে হবে না এই দুর্যোগে।

বাউল মিষ্টি হেসে বলল—থাকবো বলেই ত এসেছি, ভাই। হাত বাড়িয়ে বিড়িটা নিয়ে বলল—এখানে থাকলে তোমার পড়ার কোন অসুবিধে হবে না ত ?

সুধীর হেসে বলল—আচ্ছা পাগল যা হোক তুমি!—চা খাবে ? তাড়াতাড়ি ষ্টোভ জ্বেলে জল তাততে দিল খানিকটা। চায়ের আসবাব-পত্র সব জোগাড় করে নিয়ে সদ্যস্নাত সিক্ত কলেবর বাউলের দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠল—দেখ মজা, তুমি বেশ ভিজে গেছ, খেয়াল পর্যন্ত করিনি।—শীতে কাঁপছ তবু নিজেও তো একটা শুকনো কাপড় চেয়ে নাও নি! আলনা থেকে একটা লুঙ্গি দিয়ে বলল—নাও ছেড়ে ফেল। গেরুয়ার বদলে লুঙ্গি! একটু হাসল। বাউল কাপড় ছেড়ে বসল। সুধীর চা-টা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—এবার একটা গল্প বল।—একটা সিগারেট নেবে ? প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট দিল। নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে বাউলের মুখের সিগারেটা ধরিয়ে দিয়ে বলল—কই বাবাজী, বলছ না যে ?

—কি বলবো, ভূত প্রেতের ? কিন্তু তাও ত চোখে দেখিনি, ভাই।

সে সব বলতে হবে না, তোমার নিজের গল্প বল। বাউল কিছুই বলল না। সুধীর ব্যস্ত হয়ে উঠল—চুপ করেই থাকবে নাকি ?

বাউল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—কি আর শুনবে সে মহাভারত ? নাই বা শুনলে।—

—তবে একটা গানই শোনাও।

—তাই শোন। বাউল গান ধরলো :

সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলো গো
আকুল করিল মন প্রাণ।

গান থামলে সুধীর শুধাল—বাবাজী, রাত্রে কি খাবে? চল না, চারটি ভাতই খাবে।

—ভাত? না আর খাব না। তুমি যাও।

—অতিথি উপোস থাকবে আর গৃহস্বামী আহার করবে?—বাউলের শাস্ত্রে কি আছে জানি না, তবে আমাদের শাস্ত্রে সে নিয়ম নেই।

বাউলের শাস্ত্রে কি আইন আছে তা আমারও জানা নেই; তবে অপরকে অভুক্ত রেখে আমিও খেতে পারতাম না। বাউল বা সন্ন্যাসীর সংসারে না বাধলেও মানুষের ধর্মে বাধতো।

—তবে চলো।

—না ভাই, আর যাব না। চারটি নিয়েই এসো।

—আচ্ছা, তাই হবে। সুধীর চলে গেল। চিন্তার ঢেউ এসে মাথায় লাগল ওর। কত স্মৃতিই ওর মনে পড়ে। মনে পড়ে শৈশবের মধুময় ছায়াছবি। সেদিন সবই ভাল লাগতো। রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলো বাস্তব হয়ে উঠতো ওর নিজের জীবনে। গল্পের ভূতপ্রেতগুলো মূর্ত হয়ে উঠতো মনের পর্দায়। তখন আশা ছিল, আনন্দ ছিল, বাঁচার আগ্রহ ছিল।

তারপর শৈশব গেল, যৌবন এল। এই ভাঙ্গাগড়া টের পাবার আগেই এল বিরাট পরিবর্তন। একদিন যে বয়সটা ছিল কাম্য যে স্বাধীন জীবনটা ছিল শৈশবের স্বপ্ন, যেদিন হঠাৎ বুঝল সে এসেছে, সেদিন তাকে চিনল; কিন্তু তখন আর তাকে ফিরিয়ে দেওয়া চলল না। সে বুঝল, যে অবাধ স্বাধীনতা সে পেয়েছে, তার চেয়ে বহুগুণে পরাধীনতা ভিতরে জাল বিস্তার করেছে। দেহ পাল্‌টালেও, মন পাল্‌টালেও, সেই একই ব্যর্থতা সেই একই অভাব একই সুরে বাজছে। আনন্দ আর নাই, আছে আরাম। সৌহার্দ আর নাই, আছে প্রেম; স্বপ্ন হয়েছে রামধনুর মতো সাত রঙে রঙীন। খেলার সাথীদের মাঝে মন চিনে নিয়েছে নারীকে। সে লজ্জা করে। পৌরুষ সংকোচ করে। হঠাৎ কেমন করে

মনে এসে গেল এই সংকোচটা। কেমন করে সরল প্রাণের মধ্যে সেই মনটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, সে রহস্তের সমাধান সে আজও পায় নি। যতই সে গেল দূরে, মনে ততই এল কামনার শিহরণ। যতই হল ব্যর্থ ততই হিংস্র পশুটা গর্জে উঠল। তার ভয়াল মূর্তিটা ওর চোখের সামনে ফুটে উঠল।—যেন চমকে উঠল বাউল। আঘাত পেয়ে এক তারাটা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। বাইরে জলের ঝাপ্‌টা, বিদ্যুতের ঝিলিক, আর বাজের কড়কড় শব্দ। ছাতা বন্ধ করার শব্দে বাউল মাথা তুলে তাকাল।

—কে, সুধীর?

—না। আমি তাপসী।

ছাতাটি বন্ধ করতে করতে হাতে খাবার ঝুলিয়ে একটি মেয়ে ঢুকল। পরনে নীল শাড়ী—গৌরবর্ণা। চোখ মুখ জলের ঝাপটায় সগুস্নাত পদ্মের মতো দেখাচ্ছে। ঝক্‌ঝক্ করছে। বাউল তার চোখ ফিরাতে পারল না।

উমাকে পাঠিয়ে ধ্যান ভেঙ্গে ছিল শিবের, মেনকা ধ্যান ভেঙেছিল দুর্বাশার—আর এ? কে এই সুন্দরী? নারী সৌন্দর্যের পরম ঐশ্বর্য নিয়ে দেখা দিল বর্ষার এমনি একটি মন মাতানো গভীর অন্ধকারে! ধ্যান ভাঙতে, না তিলোত্তমা রূপে অসুর নিধনে? চরম বিস্ময়ে, নির্নিমেষ নয়নে তাকাল বাউল।

তাপসী সহাস্যে বলল—জায়গা করে দিচ্ছি, খেয়ে নিন।

বাউল প্রশ্ন করল—তুমি কি সুধীরের বোন?

—না। আগে খেয়ে নিন, পরিচয়ের ঢের সময় আছে এখন।

বাউল খাওয়া শেষ করে যখন উঠল তখন বৃষ্টি আরও জোরে নেমেছে। ঝড়ের ঝাপটে আর বজ্রপাতের শব্দে মনে হচ্ছে বাইরে যেন মহাপ্রলয় সুরু হয়েছে। জানালার নিচে যে কয়টা ব্যাং ঘ্যাংঘ্যাং করে ডাকছে তাদের গলা ছাড়া আর কারো গলা শোনা যাচ্ছে না। হয়তো ব্যাংগুলো এই দুর্যোগে তাদের আসর বন্ধ রেখে মানে মানে নিজের নিজের গর্তে ঢুকে পড়েছে। অথবা প্রকৃতির বাদ্যযন্ত্র তাদের গলা ঢেকে দিয়েছে। জলের ঝাপটে ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত ভিজছিল। তাপসী ভাল করে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে জানালাটা বন্ধ করতে করতে আপন মনে বলল:

—আজ আর ফিরতে পারব না দেখছি।

বাউল চিন্তিতভাবে বলল—তাহলে ?

তাপসী হেসে বলল—তাহলে আর কি ? আমি থাকবো এখানে, আর সুধীরদা থাকবে বাড়িতে।—নিয়মটা পাল্টে গেল।

—তা ত হ'ল, কিন্তু খাওয়া দাওয়ার···কিছু খেয়েছ ?

—না খেয়ে এলে সাধনা বলে কিছু খাওয়াবার ব্যবস্থা করবেন কি ?

—না।

—তবে ত খাওয়ার কোন উপায় দেখছি না! বৃষ্টির প্রচণ্ডতাও কমবার কোন লক্ষণ নেই। যদি নিতান্তই খিদে পায় তাহলে আপনার পাতেই—

বাউল চমকে উঠল—আমার এঁটো ?

—কেন, সন্ন্যাসীর এঁটোয় দোষ কি ?

—দোষ সন্ন্যাসীর ত নয়, এঁটোরও নয়—দোষ আমার। আমি খুবই সাধারণ মানুষ। সমাজের ঝামেলা ভাল লাগে না, তাই সব ছেড়েছুড়ে দুটো গান শুনিয়ে ভিক্ষে করি, আর নিরালায় তাল পাতার কুটিরে ঘুমোই। আমার এঁটোয় যদি শ্রদ্ধা থাকে, তাহলে যারা একমুঠো অন্নের জন্যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে মদের নেশায় খিদেকে ভুলিয়ে রাখে, কোন দিন বা জীর্ণ শীর্ণ কড়াই উঠো শানকিতে করে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খায়, তাদের পাতের কণিকার উপর লোভ থাকে যেন।

—কিন্তু তারা ত সংসারেই থাকে ?

বাউল ম্লান হেসে বলল—তবু ভাল। কিছুটা মানুষের উপকারে আসে। নিজের দুমুঠো অন্নের ভাগ দিয়েও আত্মতৃপ্তি পায়, শান্তি পায়। আবার ভবিষ্যৎও আছে, আনন্দও আছে। বৈচিত্র্য আছে, জন্ম আছে, ভয় আছে, ভরসা আছে—কিন্তু আমরা ? কিছুই নেই। কেবলই মনে হয়, এ যেন চাইনি। কিন্তু এ পথ ছাড়তেও পারি না। মনে শুধু ঢেউ-এর খেলা। তাদের যেন আমি এমন ক্ষুদ্র দেহ-মনের কোঠায় রাখতে পারছি না। বর্ষার মতো তারাও যেন তরঙ্গে তরঙ্গে কিলবিল করছে।

তাপসী প্রশ্ন করল—তবে এ পথে এলেন কেন ?

—বললাম তো, খেয়াল। যেদিন বুঝলাম পৃথিবীটা স্বার্থপরতায় ভরা, সমস্ত সম্পর্কটাই মিথ্যা—মিথ্যে মানুষের মন, ধর্ম, সংস্কার—সেদিন মনে হ'ল পৃথিবীতে মানুষের সমাজে সুখ নাই—শান্তি নাই। সেদিন স্বপ্ন

দেখলাম জনমানবশূন্য উদার প্রান্তরের উপর তালপাতার একটি ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। নিচে বইছে স্বচ্ছ নদী—বুকে তার ছোট্ট ঢেউ। উপরে নীল আকাশ। নিচে সবুজ ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আমি। তীরে বসে নদীর জলে পা ছুঁইয়ে বাউল তার একতারাটি বাজিয়ে গান গাইছে। একদিন সব কিছু ছেড়ে একতারা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম।—এখন দেখছি গোলকধাঁধাঁয় পড়ে গেছি। এখন দেখছি স্বপ্ন ও বাস্তব এক হয় না।

বাইরে বাজ কড়কড করে উঠল। ঝড়ের ঝাপটায় খড়ের ছাউনিটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। প্রচণ্ড ধাক্কায় কপাটটা ঝন্ ঝন্করে উঠল।

বাউল চম্‌কে উঠল—কে ?

তাপসী শান্তভাবে বলল—ও বাতাস।

বাউল আবার গল্প বলতে আরম্ভ করল—এখন যেন কেমন একাকিত্ব লাগে বড্ড। মনটাও মাঝে মাঝে মানুষের কর্মময় জীবনে ফিরে যেতে চায়। নিরস জীবনযাত্রায় দেহ মন বড় ক্লান্ত হয়ে উঠেছে দিন দিন। মনে হয় আবার ফিরে যাই পুর্বের জীবনে, পুর্বের সমাজে; আবার তেমন ইচ্ছাও যায় না।

বাউল থামতেই তাপসী প্রশ্ন করল—আপনার বাড়ি কোথায় ছিল ?

—বাঁকুড়ায়। শহরেই, কিন্তু এমনি স্বতন্ত্র মন নিয়ে জন্মেছিলাম যে সমাজের অন্য পাঁচজনার থেকে কাজে-অকাজে সকল দিক দিয়েই স্বতন্ত্র হয়ে গেছি। বৃদ্ধ বাপ যতদিন ছিল সংসার আমার ভারটা বুঝলেও বইত; কিন্তু দৈবের এমনি নির্মম বিধান—রাজনীতি সাহিত্য, সবই যখন হারালাম, ঠিক সেই সময়েই পিতৃবিয়োগের দিন এগিয়ে এল।—বলতে বলতে সজল হয়ে উঠল ওর চোখ দুটো।

তাপসী প্রশ্ন করল—তারপর ?

—তারপর, ব্রাহ্মণের ছেলে কাজকর্ম সম্পন্ন করে দেনায় মাথা বিকিয়ে ক্লান্ত মনে শ্রান্ত চরণে এসে দাঁড়ালাম শেষ প্রিয়তম বন্ধু অধ্যাপক রায়ের কাছে। কিন্তু তার তখন সময়ের অভাব। আমার মতো বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে অধ্যাপকের সময়ের অপলাপ করতে নারাজ। এদিকে সংসারে ভাই আমার ভার বইতে নারাজ। বুঝলাম, বৃদ্ধ হয়েছি।—এতটা বলে বাউল থামল।

তাপসী শুধাল—তারপরই কি চলে এলেন সংসার ছেড়ে ?

বাউল ম্লান হেসে বলল—হাঁ।

তাপসী ব্যস্তভাবে বলে উঠল—এই যা, আপনার নামটাই জানা হয় নি! বলুন ত।

বাউল হেসে বলল—তাও জেনে নেবে, আচ্ছা, তবে শোন—আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তোমার পরিচয়টা ?

—আমার পরিচয়!—তাপসী সুর করে আরম্ভ করলো :

জটলা করে যাহার তলে রাখাল বালকেরা
ঐটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী—
ঐখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি।

বাউল বিস্মিত হয়ে বলল—এই বুঝি তোমার পরিচয় হ'ল ?

তাপসী হেসে বলল—এর বেশি জানা ভাল নয়। তাহলে আপনার অনুসন্ধিৎসা থাকবে না। ভাল লাগবে না। তাছাড়া বাস্তবকে যখন ভাল লাগে না আপনার, স্বপ্ন দেখেই যখন আনন্দ পান, তখন পরিচয়টা জেনে ফেললে আর আমাকে একদম ভাল লাগবে না আপনার। নিন, একটা গান করুন ত শুনি, আর বকতে ভাল লাগছে না।

বাউল শান্তভাবে বলল—গান শুনবে ?

তারপর একতারার সঙ্গে গান ধরল—

ওগো রাণি, নগরে কোলাহল উঠ চল চল
নন্দিনী নিকটে তোমার গো
চল বরণ করিয়া গৃহে আনি গিয়া
এস না আমার সঙ্গে গো—

গানটা শেষ হতেই তাপসী বলল—বড্ড ভাল লাগল গানটা। মনে হ'ল সুরে লয়ে ছন্দে মূর্চ্ছনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছেন। যেন সত্যই গিরিরাজ অধীর আনন্দে উমার মাকে ডেকে তুলছে। ভাবে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল আপনিই গিরিরাজ।

বাউল কিছুই বলল না।

তাপসী একটু চুপ করে থেকে সহাস্যে বলল—আর রাণি কে ?

শুনে বাউল হাসল—তা ত জানিনে—তবে তুমি যেমন আমার মাঝে গিরিরাজকে দেখেছ তেমনি—

—তেমনি আপনি আমার মধ্যে মেনকাকে দেখেছেন!—বাউল কথাটা শেষ করার আগেই তাপসী বলে ফেলল।

লজ্জায় বাউলের মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল সে বলল—না—না।

—হাঁ, হাঁ, আপনি যদি না দেখে থাকেনও গান শুনতে শুনতে আমার মনে হয়েছে আমিই বুঝি গিরিরাজরাণী, আর আপনি—আপনিই সেই গি-রি-রা-জ!

তাপসীর কথাটা বাউলের স্নায়ুতন্ত্রীতে চমক খেলে গেল একটা তড়িৎ প্রবাহের মতো। বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করে সে অন্য কথা পাড়ল—ছুটো বাজছে, তোমার দাদা বোধ হয় আসবে না।

—আমিও নিশ্চয়ই যাব না।

—তুমি একা থাকবে আমার কাছে? বিস্মিতভাবে বাউল তাকাল ওর মুখের দিকে।

তাপসী কৃত্রিম রাগের ভাণ করে বলল—আপনি কি বলেন বাইরে জলে দাঁড়িয়ে ভিজবো? তারপর আচম্বিতে বাউলকে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলল—তোমারই পাশে শুধু একটি রজনী! তারপর শোবার বিছানাটা ঝেড়ে নিল; দুটি ক্লান্ত দেহ এলিয়ে পড়ল শয্যায়।

ঘরের আলোটুকু বাইরের অখণ্ড অন্ধকারের কাছে করল আত্মসমর্পণ।

সকালে তাপসীর ডাকেই বাউলের ঘুম ভাঙল—বাঃ, এই বুঝি আপনি বাউল! কোথায় এক তারার সুরে ভোরের ভৈরবী শুনে ঘুম ভাঙবে, তা না আপনাকে ঠেলে তুলতে হ'ল!

—তোমার ধারণা কি বাউল মানে ভোরে ওঠা?

—তা নয় ত কি? তবে আর কষ্ট করে আপনার কাছে রাত কাটাতে গেলাম কেন?

—বৃষ্টি!

—সে ত আমি যখন এলাম তখনও হচ্ছিল: বাদল ঝরঝর ভেক কড়-কড়!

বাউল হেসে উঠল—একি রাতারাতি কবি হয়ে গেলে নাকি?

—কেন কবিতাটা মন্দ কিসে?

—না। আদৌ মন্দ হয় নি। যথা মন্দাকিনী—বলতে বলতে সুধীর ঘরে ঢুকল।—কেমন রাত কাটল?

—কেমন কাটল? বলিহারী বুদ্ধি! একটা মেয়েকে দুর্যোগের রাতে ছেড়ে দিলে একজন বাউলের কাছে—লজ্জায় তোমার ঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না! ধন্য তোমার বুদ্ধি—ধন্য তোমাকে, আর তোমার মাটিকে! বলতে বলতে হেসে ফেলল তাপসী।

—নাও খুব হয়েছে! চা কর একটু, তারপর go back to kitchen—এই বলে বসে পড়ল সুধীর তার মোটটার উপর।

তাপসী কোমরে কাপড়টা জড়িয়ে নিতে নিতে বলল—তা বই কি! তুমিই যাওগে বরঞ্চ।

—আর তুমি? তুমি বুঝি আমার পক্ষে BA দেওয়ার জন্যে তৈরী হবে?

—না, বিয়ের আগে বেটা দেবার জন্য চেষ্টা করব।

—আর?

দা ৮৭০৫

তাপসী চা করতে করতে উত্তর দিল—অথ কেন প্রযুজেন…

বাউল নিরুত্তর। বাইরে ক্লান্ত প্রকৃতির ক্রোড়ে ভারাক্রান্ত আকাশের বিগলিত অশ্রুকণা। কারো কাছে কোন উত্তর না পেয়ে তাপসী চা ঢালায় মন দিল।

সুধীর Macbathe খুলে পড়তে সুরু করল—

To-morrow and to-morrow and to-morrow
Creeps in their petty pace from day to day
To the last syllable of recorded line
And all our yesterday have lighted fools.

চা নামিয়ে রেখে তাপসী উঠে দাঁড়াল। সুধীর তখনও আপন মনে পড়ছে। তাপসী একবার বাউলের দিকে একবার সুধীরে দিকে তাকাল; কিন্তু কারুর দৃষ্টিই আকৃষ্ট হ'ল না।

সুধীরকে লক্ষ্য করে তাপসী বিরক্তির সঙ্গে বলল—To-morrow-র কথা To-morrow হবে। To-day চা-টা বেঁটে খেয়ে নাও। আমি বাড়ি চললাম।

তারপর ধ্যানমগ্ন বাউলের দিকে তাকিয়ে সাহেবী কায়দায় বলল—Goodbye, Mr. Boul! হেসে বলল—যদি দেখা হয় পুনঃ

বরষার দিবা শেষে—

বাউল কিছুই বলল না। সুধীর সুধাল—তুমি চা খাবে না?

হয়তো সে শুনতেই পেল না। একটি মূর্তিমতী ছন্দের মতো সে বেরিয়ে গেল ঝোড়ো হাওয়ায়। তীরের মতো এগিয়ে চলল। বাতাসের মুখে পড়ে নীল শাড়ীর আঁচল টা পতাকার মতো উড়ছিল। বাউল একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সে-দিকেই।

সুধীর হেসে বলল—বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ হ'ল?

বাউলের চোখ দুটো সজল হয়ে উঠেছিল। তখনও স্থির দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল সম্মুখ পানে।

সুধীর একবার বর্ষাক্রান্ত সবুজ মাটির দিকে তাকিয়ে বলল—মেনকার স্বর্গারোহন দেখছ বুঝি?

—না।

—তবে?

বাউল গাঢ় স্বরে বলল—সংসারজীবনে যে ক্লান্ত, বার্দ্ধক্য শ্বেতরূপে যার বেশ-কলাপে নেমে এসেছে, পরম ও চরম শান্তির মাঝে সেই আমার বিগত যৌবনে, নিরস ক্লান্ত মনে অকস্মাৎ ক্লান্তিনাশা সুগন্ধি স্বচ্ছ বাতাসের প্রলেপে যে নারী জীবনে এনেছে পরম বিশ্বাস, এনেছে আশ্রয়ের চরম অভিলাষ, তাই আমি দেখছি শুধু। কে সেই নারী? সে পৃথিবীর না স্বর্গের? মানবী না দেবী?

সুধীর হেসে বলল—সন্ন্যাসীর এবার ধর্ম গেল। মন তোমার যেখানে পৌঁছেচে গেরুয়া সেখানে যেতে পারে না। এবার আর একটা ঢেউ এসে তোমাকে স্বস্থানে পৌঁছে দেবে। এবার গেরুয়া ছেড়ে বিয়ে কর। তপস্যা গেছে।

বাউল উদাস ভাবে বলল—তপ কাকে বলে জানি না। আর গেরুয়া যে মানুষকে সাধনার পথে কতখানি এগিয়ে দেয় তাও কোনদিন জানবার চেষ্টা করি নি। একদিন সংসারে ভাল লাগার মতো কিছু পেলাম না বলেই সেখানে না থেকে বাউলের পথটাই বেছে নিলাম। আজ যদি সংসার-জীবনে কোন সম্পদের খোঁজ পাই তাহলে সেখানে ফিরে যেতে কোন আপত্তি নেই।

—কিন্তু লোকেও হাসবে!

—হাসবার জন্যেই ত লোক। যেদিন একতারা নিয়ে আমার সমাজকে ছেড়ে নদীর তীরে নির্জন প্রান্তরে নিজের ঠাঁই বেঁধেছিলাম সেদিনও হেসেছিল; কিন্তু তাই বলে কি আমার কাজে বাধা এসেছিল? কালের চাকার সঙ্গে আমার চাকাও গড়াবে।

সুধীর সুর করে আরম্ভ করল

তবে কি তপস্যার শেষ—
ত্যাগ করি একতারা বাউলের বেশ
ত্যাগ করি পথপ্রান্তে পাতার কুটির
গড়িব নূতন স্বর্গ নব পৃথিবীর।

বাউল ম্লান হেসে বলল—কে জানে কি করব? তবে পাতার কুটির ত্যাগ করব।

—সে তাপসীর অধ্যবসায় না তাপসীর তপস্যা?

—হয়তো শেষটাই। তবে সে তপ ভাঙেনি, ভেঙেছে ভুল। যতটা

দেহজগতে টেনে এনেছে তার চেয়ে মনোজগতে পৌঁছে দিয়েছে দেহের নাগালের বহু উর্দ্ধে।

সুধীর হেসে মদনভস্ম কবিতার কয়েকটা লাইন আবৃত্তি করল—

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বজগৎ দিয়েছ তারে ছড়ায়ে
ব্যাকুলতর বাসনা তার বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসী।

বাউল ম্লান হেসে বলল—পরীক্ষার পড়া, তুমি পড়।

—পড়তে আমার ভাল লাগছে না। আমার মনে হচ্চে···কি জানি কি মনে হচ্চে? যদি মনের চাওয়াটা বুঝতে পারতাম তাহলে পাওয়ার একটা ব্যবস্থা করতাম।

বাউল প্রশ্ন করল—আচ্ছা তাপসী তোমার কে?

—ব্যবহারে কি বুঝলে?

—তোমাদের ব্যবহারটাই ত বোঝাটাকে আরও দুর্বোধ্য করেছে!

সুধীর হেসে বলল—কিন্তু আমাকে না শুধিয়ে তাকেই প্রশ্ন করলে হ'ত? তা ছাড়া সে কথাটা জেনে নেবার মতো একটা বড় রাত্রিও পেয়েছিলে।

—সেজন্য তৈরী ছিলাম না আমি। তৈরী না থাকলে আকস্মিক এমন একটা রজনী এলেও কথা বলার সূচি তৈরীর আগেই রাত্রি বিদায় নেয়।

সুধীর এ কথার উত্তর না দিয়ে সুর করে গান ধরলো:

আমার কথা কওয়া যে হ'ল না,
নিশা গেল চলে করিয়া ছলনা।

সুধীরের গান শুনে বাউল হেসে বলল—কিন্তু কথা কওয়া কার সঙ্গে হ'ল না, তাই বল?

—কেন উর্বশী।

—উর্বশী? কিন্তু—

—এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই কবি। তোমার মধ্যে তপস্বীর মন্দির ভেঙে যে বাস্তবটিকে টেনে এনেছ, সে কাব্য কবির মন্দাকিনী। উর্বশী ভেঙেছে কবির হৃদয়ের রুদ্ধ কপাট, আর মেনকা প্রভৃতি নর্তকীরা ভেঙেছে তপ, জাগিছে যৌনতা। সাধনার রন্ধ্রে ঘুণ ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু উর্বশী? সে নিরস তপস্বীর দ্বারে দেখা দেয়নি। কবিই তার রূপদ্রষ্টা—

তুমি নহ মাতা, নহ কন্যা,
নহ তুমি নারী,
উষসী উর্বশী।

তাই তাপসী তোমার কাছে উর্বশী। সে মনে জাগায় প্রেম কিন্তু দেহে তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তার রূপ দৃষ্টিকে সংকীর্ণ করে না, তার সৌন্দর্য বিশ্বের সৌন্দর্যের দরবারে পৌছে দেয়। তারই মাঝে জন্ম নেয় উর্বশীর সন্তান। এরপর পরিচয় আমি জানি না। সে শুধু তোমার মধ্যে আপনকে পবিপূর্ণ করেনি, আমার মধ্যেও সে অম্লান।—এতটা বলে সুধীর থামল। কিন্তু বাউলের মুখে কোন উত্তরই এল না।

তাকে নিরুত্তর দেখে সুধীর হো হো করে হেসে উঠল—তুমি ভুল বুঝ না যেন। আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নই। I like not to pluck it and spoil—

বাউল ম্লান হেসে বলল—আমিও না, সুধীর। আমি কোন জিনিসই পশুর মতো ভোগ করতে চাই না। তাই ত আমার সংসারের সঙ্গে খাপ খেল না।

সুধীর হেসে বলল—কই, সন্ন্যাসীর সঙ্গেও ত খাপ খেল না তোমার।

—সংসারে যার ঠাঁই নেই, আশ্রমেই যে তাব ঠাঁই হবে, এমন ত কথা নেই, ভাই। সংসার কবতে পারলাম না বলেই যে সন্ন্যাসী হতে পারব এমন কথা নেই। যে মন নিযে জন্মেছিলাম, যে পবিবেশকে ভালো বেসেছিলাম আমার সেই পবিবেশ একদিন কোন ফাঁকে পরিবর্তন হয়ে গেল। যাকে আঁকড়ে ছিলাম একদিন উপলব্ধি করলাম সে নেই। আমার হৃদয় জোড়া শুধু শূন্যতা। বুঝলাম, আমাকে ঘিবে এক বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে।—

সুধীর হেসে বলল—Old order changeth yielding place to new—পরিবর্তন হবেই। সেই পরিবর্তনশীল জগতে মনকে পালটে দিতে হবে। মনকে উপযোগি করে তুলতে হবে।

—কিন্তু জগতের সব কিছুই কি পরিবর্তনের যোগ্য। পরিবর্তন আছে দেহের—আছে মনের—আছে বিকাশের পথে কোরক থেকে বিকশিত হয়ে উঠতে সৌরভে, সুগন্ধে, সৌন্দর্যে। তবু সেই আধারকেই অবলম্বন করে, সেই শিল্পকেই কেন্দ্র করে।—আর সত্যের কোন পরিবর্তন নেই।

সত্য চিরন্তন। কালের প্রভাবে মানুষের রুচির আওতায় যদি সত্যকে পালটে যেতে হয় তাহলে তার মর্যাদা থাকে না। তাহলে মিথ্যা সত্যের তফাৎ শুধু কালের সঙ্গে, ন্যায় ও ধর্মের সঙ্গে নয়।

সুধীর হাসল—যা পালটায় না তা নিশ্চয়ই পালটাচ্ছে না।

—তাও পালটাচ্ছে। সমাজে সত্যের ভিত্তিটাই থাকচে না আর। এখনকার আদর্শ—

মিথ্যারে দিয়া রচিব সৃষ্টি
সত্যেরি করি দূর—
নরকের দ্বারে হইব প্রহরী
দৈত্যেরি করি সুর।

সুধীর হঠাৎ প্রশ্ন করল—আচ্ছা তোমার জন্ম কোথায় বলত?

—কোন এক গ্রামে। সেখানেই আমি মানুষ। আশৈশব সেখানের প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দে কাটিয়েছি, পুকুরের জলে সাঁতার কেটেছি, জৈষ্ঠ্যের রৌদ্রে আম পেড়েছি, বর্ষার জলে ভিজেছি। অন্য শিশুর জীবনী থেকে হয়তো কোন তফাৎ নেই আমার জীবনীতে। সেজন্য সে সব স্মৃতি আজ তালগোল পাকিয়ে এক হয়ে গেছে। কিন্তু একটা স্মৃতি শুধু মনে আছে, যা ভুলিনি। হয়তো কোনদিনই সে ছবি ভুলবো না।

সুধীর প্রশ্ন করল—সেটা কি ছবি?

—দুপুর রৌদ্রে তিন বুড়োর ছবি। বাউল সুধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

—তেমন সুন্দর বুড়ো আমি কখনো দেখিনি। তাঁরা আজও আমার চোখে অম্লান সৌন্দর্য। সেই গ্রামেরই রাস্তার ধারে একটি মাটির দাওয়ায় বসে তাঁরা মহাভারত পড়তেন, রামায়ণ পড়তেন গীতার ব্যাখ্যা করতেন। অবশ্য তিনজনেই পড়তেন না। পড়তেন একজন। আর দুজন চুপ করে শুনতেন। মাঝে মাঝে মাথা নাড়তেন ঘন ঘন, কখনো চোখ দিয়ে জল পড়তো, আর কখনও হো-হো করে হেসে উঠতেন। আনন্দের মেলা যেন! কখনও কখনও দাওয়ার কাছে কদমতলায় বসে আমরা ওদের আলোচনা শুনতাম। যিনি পড়ে শোনাতেন তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। এমন সুন্দর পড়তেন যে শুনতে শুনতে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। আমরা উঠতে পারতাম না সেখান থেকে।

যখন গীতার শ্লোক পড়তেন, বিচিত্র সুরে ঠিক সঙ্গীতেরই মতো কানে বাজতো। আমি একা প্রায়ই শুনতাম। তার ব্যাখ্যা তখন কিছুই বুঝতাম না। গীতার যে ব্যাখ্যাগুলো করতেন সেগুলো মনে পড়লে বড্ড ভাল লাগে এখন। তেমন সুন্দর ও সরস ব্যাখ্যা আজও চোখে পড়ে নি, কানেও শুনেনি।

সুধীর প্রশ্ন করল—তাঁরা এখনও বেঁচে আছেন?

বাউল ম্লান হেসে বলল—না, তারা আর কেউ বেঁচে নেই। যে মাটির দাওয়াটায় বসে তাদের আলোচনা হ'ত সে দাওয়াটাও আর নেই; সবই এখন ত্রিনয়নের বস্তু। তবুও যখনই সেখানে যেতাম তখনই সে স্থানটা দেখলেই সেই দাওয়ার কথা মনে পড়ে যেত। সে তিনজনও চোখের সামনে ভেসে উঠত। কালের আবর্তে ট্র্যাডিশনটাও যেন লোপ পেয়ে গেছে। বাউল হবার আগে যখন শেষবারের মতো ওখানে যাই তখন দেখলাম আগাগোড়াই পরিবর্তন হয়ে গেছে। চণ্ডীমণ্ডপে লোক দেখা যায় না। ছেলেদের খেলার মাঠে পাওয়া যায় না। মেয়ে মহলে সুর করে রামায়ণ পাঠ বন্ধ হয়ে গেছে। আর সেই তিনবুড়োর মতো কোন বুড়োই চোখে চশমা এঁটে আর মহাভারত পড়ে না—বৈশায়ম্পন কহিলেন, হে মহারাজ—

—অনন্তর তাপসী সরোবরে স্বচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ সলিলে অবগাহনপূর্বক, সুবেশ পরিধানপূর্বক মুক্ত কবরী পৃষ্ঠে স্থাপন করতঃ বর্ষার মুখরোচক খাদ্য তেলেভাজা ও কড়কড়ে অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রণস্থলে প্রবেশ করিল।—বলতে বলতে তাপসী ঘরে প্রবেশ করল।

—তাপসী! চম্‌কে উঠল বাউল।

—হাঁ, তাপসী।

সুধীর একদৃষ্টে তাপসীর দিকে তাকিয়ে বলে চলল: উর্বশীও বুঝি ছোট হয়ে গেছে। সারা দেহে নৃত্যের আলিম্পন। প্রশান্ত ললাট, হাস্যময়ী মুখশ্রী, গভীর শান্তির মাঝে নূতন রূপ। পরম শান্তির মাঝে পরম ক্লান্তি চির মিলনের সেতু বেঁধেছে তাপসীর মাঝে। উষার পরশে দেহের প্রতিটি পাপড়ি বিকশিত। সৌরভের অম্লান সজীবতায় মনে হচ্ছে স্বর্গের পারিজাত ফুল। ও রূপের ব্যাখ্যায় বলতে ইচ্ছা যাচ্ছেনা—প্রেক্ষণা নিয় নাভিভিঃ!!

মনে হচ্চে উষার কথা। আর মনে হচ্চে পূজারিণী বেশে কুমারী উমার কথা। গিরিরাজ কন্তার কথা। ফুলের ডালি ভরে রাঙা চেলি পরে মহাতপস্বী নিষ্কাম দেবতা মহাদেবের চরণ তলে নতজানু সেই ঐশ্বর্যময়ী স্নেহময়ী দেবীকেই মনে পড়ছে।

তাপসী হেসে বাউলকে বলল—কই, আপনি ত কিছুই বলছেন না!

বাউল শান্তভাবে বলল—তোমার ঐ দৃষ্টি আমায় নিস্পন্দিত করেছে, তাপসী। আমার হৃদয়তন্ত্রীতে একটি সুর শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু সে সুর বাইরে বাজছে না। ভাব জাগছে কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে না। তুমি আমার কাছে থেকেও যেন বহু দূরে। তোমাকে ভাল লাগছে দেখে তবুও তৃপ্তি পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে বহু দূরে চলে যাই—তোমার ধারণা তোমার নাগালের বাইরে, যেখানে তোমার মন পৌঁছোবে দেহ পৌঁছোবে না। দেহ যদি কোন দিন যায় মন তোমার যেতে চাইবে না। তুমি আমায় ভুলবে অদর্শনে আর আমি তোমাকে অম্লান রাখব আমার স্মৃতিপটে,—ভুলিব না তব স্মৃতি জীবনে মরণে।

—আর আমি, ভুলের পাহাড়ে শোব মুদ্রিত নয়নে! সব ভুলে যাব। আপনাকে ভুলব, মান ভুলব, মর্যাদা ভুলব, দেশ ভুলব, বিদেশ ভুলব, জনম ভুলব, মরণ ভুলব। স্মৃতি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অতীত, কিন্তু আমি বর্তমান—I have nothing to do with the past. অতীতকে সামনে রেখে প্রহসন আমি করব না।—এতটা বলে তাপসী থামল। বাউল কিছুই বলল না।

বাইরে তখন তড়তড়ে রোদ—সজল প্রকৃতির উপর স্বচ্ছ আলোর জ্যোতি। ঘরের সামনে দিয়ে সমস্ত গ্রামের জলটা ছোট নদীর মতো এঁকে বেঁকে বাঁশ বনের পাশ দিয়ে নিচের বাঁধে গিয়ে পড়ছে। বর্ষার লাল জলে শিশুর হাতের তৈরী দুএকটা কাগজের নৌকা ভাসছে। ছেলেদের কোলাহলও ভেসে আসছে—রাস্তায় তারা কোলাহল করছে।

তাপসী বলল—খেয়ে নিন আপনারা।

বাউল নিদ্রোত্থিতের মতো দাঁড়াল—আমি চলি।

তাপসী ব্যস্ত হয়ে বলল—খেয়ে যান।

—এখন খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই।

—কোন লোকের বাড়িতে, কোন এক কুমারীর সঙ্গে রাত কাটানও ত আপনার অভ্যাস ছিল না, আশা করি।

—না।

—তবে ?

—সেটা দৈব।

—এটা কি দুর্দৈব ?

বাউল ম্লান মুখে দাঁড়াল। তাপসী খাবারটা বেটে দিয়ে বলল—বসুন।

—না উঠি। বাউল বিনীতভাবে বলল।

তাপসী সুধীরের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি কি বই মুখেই থাকবে ?

সুধীর মুখ তুলে বলল—কেন বল ত ?

—ইনি যে চলে যাচ্ছেন, খেয়ে যেতে বল না।

সুধীর হাসল। তাপসীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—ও যে বাউল, চলে ত যাবেই।

— তা আমিও জানি। কিন্তু—

—কিন্তু কিছু নেই, তাপসী।

সম্পূর্ণ কথার মাঝখানে বাউল বলে উঠল—থাকা আর আমার চলে না। আমাকে এখুনি যেতে হবে। স্নেহমাখা দুমুঠো অন্ন পাবার প্রত্যাশা যখন চিরদিনের জন্য ত্যাগ করেছি তখন স্নেহমাখা দুমুঠো অন্ন খেয়ে আর লোভ বাড়াতে চাই না, তাপসী।

তাপসী হেসে বলল—কিন্তু কাল ত খেয়েছেন ?

—না, কাল তোমার হাতে স্নেহ ছিল না, মমতা ছিল না। ভিখারীকে দুমুঠো অন্ন দেওয়ার সঙ্গে এক ফোঁটা করুণা হয়তো মেশান ছিল, কিন্তু স্নেহ মমতার লেশও তখন ছিল না।

তাপসী হেসে বলল—তারপর রাত্রে আপনার অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রেমের উত্তাপে হাতের তালুর নিচে জমাট মমতা গলতে গলতে সকাল নাগাদ কর রেখা দিয়ে টস্‌টস্‌ করে গড়িয়ে পড়ছে !

সুধীর একটা তেলেভাজা দাঁতে কাটতে কাটতে বলল—আলবাৎ।

তাপসী ওর কথায় কান দিল না। বাউল একতারাটা হাতে নিয়ে তারে একটা ঝঙ্কার মেরে দরজার বাইরে পা দিল।

তাপসী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল—কই উত্তর দিলেন না!

—তোমার উপর আমার দুর্বলতাও থাকতে পারে।

সমস্তটা তাপসীর কানেই হয়তো গেল না। একটা বিদ্যুতের চমক খেলে গেল তার সারা দেহে। যখন ভাল করে চোখ মেলে তাকাল তখন বাউল চলে গেছে।

[৩]

বাউল সুধীরদের কাছ থেকে পালিয়ে এসে একাকী বসেছিল তার নিজের হাতে তৈরী করা তালপাতার ছোট কুটিরে। বাইরে বর্ষার বারি ঝরছে অবিরাম। সামনের ছোট নদীটা ফুলে ফুলে উঠছে। বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে পাতার কুটির। আঙিনায় রক্ত করবীর লাল ফুলগুলোর পাপড়িতে পাপড়িতে জমে উঠেছে বৃষ্টির কণা। ভিতরে বাউল—হাতে তার একতারা। স্থির নিস্পন্দ যেন।

বর্ষার সঙ্গীতে, এক বিশেষ ধরণের স্তব্ধতায় আশ্রমের বাইরেটাও নীরব। থেকে থেকে লাল ফুলের পাপড়ি বেয়ে জল ঝরেঝরে পড়ছে। দাদুরী সুর করে গাল ফুলিয়ে গলা ছেড়ে ডাকছে। দু'তীরের ঘোলা জল নালা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে সশব্দে পড়ছে নদীর বুকে। মাঝে মাঝে তীর ভাঙার শব্দ—নদীতে বন্যার গর্ব।

রাত্রি জাগে পৃথিবীর বুকে। পাতার কুটিরে জাগে বাউল—একদৃষ্টে তাকিয়ে অন্ধকারের মধ্যে। ভিতরে প্রদীপ জ্বলছে একটা এককোনে। বাউলের চোখে মুখে ভয় নাই, কেবল একটা গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ। হয়তো সে ভাবছে। কি ভাবছে কে জানে?

ভাবতে ভাবতে দিন গেল, রাত্রি এল। রাত্রিও হয়তো যাবে। সারাদিন খাওয়া হয়নি। খাবার কথা মনেও হয়নি। তাপসীর স্নেহ-মাখা অন্নকে প্রত্যাখ্যান করে এসে অন্নের কথা ভাবতে তার ইচ্ছা

যাচ্ছে না আর। বারবার তাপসীর মুখখানাই ভেসে উঠছে চোখের সামনে—পরম মমতাপূর্ণ ঢলঢলে চোখ দুটো তার।

অদ্ভুত মেয়েটা। তাকে এতটুকু চিনবার পর্যন্ত উপায় নাই। গুরুতর কথাগুলোও এমন সহজ করে বলে যে তার ফলে সে নিজেকে আরও জটিল করে তোলে। জটিল করেছে ওর সমস্যা। বাউল বহুচিন্তা করেও সমাধান পায় না।

অতীত জীবনের জীর্ণ পাতা ভেসে আসে চিন্তার আবর্তে। মনে পড়ে যায় শৈশবের কথা। মনে পড়ে যায় আর একটা বালিকার মুখ—এখন আর তাকে ভাল করে চেনা যায় না। অস্পষ্ট ছবিটা শুধু বিগত জীবনের কয়েকটা পৃষ্ঠার মসীলিপ্ত অক্ষরের দিকে দৃষ্টি ফেরায়। স্পষ্ট না হলেও মনে পড়ে সেই মুখখানা। তার সঙ্গে আর দেখাও হয়নি কোনদিন। সে হয়ত ভুলে গেছে তাকে। বাউলও ভুলে গেছে। তার নামটাও আজ আর মনে নেই।

সে অনেকদিনের কথা। বাউল তখন কিশোর। সে সময় যাত্রা করার অভিযোগে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল তাতে আর তার মাথা ঠিক রাখবার কথা নয়। সে মাথা ঠিক রাখতে পারেও নি। রাগ করে সে সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিল। ধরেছিল বনের পথ। কি বন, কোন্ পথ, কিছুই জানা ছিল না তার।

বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে শেষে তিনদিন পরে একটা গ্রামে পৌছল। খিদের জ্বালায় সেখানেই এক গৃহস্থের হ'ল গোপালক। কাজ গরু চরান। বড় কষ্টেই দিন কাটছিল। এমন সময় সেই মেয়েটি এল। কি তার নাম মনে নেই। বোধ হয় শহরেরই মেয়ে। দুদিনের জন্ম এসেছিল মামার বাড়িতে। ভারি সুন্দর ছিল তার মুখখানা—যেন মূর্তীমতী স্নেহমমতা।

দুদিনেই সে বড় আপনার হয়ে গেছল। বাউলের সকল কাজেই সে পাশে এসে দাঁড়াত। নিজের ভাল ভাল খাবার এনে তাকে খাওয়াতো। তার অস্পষ্ট ছবিটা আর একবার বাউলের চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু দুঃখে যাদের জীবন গড়া সুখ তাদের ধাতে সইবে কেন ?—চিন্তা করতে করতে একটা দীর্ঘশ্বাস ওর বুক থেকে ঠেলে এল।

একদিন সে জানায় যে সে বাড়ি ফিরে যাবে। তাদের দুজনে যে

কথাগুলো হয়েছিল বিস্মৃতির অন্ধকার ঢেলে আজ সে কথা মনে পড়ছে।

সে বলেছিল—তা হলে কি করে থাকবো?

সে মেয়েটি আশ্বাস দিয়েছিল—আমি আবার শীগগির ফিরে আসব। সে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—না, তোমাকে ছাড়বো না। মেয়েটি শাসনের সুরে বলেছিল—ছি: তুমি কি আমার বর?

—হাঁ।

—তবে?

—তবে কি?

—তবে সিন্দুর কই?

—দাঁড়াও সিন্দুর আমি কিনে আনছি। নিজের বেতনের পয়সা থেকে একটা পয়সা দিয়ে সিন্দুর কিনে এনে দিয়েছিল মেয়েটিকে।

মেয়েটি হেসে বলেছিল—হাতে দিলে কি হবে, মাথায় দাও।

সে ওর মাথায় সিন্দুর ঘষে দিয়ে তিনবার বলেছিল—তুমি আমার বৌ। গলায় গঁড় ফুলের মালা আর গোটা মাথায় সিন্দুর লিপে দিয়ে যখন স্থির মাথায় তাকে ভাল করে দেখল তখন সিন্দুররাঙা মাথাটার দিকে তাকিয়ে বড় ভয় পেয়ে গেছল। মেয়েটিকে আমবাগানে দাঁড় করিয়ে রেখে 'আসছি' বলে বনের পথ ধরেছিল। কে জানে সেদিন সেই বালিকাটি মার খেয়েছিল কিনা!—তাকেও নিশ্চয়ই খোঁজাখুঁজি করেছিল। হয়তো সেদিনের ঘটনাটা তারও মনে থাকবে।

এমন সময় বাইরে পাখিরা কলরব করে উঠল। বাউল মাথা তুলে দেখল—ভোর হয়ে গেছে। ভাবতে ভাবতেই রাত কেটে গেছে। বাউল ভাল করে একবার তাকিয়ে দেখল বাইরেটা। ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। ভোরের আলো আত্মপ্রকাশ পায় নাই ভাল করে প্রকৃতির বুকে। ছোট নদীর বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলি আছাড় খেয়ে পড়ছে। ঝিম্ ঝিম্ করে বৃষ্টির কণা পড়ছে। ভিজছে গাছ, ভিজছে মাঠ,—ভিজছে সারা প্রকৃতি। একটা চাপা বিরহ বেদনা যেন গুমরে উঠছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন কটা বাউলের মনে পড়ে—

> এমন ঘন ঘোর বরিষায়
> এমন দিনে তারে বলা যায়।

মনে পড়ে যায় বিরহী যক্ষের কথা। নির্বাসিত যক্ষ এমনি একটি বর্ষায় বিরহ ব্যাথায় কাতর হয়ে উঠেছিল। মেঘকে করেছিল দূত। কত বর্ষা এসেছে তার জীবনে, কত স্মৃতি রেখে গেছে প্রতিটি বর্ষ লিপিতে।—কই বর্ষার এ-রূপ ত সে দেখেনি ?

শৈশবেও সে এর রূপ দেখেছে। তখন বর্ষার জলে দাঁড়িয়ে ভিজেছে। লাফিয়েছে, ছুটাছুটি করেছে ঐ দাদুরীর মতো;—এমনি করে না ভিজলে যেন বর্ষাকে ঠিক মতো উপলব্ধি করাই যেত না। যেদিন অভিভাবকদের চোখে চোখে থাকতে হ'ত সেদিনের বর্ষার দিনটাই যেন ব্যর্থ হয়ে যেত। ম্লানমুখে পা ঝুলিয়ে বর্ষাকে ছড়া শুনাত—আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, মুড়ি দেব মেপে। তারপর রাত্রে বিছানায় শুয়ে ব্যাং-এর গান শুনত।

ব্যাং এর গান শুনতে সে বড় ভাল বাসত। সে খিড়কির ধারের জানালাটা রাত্রে খুলে রাখতো; তাই আরও স্পষ্ট শুনা যেত ওদের গান। এমনি করে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তো। এমনি করে কেটে গেছল ওর শৈশব—তারপর এল কৈশোর। তখন মনটা যেন হ'ল খানিকটা খেয়ালী। কখনও বৃষ্টিতে মল্ল যুদ্ধ, কখনও জমির ধান তুলে ফেলে লাগাত ঘাসের চারা, গামছা ছেঁকে ধরতো জোঁক, তারপর তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে মাংস করতো। তখনকার কথা মনে পড়লে বাউলের হাসি পায়। আবার কখনও বা জলে নামতেই ইচ্ছা হ'ত না। সবাই এক জায়গায় গোল হয়ে বসে কাউকে ধরতো গল্প বলতে। গল্প শুনতে শুনতে রাজপুত্রের লাল ঘোড়ার পিছু পিছু স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার কাছে মনটা পৌছে যেত।

যখন গল্প শেষ হয়ে যেত মনটা কেমন যেন হয়ে যেত। ইচ্ছা হ'ত এমনি একটা ঘোড়া পেলে সেও চলে যেত দূর দেশে, যেখানে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে সোনার খাটে। বিগত জীবনের কথা ভাবতে ভাবতে বাউলের নাক দিয়ে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে একতারাটা হাতে নিয়ে গান ধরল—

তুমি পড়িতেছে হেসে
তরঙ্গের মতো এসে
হৃদয়ে আমার।

গান গাইতে গাইতে চোখ দুটো বুজে এল। একটি তারের মধ্যে

ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল বিচিত্র সুরলহরী। ভাববিহ্বল ভাবে গেয়ে চলল বাউল—

উচ্ছল পাগল নীরে
তালে তালে ফিরে ফিরে
এ মোর নির্জন তীরে
কি খেলা তোমার
মোর সর্ব বক্ষ জুড়ে
কত নৃত্যে, কত সুরে
এস কাছে, যাও দূরে—
শত লক্ষ বার।

গাইতে গাইতে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল চোখ দুটো। ভেসে উঠল তাপসীর সুন্দর মুখখানা। গান গেল থেমে। হাত থেকে খসে পড়ল একতারাটা ঝন্‌ঝন্ করে।

বাইরে থেকে কে ডাকল—বাবাজী!

বাউল চোখ মুছতে মুছতে শুধল—কে?

—আজ্ঞে আমি সিদাম।

—কি খবর? সুধীর পাঠালে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আজ্ঞে না।—এই বলে কোঁচার খুঁট থেকে খুলে একটা ভাঁজ করা চিঠি বাউলের হাতে দিল।

বাউল চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল—পেরিয়ে বস সিদাম। ভিজছিস্ কেন?

সিদাম ঘরের ভিতর ঢুকে চারিদিকটা একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, —বাবাঠাকুর, আপনার ঘরেও জল পড়ছন দেখছি।

—হাঁ। বাউল চিঠিটা খুলতে লাগল।

সিদাম বলল—বাবাঠাকুর, উনানটা জ্বালেন নাই দেখছি!—চা কি খাওয়া হন নাই?

বাউল অন্যমনস্কভাবে বলল—না রে।

—চা করবো টুকচেন?

—কর।

সিদাম চা করায় মন দিল। বাউল মন দিল পত্রে।

হে মোর তাপস,

এমনিভাবে উপেক্ষা দেখিয়ে চলে যাবার কোন অর্থ বুঝলাম না। হয়তো এমনি নিরর্থক ভাবেই সংসার ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছেন। আপনার মন চাইছিল আপনি আমার অনুরোধে স্নেহমাখা চট্‌চটে কড়্‌কড়ে তেলে ভাজা খান ;-কিন্তু আপনার খেয়াল আপনাকে আমার চৌকাঠ থেকে টেনে নিয়ে গেল।—একি অদ্ভুত খেয়াল আপনার! আপনি নিজেকে বঞ্চিত করে অপরকে আঘাত দিয়েই আত্মতৃপ্তি পেতে চান; কিন্তু সত্যই তা পান কি? বিরহটা সময়ের প্রভাবে সহ্য হয়ে যায়; আঘাতের গুরুত্বও নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু আপনার আত্মবঞ্চনা কলেবর বৃদ্ধি করে। আর তারই অভিমানে আনে আর একটা আঘাত নিজের উপর। সমাজের উপর অভিমান করে বিয়োগজনিত আঘাত দিতেই হয়তো সংসার ত্যাগ করেছেন। নিজেকে সংসারের আশা, আকাঙ্খা, সম্মান,—সব থেকেই বঞ্চিত করে এসেছেন একতারা হাতে একটা কূলভাঙ্গা দামাল নদীর তীরে। হয়তো নদীকে দেখে নিজের দুঃখ ভুলে থাকার চেষ্টা করেন; কিন্তু সত্যই কি ভুলে যেতে পেরেছেন? যতটা আপনার উপর শ্রদ্ধা এসেছিল তার চেয়ে বেশি এসেছিল মমতা।

আপনাকে দেখেই আপনার অভিমানী আত্মবঞ্চনাকারী নিরর্থক ত্যাগী মনটাকে চোখে পড়েছিল। কিন্তু সেই অভিমানী মনটিকে স্নেহ দিয়ে মমতা দিয়ে আটকে রাখার কেউ নেই। আমার ইচ্ছা আপনার সেই অভিমানী মনটাকে স্নেহ মমতায় সকল আত্মবঞ্চনার ক্ষতিপূরণ করি। সেদিন আমার স্নেহ বিগলিত হয়ে ঝরছিল; কিন্তু আপনি চলে যাওয়ায় হঠাৎ সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে—মাথার তেল পর্যন্ত। ঠাট্টা নয়, মাইরি? সত্যই আমি আপনার প্রেমে পড়েছি। আসবার সময় সব সঙ্গে আনবেন;—যেটার অভাব বোধ করবেন সেটাই পাবেন। আপনি ভাবছেন আপনি সন্ন্যাসী নারীর কি প্রয়োজন?—আর আমি ভাবছি আমি তাপসী, আপনার মতো একটি তাপসের সেবায় আত্মনিয়োগ না করলে নারীর সার্থকতা কোথায়? লজ্জা করবেন না—ছোটও যেন ভাববেন না। বড় আমি নই—বড় হতেও চাই না। কিন্তু সমাজের উপর বিশ্বাস আমার নেই। সমাজ, শিক্ষা, রাষ্ট্র, ধর্ম সবই চলেছে আপনার পথে। হয়তো তাও নয়। ওগুলোকে আমার বড় ভয় লাগে। যা প্রকৃতির মর্যাদা

দেয় না, নিয়মের মধ্যে আদর্শকে টেনে আনতে চায়, তাকে আমার ঘৃণা করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ঘৃণাই বা করতে পারি কই? আপনি ত বাউল, কই এমন একটা পথ বাৎলে দিতে পাচ্ছেন না যেখানে নারীর চরম সার্থকতা, পুরুষের পরিপূর্ণতা। যাক এসব কথা। আপনার পথ চেয়ে রইলাম। এর সঙ্গে না এলে দেখাও হয়ত আর এ জন্মে হবে না।

ইতি—

আপনারই তাপসী

পত্রটা পড়া হতেই বাউল ভাল করে পত্রটা একবার নেড়ে চেড়ে সিদামকে বলল—কিরে তোর চা হ'ল?

—এই যে বাবাজী, সব হয়ে গেচ্ছেন—ঝপ করে চার টিন চাঁ ফেলে দিই—এই দিলাম বলে—ফুটন্ত জলটায় চারটি চা ফেলে দিয়ে বাউলের দিকে তাকাল। বার দুই ঢোক গিলে নিচু গলায় শুধাল—চিঠিটা পড়লেন। দিদিমণি কি লিখেচেন?

—দিদিমণি লিখেছেন যেতে; কিন্তু তুই বললি যে সুধীর লিখেছে?

সিদাম মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল—মানে, দিদিমণি বলছিলেন—

—বেশ। চাটা হ'ল?

—এই যে, দিই বাবু। সিদাম চা ছেকে দিল। বাউল চা খেয়ে একতারাটা হাতে নিয়ে বসল। সিদাম ব্যস্ত হয়ে উঠল।

—আবার বসছেন যে বাবাজী?—যাবেন নাই?

বাউল শান্তভাবে বলল—না রে, তুই যা।

—না বাবু, যেতেই হবেন। সিদাম করজোড়ে বসে পড়ল।

বাউল বিরক্তভাবে বলল—কেন, না গেলে তোর ক্ষতিটা কি?

—ক্ষেতিন বইকি বাবু, একশবার ক্ষেতিন। আপনি না গেলেন দু'টাকা ইলাম বন্ধ।

বাউল হেসে বলল—ও, তাই বল। কিন্তু তোকে ঘুষ দিলেও আমাকে পাওয়া নাও যেতে পারে। তুই ফিরে যা সিদাম।—এই বলে, বাউল একতারায় সুর বাঁধতে মন দিল।

সিদাম করজোড়ে বসে বসে ঘামছিল আপন মনে। বাউল সুর বেঁধে

তারে একটা ঝঙ্কার দিয়ে সামনের দিকে তাকাল—কিরে, তুই এখনও বসে আছিস ?

সিদাম ভাবে গদগদ হয়ে উঠল—হুজুর, আপনাকে যেতেই হবেন। বলতে বলতে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল ওর চোখ দুটো।

বাউলের হৃদয়ে কেমন যেন করুণা সঞ্চারিত হয়ে উঠল।

—তুই যা, আমি একটু পরে যাচ্ছি। যা, আর দাঁড়িয়ে থাকিস না যেন।

সিদাম ভয়ে ভয়ে বলল—আপনার কিছু নিয়ে যেতে হবে ?

—না, না তুই যা। সিদাম আর দাঁড়াল না। বাউল খুব জোরে জোরে তারটায় অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে লাগল। বাইরে কড়কড করে মেঘ ডেকে উঠল। আবার বৃষ্টি নামল ঝম্‌ঝম্‌। তার সুর আর কানে গেল না। হাত শিথিল হয়ে এল। চিন্তায় মাথা নত হয়ে গেল। ঘুমে চোখ দুটো জড়িয়ে আসতে লাগল। পাশে একতারাটা নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়ল। সারা রাত্রি অনিদ্রায় ঘুম এসে গেল।

যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন বেলা আর নাই। পশ্চিমের আকাশে বিদায়ী সূর্যের রক্ত-রাগ। বাদলছাড়া প্রকৃতির মাঝে পাখির কাকলী। খাদ্যান্বেষী বনপাখি সবুজ ঘাসের উপর লাফিয়ে চলছে গদা ফড়িংএর পিছু পিছু। ঘোলা নদীর জল আবর্তের সৃষ্টি করতে করতে সশব্দে ছুটে চলেছে দুকূল ছাপিয়ে। বাউলের খুব খিদে পেয়েছে; কিন্তু খাবার ত কিছুই নাই। তাপসীর ওখানে গেলে খুব ভাল আহারই জুটত। সে হয়ত অপেক্ষা করেই ছিল। এতক্ষণে সে তার উপস্থিতির আশা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে। এখন গেলে দেখাও হয়ত নাও হতে পারে। সেই রকমই ত সে লিখেছিল।

বাউল তাড়াতাড়ি পত্রটার উপর আর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। যদি আজ সে নাও থাকে তাহলে সুধীরের কাছে আজকের মত ঠাঁই মিলতে পারে। তারপর না হয় যে কোন শহরে চলে যাবে।

তার মনটা বিরক্ত হয়ে উঠেছে এই ধরণের নির্জীব নিস্পন্দ জীবন যাত্রায়। বাউল সময়টা আন্দাজ করে নেবার জন্যে বাইরে এল। জল কি আর হবে—কে জানে ? বাউল বাইরে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি মেলে দেখল, চারিদিকে জল দাঁড়িয়ে আছে। ঝক্‌ঝক্‌ করছে রৌদ্রের আভায় নির্জন প্রান্তর,—কোথাও জনমানবের লেশ নাই। মাঝে মাঝে বড় বড় কয়েকটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। মোটা মোটা ডালে কত ছোট

বড় ডাল বাতাসে দুলছে। সহস্র হাতের সহস্র ইশারায় তারা কাকে যেন ডাকছে। সামনের বটগাছটায় অনেক ঝুড়ি নেমেছে। ঐ গাছটার একটা ডাল গত বারের ঝড়ে পড়ে গেছে। ছিন্ন বাহু বিশাল দৈত্যের মতো জটাজাল বিস্তার করে সামনেটায় বসে আছে। লোকে বলে এ গাছটায় ব্রহ্মদৈত্য আছে—কেউ বলে ঠাকুর। কিন্তু বাউল কোনদিন কিছু দেখেনি। তবুও আজ কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল বাউলের।

এই নির্জন প্রান্তরে তমসাবৃত বর্ষা রজনীতে রাত কাটাতে হবে জেনে তার গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল। যেন এক দৌড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। মুহূর্তেই মনটা স্থির করে ফেলল, সে পালাবে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্যে কুটিরে ঢুকল ; কিন্তু একতারাটা ছাড়া সঙ্গে নেবার মত কিছুই পেল না। একবার ভাবল একতারাটাও সে এইখানেই রেখে যাবে ; কিন্তু ওটার আকর্ষণ ছাড়তে পারল না।

শেষ সম্বল একতারাটা হাতে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। আর একবার ভাল করে তালপাতার কুটিরটা দেখল শেষবারের মতো। নদীর সে বাঁকটার উপর বসে পা ঝুলিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত তার তারের একতারাটা বাজাত, দুপুর রৌদ্রের সময় সামনের যে পিপুল গাছটার নিচে বসে বসে বিগত জীবনের কথা চিন্তা করত, শেষ বিদায়ের সময় সে-স্থানগুলোও চোখে পড়ে গেল। তার মমতা ভরা আশ্রম যেন করুণ আঁখি মেলে সজল চোখে প্রশ্ন করছে—'কেন চলে যাচ্ছ?' অন্তরের এই মধুর সম্পর্কটা ছিন্ন করে চলে যাচ্ছে বলে এখানের সমগ্র প্রকৃতি পরম বিস্ময়ে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তারই মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বাউলের চোখ দুটোও জলে ভরে এল। চোখ মুছে আর একবার ভাল করে শেষবারের মতো দেখে নিল। তারপর আপন মনে একতারায় বেসুরে আঘাত দিতে দিতে নির্জন প্রান্তর থেকে জনপদের পথ ধরল।

আকাশ পরিষ্কার থাকলেও পথেই জল এল! কোথা থেকে একটুকরো কালো মেঘ এসে বিদায়ী সূর্যের ক্ষীণতম রক্তিম শিখাটুকু বিলুপ্ত করে দিল পশ্চিম আকাশের ললাট থেকে। মেঠো পথের দুধার থেকে ডেকে উঠল মেঘদূত। বৃষ্টি নামল ঝম্‌ঝম্‌। ক্ষুধায় ক্লান্ত দেহটা বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে কাঁপতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন বুকের নিচে পেণ্ডুলামটাও আস্তে আস্তে থেমে আসছে। তবুও পা চালায় বাউল।

একটা শিয়াল ডাইনের ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে বাঁদিকের মাঠে নেমে গেল। বাউল থমকে দাঁড়াল। যাত্রাটা ভালই। এত কষ্টেও বাউলের হাসি পায়। শীতে কাঁপতে কাঁপতে যদি মরেই তাহলে কি আর ভাল হবে?

বেলা থাকতেই পৃথিবীর বুকে নেমে এল ঘন অন্ধকার। পথটা এঁকে বেঁকে মাঠের মাঝে মাঝে চলে গেছে। দুপাশ থেকে দাদুরী ডেকে চলেছে—ঘ্যাং ঘ্যাং। গাছের মাথায় মাথায় জোনাকীর আলো। বাকি সবই কালো। বিদ্যুতের আলোই বাউলের ভরসা। ওরই ধাঁধাঁনো আলোয় সামনেটা একটু এক বার দেখে নিয়ে পথ চলে। কোথাও বা পিছনে পড়ে মাঠের মধ্যে। আবার উঠে হাঁটতে শুরু করে।

যখন সুধীরদের গ্রামে সে এসে পৌছাল তখন রাত কটা কে জানে? ঝিঁঝিঁর দল ডাকছে ঝিঁ ঝি করে। ব্যাং ডাকছে ঘ্যাং ঘ্যাং, কোথাও আলো নাই। গ্রামের রাস্তার উপর ছুটছে নদীর বন্যা! বাউল তখন কাঁপছে—ক্লান্ত দেহখানা এলিয়ে পড়তে চায়। বহু কষ্টে যখন সুধীরের পড়বার ঘরটার কাছে এল তখন আর দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। ঘরের ভিতরে তখন কোন সাড়া ছিল না, আলো ছিল না।

আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল বাউলের। তবে কি সুধীরও নেই? কপাটে হাত বুলিয়ে দেখল বাইরে থেকে শিকল বা চাবি দেওয়া নেই। ভিতর থেকেই বন্ধ। আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। দরজাটা জোরে ঠেলা দিতেই ভিতর থেকে সারা এল—কে?

—আমি বাউল।

কপাট খুলে সুধীর বাইরে এল—এই রাত্রে সারা পথ ভিজতে ভিজতে আসছ? এ যে রীতিমত ঠকঠক্ করে কাঁপছ দেখছি! ভিতরে পেরিয়ে এসে জামাকাপড় ছেড়ে ফেল।

বাউল গা মুছে জামাকাপড় ছেড়ে যখন বসল তখন সুধীরের চা হয়ে গেছে। টেবিলের উপর নামান কাপের গরম চা থেকে বাষ্পকুণ্ডলী উঠছে। গরম চা খেয়ে বাউলের চেতনা অনেকটা ফিরে এল। আস্তে আস্তে বলল—আজ তোমার ঘর এত নিস্তব্ধ ও আলোকহীন কেন?

সুধীর হেসে বলল—রোজ রোজ কি ভাল লাগে পড়তে? তাই বাতির দমটা কমিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়েছিলাম।

—পড়ে পড়ে কি ভাবছিলে? বর্ষার সময় কি দুশ্চিন্তা করে? বাইরে বৃষ্টিপড়ার শব্দ, পিছনে ডোবাটা থেকে ব্যাং ডাকছে, একটু একটু শীত করছে—এমন সময় একখানা চাদর গায়ে টেনে নিয়ে কি চিন্তা করতে ভাল লাগে বলত? এমন সময় লেপমুড়ি দিয়ে ব্যাংএর গান শুনতে শুনতে জেগে জেগে সুখের স্বপ্ন দেখা—

বাউলকে থামিয়ে দিয়ে সুধীর বলে উঠল—ঠিক।—You are right. আমি সেই স্বপ্নই দেখছিলাম। তারপর তুমি এত রাত্রে কোথা থেকে আসছ শুনি? পর্ণকুটির থেকেই, না—অন্ধ কানাই পথের ধারে গান শুনিয়ে ভিক্ষা করে—

বাউল হেসে বলল—না, আমি পঞ্চবটি থেকেই আসছি।

—সকালে কি করছিলে?

—সকালেই আসবো ভেবেছিলাম, কিন্তু বড্ড ঘুম পাচ্ছিল তাই একটু শুয়েছিলাম। যখন উঠলাম তখন দেখি বেলা শেষ। বাদলের শেষে ঝরঝরে রৌদ্রের আলো পড়েছে গাছের পাতায় পাতায়, আমিও বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু পথেই বৃষ্টি—

—অমনি তুমি ভিজে গেলে! বাউলের অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানে সুধীর বলে উঠল—তাহলে উদরে অন্নং নমঃ হয়নি, আর রাত্রে ঘুমও হয়নি—

নিশাকালে তাপসীর তপস্তায় তুমি
জাগি বসে বসে, দিবসে অভুক্ত ঘুমালে
হে বাউল তুমি আমায় হাসালে—হাসালে।

তাপসীর নাম শুনে চমকে উঠল বাউল। সন্ধানের দৃষ্টিতে একবার বাইরের দিকে তাকাল। তারপর ব্যর্থতার নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। সুধীর ওর দুর্বলতা বুঝতে পারল, সে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়াল।

—তাহলে তোমার খাবারটা নিয়ে আসিগে।—সুধীর ছাতাটা মেলে বেরিয়ে গেল। বাউল কপাটটা ভাল করে ভেজিয়ে দিয়ে বসল।

আজ তার বার বার তাপসীর কথাই মনে পড়ছে। যদি সে না গিয়ে থাকে—যদি সে সেদিনের মতো খাবার হাতে নিয়ে ছাতা ঘুড়তে ঘুড়তে ভিতরে এসে দাঁড়ায়।—এই কথাটা চিন্তা করতে করতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ওর দেহটা। অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করল তাপসীর উপর। যেন কত জনমের সে,—যেন কত আপনার। অসীম ব্যাকুলতায় জানালার ফাঁক দিয়ে তাকাল গাঢ় কাল অন্ধকারে—তাপসীরই মমতাভরা চোখ দুটো জল জল করছে যেন। চরম দুর্বলতা পেয়ে বসল মনে। দুর্দমনীয় কামনার দোলায় মনটা দুলে উঠল। কিসের যেন একটা শিহরণ, কি যেন একটা পাবার আকুতি। অথচ একটা উদাসী মন তার হৃদয় আসনে অম্লান, অম্লান তাপসীর মূর্তিখানা। অস্থীরভাবে বাউল দাঁড়িয়ে পড়ল। মন থেকে তাপসীর চিন্তা যতই ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করল ততই তার স্মৃতি উজ্জলতর হয়ে উঠতে লাগল কল্পনার পর্দায়। তাই বাউল তার একতারায় আনল সুরের লহরী, গলায় আনল গানের ঝরণা—

গতিস্তং গতিস্তং মামেকা ভবানী···

সুধীর হাতে খাবার ঝুলিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল। পায়ের শব্দ শুনে বাউল গান বন্ধ করে তাকাল। সুধীর হাসতে হাসতে বলল—ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে কি দেখছ, তাপসী আসে নি। গানটাই গাও—বেশ লাগছে—

বাউল কথা বলতে পারল না। নিরবে তাকিয়ে রহিল সুধীরের দিকে। এতক্ষণ সে তাপসীরই প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু সে এল না।

বাউলকে নিরুত্তর দেখে সুধীর খাবার দিয়ে বলল—নাও খেয়ে নাও আগে। পরেই না হয় গান শুনাবে।

বাউল খেতে খেতে প্রশ্ন করল—তাপসী এল না কেন? সে কি চলে গেছে?

—থাকলে আবার না এসে থাকতে পারতো ভাবছ?—শ্যামের বাঁশীর

ডাক শুনে সে এতক্ষণে দৌড়ে আসতো। আমাকে বলতো,—আমিই খাবারটা দিয়ে আসছি। তারপর জলটা কমলে আমি ফিরে আসবো আর তুমি শুতে যাবে। কিন্তু বৃষ্টি আর কমতো না। দেবরাজকে এমন প্রার্থনাটাই জানাত যে দেবরাজ—আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে। তাপসী রাত কাটাত এখানে, আর আমি বাড়িতে বিছানায় পড়ে শয্যাকণ্টকী।—

সুধীর বলা শেষ করে ওর মুখের দিকে তাকাল। দেখল, একটা নিরাশার কালো ছায়া পড়েছে ওর মুখে। বেদনার ভারে নত হয়ে গেছে মাথাটা।

সুধীর হেসে বলল—বাউলদা দেখছি গভীর প্রেমে পড়ে গেছ।

বাউল ম্লান হেসে বলল—কেন বলত ?

—কেন ?—খাঁচার পাখী ছিল খাঁচাতে, বনের পাখী ছিল বনে। এদিকে বাউলের অনাহারের পর খিদের মুখেও গরম গরম পরটা রুচচে না, আর ওদিকে ট্রেণের কামরায় বসে ঘন অন্ধকারের দিকে মুখ বাড়িয়ে রাত জেগে হয়তো বাউলের কথাই ভাবছে।

বাউলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। মুখ হাতধুয়ে বিছানার উপর বসল।

সুধীর ঠোঁট উল্টে বলল—প্রেমিকের খাওয়া হ'ল না দেখছি !

বাউল হেসে বলল—তোমার চাটনিতেই পেট ভরে গেছে।

—তা' বেশ ! এর পর কি শুয়ে পড়বে ?

—তা ছাড়া ?

—তা বটে, তাপসী ত আর আসছে না।

বাউল হেসে বলল—তোমার কি আর অন্য চিন্তা নাই ? লেখাপড়া কি শিকেয় উঠল !

—উপস্থিত আর অন্য চিন্তা নেই দেখছি। আর লেখাপড়াটা মাঁচায় তুলেছি। কারণ এতে শিকে ছেঁড়ার দুর্ভাবনা নেই।

বাউল কিছুই বলল না। সুধীর বিছানা করতে করতে আবার শুধাল—তোমার তালচটার বাসাটা নদীগর্ভস্থ হল না—আবার ফিরে যাবার খেয়াল আছে ?

বাউল হেসে বলল—এ বছরের যা বাদলা, তাতে কি কাঁচা বাসা টেঁকে ?

—তাহলে বল, পঞ্চবটি আর যাবে না
শিঁয়াকুল আর খাবে না—

—নিশ্চয়ই, এবার ধরি ধনুর্বান
সাথে নিয়ে সৌমিত্রী লক্ষণে
ফিরি বন পথে পথে
বহুদূরে চলে যাব সীতার সন্ধানে !
লঙ্কা করি অবরোধ—
মিত্র বিভীষণ সাথে লব লঙ্কেশ্বর প্রাণ।

—কিন্তু

নহিত রাবণ আমি নহি প্রতিদ্বন্দ্বী তব
নহে এই পাঠাগার মম লঙ্কা তব
সম্মুখের ঘোলা জল নয় কভু দূরন্ত সাগর
তবে কেন অবরোধ ?'

বাউল হেসে বলল—
নহে অবরোধ সখা ।
তুমি মোর মিত্র বিভীষণ।

সুধীরও হেসে উঠল—তাহলে তোমার সীতা উদ্ধার সুনিশ্চিত দেখছি। কিন্তু হনুমান না হলে তার সন্ধান আনবে কে ?

—তুমি ।

—আমি !—হো-হো করে হেসে উঠল সুধীর।—শেষে আমাকেই হনুমান সাজালে,—আমি অত সব হতে পারবো না বাবা।

বাউল চুপ করে গেল। সে ঠিক মতো বুঝবার সুযোগ পায় নি যে সত্যিই তাকে তাপসী ভালবাসে, না একটা মিথ্যা অভিনয় করছে! না তার অন্তরের সাধারণ মানুষটাকে বৈরাগীর বেশের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে,—তাকে বিদ্রূপ করতে,—তাকে উপহাস করতে!—হয়তো তাই ঠিক। তাই স্বাভাবিক। এমনি একটা সন্দেহ জাগতেই তার অন্তরের প্রবল আশক্তি অনেকটা যেন কমে গেল। মনটাও অনেকটা দৃঢ় হ'ল। সে হয়তো এবার তাপসীকে ভুলতে পারবে।

সুধীর হেসে বললে—কি ভাবছ চুপচাপ ?

বাউল রুদ্ধ স্বরে বলল—ভাবছি ? হাঁ ভাবছি। তবে তাপসীর

কথা নয়। তাকে হয়তো ভালবাসি—হয়তো খুবই ভালবাসি; কিন্তু আমার পক্ষে এটা ভুল। একজন বাউলের পক্ষে তা অপরাধ। তবে বাউলের জীবনযাত্রা শেষ হয়ে গেছে। আবার ঠিক পূর্বের জায়গায় ফিরে না এলেও সেখানেই ফিরে চলেছি।

—তবে আর ভুলটা কি হ'ল শুনি? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুধীর তাকাল ওর দিকে।

—ভুল?—না ভুল নয়।—তবে ভুলও। কারণ চাওয়া আর পাওয়া দুটোই পরস্পর থেকে বহুদূরে।—যা চাই তা পাই না, যা পাই তা চাই না। বাউলের কথা বলার মধ্যে গভীর বেদনা প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সুধীর ওর প্রেমের গভীরতা বুঝতে পারল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল—আচ্ছা, তোমার লেখাপড়া কতদূর?

বাউল ম্লান হেসে বলল,—কেন বলত? হঠাৎ বিদ্যের দৌড় জানবার জন্যে এত ব্যাগ্রতা?

—কৌতুহল হওয়া অসম্ভব নয়। বাইরে থেকে যখন তোমাকে চিনতাম তখন মনে হ'ত তোমার গানখানা বেশ। ভাবতাম মেঠো বাউল। কিন্তু যতই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে পরিচয়টা, ততই মনে হচ্ছে তোমার গলার চেয়ে জ্ঞান ভাল; তোমার কথাবার্তায় রয়েছে নিয়মিত শিক্ষার ক্রমবিকাশ আর পরিপূর্ণতা।

বাউল হাসল। সুধীর প্রশ্ন করল—হাসছ যে? একটুও মিথ্যে নয়।

—তোমার মতামত জানাবে, এতে সত্য মিথ্যার কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

—বেশ তাই যেন হ'ল; কিন্তু আসল প্রশ্নটা কি এড়িয়ে যাবে?

বাউল হেসে বলল—নকল প্রশ্ন কোনটা তোমার না জানলে কি বলবো বল।

—আসলটি ছাড়া সবই নকল।

—কিন্তু আসলটি কি—আমার বিদ্যার দৌড় কতটা?

—হাঁ।

বাউল হঠাৎ উদাসী হয়ে উঠল? বলল—নাইবা জানলে ও খবরটা? আমাদের যে পরিচয় আছে বা গড়ে উঠছে এর মধ্যে কার কতখানি বিদ্যে সে পরিচয়ের আমি কোন মূল্যই দেখিনে। হৃদয়ের সম্পর্ক। বিদ্যের সঙ্গে নয়।

সুধীর ক্ষুণ্ণ মনে বলল—যদি বাধা থাকে তাহলে থাক।

—বাধার কথা হচ্চে না ভাই, হচ্চে প্রয়োজনের।

—কিন্তু মানুষের কৌতুহলও ত থাকতে পারে? যদি বন্ধু বলে স্বীকার কর তাহলে কোন কথা আমাকে গোপন করার মানেই হচ্ছে বন্ধুত্বের অমর্যাদা করা।

বাউল হেসে বলল—তাহলে শুনবে?

—না। বাধা থাকলে প্রয়োজন নেই। আমার না জানলেও চলবে।

—না জানলে চলবে বলেই ত বলিনি। তোমার যখন ইচ্ছে শুন।

সুধীর কৌতুহল ভরা দৃষ্টিতে তাকাল বাউলের দিকে।

বাউল আরম্ভ করল—যে বছর অধ্যাপক বন্ধু তার পদের মর্যাদায় ঘৃণায় আমার সঙ্গে কথা বলতে পারল না তখন বড়ই দুঃখ হ'ল। আমি তখন অনুত্তীর্ণ বি, এ। বড দুঃখে আবার পডা শুরু করলাম। যেদিন শুনলাম এম, এ তে প্রথম শ্রেণী পেয়েছি সেদিনই হ'ল পিতৃ-বিয়োগ। তারপর সংসার সমাজ পরিবেশ আর আত্মীয়দের দুর্ব্যবহারে মনের আশা আকাঙ্খা সব কিছুই নিভে এল। সেদিন স্বপ্ন দেখলাম নির্জন সুন্দর প্রকৃতিব ছলনাহীন মরণ সৌন্দর্যের অপরূপ রূপ। মানুষের উপর তখন অপরিসীম অনাস্থা। সেদিন কবিতার এই কটা লাইন আমার মনে আবর্তের সৃষ্টি কবেছিল:

ববঞ্চ বাসিব ভাল বনের শার্দ্দুলে
বরঞ্চ করিব ক্রীডা সপ সহসনে
তথাপি কপটি মানব দলে লব না স্মবণ।

যতদিন মনে এই ভাবটা ছিল ততদিন আর বেরিয়ে পডা হয়নি। ধীরে ধীরে এই ভাবটা কেটে গেল। শুনতে পেলাম উপনিষদের সুর—

অসমো মা সত্মামব
তমসো মা জোতির্গময়
মৃত্যোর্যা মৃত গময়।

সেদিন নূতন এক স্বপ্ন দেখলাম। ছোট্ট নদী। বুকে তার ঢেউ-এর খেলা। হেসে লুটিয়ে পডছে তারা আপন আনন্দে। তীরে কচি কচি ঘাস। বন্য হরিণ শিশু ঢেউ এর খেলা দেখে তীরে নেচে নেচে ফেরে। একতারা হাতে এক বাউল সেই কচি ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে গাইছে।

প্রকৃতি গাছের পাতায় তার আঁচল ছড়িয়ে আকাশের সন্ধ্যাতারায় আঁখি মেলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আর আমি সেই প্রান্তরে, সেই নদীর একটি বাঁকে সবুজ ঘাসের উপর—আগেই তোমাকে সে সব কথা বলেছি।—এতটা বলে বাউল হাসল। এরপর কৌতূহল মিটল ত?

সুধীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—শুধু কৌতূহল নয়, তোমার সম্বন্ধে জানা হয়তো ঠিক মতো হত না। বড় সুন্দর লাগল।

বাউল নিদ্রাজড়িত স্বরে বলল—মানুষের দুঃখটা তোমার কাছে সুন্দর?

—মানুষের দুখ ভোগ নয় ভোগের স্মৃতিটা দুঃখের ছবিটা। বাউল আর কিছুই বলল না।

নিদ্রায় চোখ জড়িয়ে আসছিল, সুধীর অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করল—এবার তুমি কি করবে ভাবছো?

বাউলের কাছ থেকে কোন উত্তর এল না। বুঝল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুধীরও হাতটা বাড়িয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুল।

[৫]

সকাল বেলায় শীতল কর স্পর্শে বাউল জেগে উঠল। চোখ মেলে দেখল, তাপসী তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে। তখনও তার একটা হাত বাউলের গায়ে। বাউল বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল তাপসীকে। ভাবল, এ স্বপ্ন না সত্যি? তাপসী না এখান থেকে চলে গেছে? ঘুমটা ছাড়াবার জন্য বাউল চোখ দুটো ভাল করে রগড়ে আবার তেমনি বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকাল তাপসীর দিকে। তাপসী হেসে বলল—কি উঠবেন, না পড়ে পড়েই শুভদৃষ্টিটা সারবেন?

বাউল লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে বসল—তাপসী?

—অনুমান যথার্থ। কিন্তু হে মহারাজ, শয্যা ত্যাগ করুন। দেখুন পূর্বাকাশে উদিত সূর্য কিঞ্চিৎ ডাঁশাল হইয়াছেন। কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ করতঃ বলদ যুগলের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়াছে, আর কোন্দল প্রিয় রমণীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া পরভৃতিকা পাকশালার দরজায় কা কা করিয়া হত্যা দিতেছে।—

বাউল হেসে বলল—আর তাপসী চা ভূমিকা বর্জিত বিস্ময় রসের গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থিকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছে—

তাপসী খিল খিল করে হেসে উঠল—বাঃ রে, এবারে আমার দোষ? আপনি পড়ে পড়ে ঘুমুবেন আর এদিকে চা ঠাণ্ডা হবে? আমার সব জোগাড় আছে, আপনি মুখ ধুতে ধুতেই চা তৈরী করে ফেলচি।

—তবে তাই কর?

—কেন চা না দেখে উঠবেন না বুঝি?

—চা না খেয়ে উঠতাম না, কিন্তু যখন তুমি এসেছ তখন চায়ের পাত্তা না পেলেও তোমাকে দেখেই উঠবো।

তাপসী চা করতে করতে বলল—ইস, বড় যে টান দেখছি? তাই না বেলা নটা পর্যন্ত ওঠার নাম নেই।

—কিসের আশায় উঠবো বল? আশা বলতেও চাটাই ছিল।

—কেন আমি কোন্ চুলোয় গেছলাম শুনি?

বাউল মুখটা যতদূর সম্ভব গম্ভীর করে বলল—তা ত জানি না। তোমার সুধীরদা ট্রেনে চাপিয়ে তোমাকে কোন চুলোয় যে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন তা উনিই জানেন। তবে আমি জানতাম তুমি এখানে—দেখাও হয়তো সম্ভব হবে না আর।

তাপসী হেসে বলল—সুধীরদা বুঝি তাই বলেছিল আপনাকে? তাহলে আপনার মনটা খুব খারাপ হয়ে উঠেছিল।

—অতিরিক্ত। তোমার সুধীরদা এত ভাল অভিনয় করতে পারেন তা আমার জানা ছিল না।

তাপসী চা বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল—তা বটে। রাতে আমাকেও বলেনি। একটু আগে বললে, আপনি কাল রাত্রে এসেছেন। ঘুমুচ্চেন।

—আর শোনামাত্রই তুমি চলে এলে আমাকে ঠেলে তুলতে।

তাপসী হেসে বলল—তা বেশ, এখন চা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করুন দেখি। বাউল হাসতে হাসতে চায়ের কাপটা মুখে ঠেকাল। চা খাওয়া শেষ হলে খালি গ্লাসটা রাখতে রাখতে তাপসী শুধাল—কাল সকালে এলেন না কেন?

—আসা হ'ল না বলেই।

তাপসী কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলল—তা বই কি? বলুন যে আপনার প্রার্থনা না মঞ্জুর করার জন্তে।

বাউল হেসে বলল — তাতে আমার লাভ কি বল ?

—লাভ বইকি ? সেদিন আমার স্নেহ মমতা মাখা তেলেভাজা না খেয়ে আমার মনে ব্যথা দিয়ে যা লাভ হয়েছিল সেই লাভ—।

—আমি আসবই ত জানিয়েছিলাম। কিন্তু—?

বাউলের অসমাপ্ত কথার পরের অংশটা তাপসীই রচনা করল—কিন্তু অন্তকে আঘাত দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম না। আচ্ছা, Mr. Boul, 'আপনার সাধনার codeএর নির্দেশ কি শুধু,—যে ভালবাসে তাকে আঘাত দেওয়া আর পরম ঈপ্সিতকে ত্যাগ করে আত্মবঞ্চনা করা ?

—তাইত আমার সাধনা
মোর চির বাঞ্ছিত বঞ্চনা
যে মোরে বাসে ভাল
তারে দিই কিছু যন্ত্রণা
তাইত আমার সাধনা।

সুরে সুরে আবৃত্তি করতে করতে সুধীর প্রবেশ করল—তুমি এখনও ওকে চেননি, তাপসী। কাল আমি ওকে চিনেছি। আত্মবঞ্চনাই ওর সাধনা। তার মধ্যে কত বড় ত্যাগ, কত বড় আত্মতৃপ্তি, কি বিরাট সাধনা সে শুধু ওই জানে। তা বুঝিয়ে বলাও যায় না, বিশ্লেষণ করাও যায় না। ও শুধু অনুভূতির জিনিস, তাপসী। বলতে বলতে সুধীরের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠল।

—আমি কাল যেন খানিকটা উপলব্ধি করেছি, তাপসী, আত্মবঞ্চনার মধ্যে কি সম্মোহন ? যে একবার এ রসে ডুববে সে আর লোভ ছাড়তে পারবে না।

তাপসী হেসে বলল—তাহলে দেখছি বাউল মশায়ের আত্মবঞ্চনার গুপ্ত বিদ্যাটা শিখে ফেলেছ। উনিত একতারা নিয়েছেন তুমি তাহলে একজোড়া খঞ্জনী জোগাড় করে নাও। তারপর দুই নব নিমাইচৈতন্য দেশে দেশে আত্মবঞ্চনা প্রেম বিলিয়ে বেড়াও গে।

বাউল হেসে বলল—কিন্তু আমি যে তোমার কাছে নিজেকে ভালবাসতে ও অপরকে ভালবাসবার বিদ্যেটা শিখে ফেলেছি। তাই আমার এই পুরাতন বিদ্যাটা আমার জীবনের সায়াহ্নে অকেজো হয়ে গেছে। তোমার দেওয়া পাথেয়টুকু দিয়েই আমি আমার অনাগত গৃহী জীবনের

নব প্রভাতের আরম্ভ করবো ভাবছি, তাপসী।—উজ্জল চোখ দুটো মেলে তাকাল ওর দিকে। তাপসী শুধু হাসল।

সুধীর প্রশ্ন করল—হাসছ যে?

—হাসছি তোমাদের কথা শুনে। ভাবছি, তোমরা পাগল না আমি পাগল?

সুধীর গম্ভীরভাবে জবাব দিল—পাগল হতে আর কারও বাকি নেই। দশ চক্রে ভগবান ভূত। বাউল যেদিন কলেজে চাকরী নেবে সেদিন ত উনি Regd. পাগল। ওর পরিচিত মহলে অবশ্য মন্তব্য কলমে ওর আরোগ্যের কথাটাও উল্লেখ থাকবে।

তাপসী প্রশ্ন করল—তার তুমি আর আমি?

—সবাইকে পাগল করে ছাড়বো। তুমিত ইতিমধ্যেই বাউলএর নাম পাগলের রেজিষ্টারে তুলিয়ে ছেড়েছ—

তাপসী কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে বলল—তার মানে? পাগলত উনি ছিলেনই। আমিই ওঁকে আরোগ্য করলাম বরঞ্চ। কি মিষ্টার বাউল, তাই না?

বাউল হাসতে হাসতে বলল—দুটোই ঠিক, তাপসী। তুমি আমায় পাগল করেছ, আরোগ্যও করেছ। এতদিন পাগল সবাই বলতো না। এটা যে আমার ধর্মানুরাগ, হয়তো তাই অনেকে মনে করতো; কিন্তু যেদিন সাদা পোষাকে আমি আমার পুরান পরিবেশে গিয়ে দাঁড়াব সেদিন সবাই বলবে লোকটা সত্যই পাগল। কেউ বলবে, এতদিনে পাগলামিটা গেছে।

তাপসী কিছুক্ষণ চুপ থেকে প্রশ্ন করল—সত্যই কি আশ্রম জীবন ত্যাগ করছেন?

—হ্যাঁ তাপসী, আর আশ্রম জীবন মোটেই ভাল লাগছে না। ও পথটা আমার নয়। একদিন যে নির্জনতা আমার কাছে পরম সৌন্দর্যের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতো কাল তাই আমার দৃষ্টির কাছে বড় বীভৎস ঠেকল। কেমন যেন ভয় ভয় করছিল।—এই পর্যন্ত বলে উদাস দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে বাউল তাকাল।

তাপসী আবার প্রশ্ন করল—বাড়ি ফিরে যাবেন কি এখন?

বাড়ির নাম শুনে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ল বাউলের। গাঢ় স্বরে বলল—বাড়ি ফিরে যাবার মতো আকর্ষণ কিছু নেই আমার। জন্মভূমি কিন্তু—

—কিন্তু সে মোহও নেই, এইত? তাপসী বলে উঠল—কিন্তু কোথায় উঠবেন, কি করবেন কিছু ঠিক করলেন কি?

বাউল উত্তর দেওয়ার আগেই সুধীর বলল—কি আর করবে? কোন কলেজে প্রফেসারী নেবে আর কি?

বাউল কিছুই বলল না। তাপসী প্রশ্ন করল—আগে কি প্রফেসারী করতেন?

বাউল মাথা নেড়ে বলল—না।

সুধীর ওর নামটি বিশ্লেষণ করে বলল—ঠিক সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ার আগেই ও M. A. পাশ করে। যখন first class পেয়েছে তখন প্রফেসারীর অভাব হবে না।

তাপসী শুধাল—কবে শহরে রওনা হচ্ছেন?

—তার ত ঠিক নেই। তোমাদের এখানে হয়তো দু-একদিন থেকেও যেতে পারি।—এই বলে বাউল হাসি মুখে তাপসীর দিকে তাকাল।

তাপসী ম্লান মুখে ওর দিকে তাকাল নির্বোধ দৃষ্টিতে। সুধীর ওর এই ভাবান্তরটা স্পষ্ট করে দিল বাউলে কাছে। বলল—ও আজ বাড়ি যাচ্ছে। এই নির্মম সংবাদ শুনে বাউলের মুখেও কোন কথা এল না। দুটি সজল চোখে, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাপসীর মুখের দিকে তাকাল।

তাপসীর মুখেও কথা ছিল না। শুধু মাথা নাড়ল। তাপসীর নিরব স্বীকৃতিতে বাউলের বুক থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ল। কোন কথাই আর বলতে পারল না। সমস্ত ঘরটাতেই যেন গভীর স্তব্ধতা।

এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা নেমে এল হাস্য চপল আসরে। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথাই বলল না। হঠাৎ এক সময় তাপসী হো—হো করে হেসে উঠল—বা বেশ মজা তো—সবাই বোবা হয়ে গেলাম নাকি? বেশত চুপ চাপ বসে আছি।—

সুধীর গম্ভীর গলায় বলল—হু।

বাউল সহজভাবে বলল—তাহলে আজ তুমি যাচ্ছ?—কোথায় যাবে —বাড়ি?—বাড়ি কি শহরে?

তাপসী হাসি মুখে বলল—না বাড়ি শহরে নয়, বাড়ি পল্লীগ্রামে। তবে শহরেই মানুষ হয়েছি। আর দেশের বাড়িতেও যাইনি কখন। বাবার ইচ্ছা এবার আমরা দেশের বাড়িতেই থাকি। বাবা মাঝে এসে

ঘরদোর সংস্কার করিয়ে গেছেন। মাকে এনেছেন। আমাকেও ওখানে যাবার জন্যে চিঠি দিয়েছেন। আমিও গতকালের date এ start করছি বলে চিঠি দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু গতকাল বৃষ্টির জন্যেই যাওয়া হয়নি। আজ নিশ্চয়ই যাব।—এতটা বলে তাপসী থামল। তারপর সঙ্কুচিত-ভাবে বাউলকে অনুরোধ করল—আপনিও চলুন না আমার সঙ্গে—!

—আমিও যাবো?

—হাঁ, যদি ভাল লাগে তাহলে ওখানেই—

—চিরদিনও থেকে যেতে পারো।—তাপসীর অসমাপ্ত কথার মাঝখানে সুধীর বলে উঠল—এবং দুজনার মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে তাপসীর টানে আটকা পড়ে যেতে পার কিম্বা ওকেই টেনে নিয়ে শহরে তুলতে পার। তাপসীর দুটোতেই সম্মতি।—রহস্যভরা দৃষ্টিতে সুধীর তাপসীর দিকে তাকাল। বাউল লজ্জায় সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

তাপসী হেসে বলল—পাগলামি ছাড়া আর কিছু জান না?

—না, কিন্তু তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণটাও যেন পাই।

—বিয়ে? ম্লান হাসল তাপসী।—বিয়ে?—কেন, ও বন্ধনটা ছাড়া কি নর-নারীর আর কোন বাঁধন হতে পারে না?—ও ধরণের ভালবাসা ছাড়া কি অন্য ধরণের ভালবাসা বাসতে পারা যায় না?

—যায় বইকি, সবই যায়। কিন্তু সমাজের সংস্থা, সৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বাজায় রাখবার জন্যে এ ধরণের ভালবাসা ছাড়া উপায় নেই।

তাপসী কিছুই বলল না। সুধীর বলে চলল—বিবাহই আমাদের ধর্মের ভিত্তি। সিঁথিতে এক ফোঁটা সিঁদুরের অঙ্কন একটা ফুলের মালা আর তারই সঙ্গে পরস্পরের স্বীকৃতি—তব হৃদয়ং মম হৃদয়ং—তুমি আমার জন্ম জন্মান্তরের পত্নী—তুমি আমার জন্ম জন্মান্তরের পতি—ব্যাস, অন্তরের সেই বলাটুকুই, সেই স্বৃতিটুকুই পরস্পরকে করে তোলে চির আপনার। পত্নী মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্ন স্বামীর শয্যার পাশে বসে অনশনে পরম নির্ভরতায় চরম প্রত্যাশায় সেবা করে। নিজের সুখ, শান্তি, কামনা, বাসনা, সবই তার রুগ্ন স্বামীর সেবায় তারই শয্যায়। Florence Nightingleএর সেবা ধর্মও সেখানে ম্লান।

আর স্বামী বহন করে স্ত্রীর সমস্ত দায়িত্ব। সেখানে কর্তব্যের অজুহাত

নাই, আছে অন্তরের গভীরতা—পরম শান্তি—চরম তৃপ্তি। বিবাহই হিন্দু ধর্মের কেন্দ্র—সার মর্ম—যেমন ভগবান বলেছেন—

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ
গীতা মে পরমং তপ

বাউলের নাক দিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ল। তাপসীর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল—ও যেন কিছু দেখতে পেয়েছে। সুধীর বলে চলল আবার—তেমনি হিন্দু ধর্মের হৃদয় হ'ল বিবাহ ধর্ম—গার্হস্থ্য ধর্ম। যদি খেলার ছলেও এক কৌটা সিঁদুর মাথা পেতে নাও, গলায় একটা মালা ঝুলিয়ে বল, তুমি আমার স্বামী—অভিনয়ের ছলেও কাউকে ভালবাসা দাও—তাহলে তার একটা অধিকার জন্মে যায়। সেখানে সেই স্মৃতিটুকুর যদি প্রভাব মনের কোণেও জাগ্রত থাকে তাহলে সেই স্বামীর আসন গ্রহণ করে নারী ধর্মেও আঘাত দেওয়া হয়। দেহটাই সেখানে বড হয়ে উঠে। আবার বিবাহকে এড়িয়ে যাওয়াও চলে না,—তাতেও ধর্মচ্যুতি ঘটে। নারীত্বের বিকাশ হয় না। তুমি লেখাপড়া শিখে সেই সনাতন ধর্মকে অগ্রাহ্য করে হিন্দু ধর্মের হৃদয়ে আঘাত দিও না, তাপসী। তুমি বিয়ে কর। আমার অনুরোধ নয়, সমগ্র জাতির অনুরোধ—। তাপসীর অশ্রুপূর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সুধীর অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানে থেমে গেল। আর কিছুই বলা হ'ল না। তাপসী চোখের জলটা মুছে নিয়ে বলল—আমি যাই।—মাথা নিচু করেই তাপসী চলে গেল। বিমূঢ়ের মতো বাউল প্রশ্ন করল—তাপসীর কি হ'ল? সুধীর বলল—কি জানি বল? ও বেঁকে বসেছে বিয়ে করবে না। ওর মা বাবা কিছুতেই রাজি করাতে না পেরে এখানে পাঠিয়েছিল। যদি থাকতে থাকতে দৈনন্দিন পরিচয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রেম জন্মায় তাহলে হয়তো মতটা পালটাতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ। এমনি তার প্রহেলিকা যে আমি ওর বিন্দুবিসর্গ বুঝলাম না। এতো ঘনিষ্ঠতা দেখিয়ে যখনই বিয়ের কথা তুলেছি নাটকীয় ভঙ্গিতে বিয়ের প্রস্তাব করেছি তখনই ও এমন ভাবে সহজ সরল ছেলেমানুষের হাসি হেসেছে যে আমার সকল চেষ্টা, মূল প্রস্তাব হাসির জোয়ারে ভেসে গেছে। আমরা সেই একই দূরে রয়ে গেছি। যেদিন তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় হ'ল, তোমাকে এমনি সহজভাবে

আপনার কাছে নিলে ভাবলাম,—Love at first sight—তোমাকে ও ভাল বেসেছে। বাইরের প্রকাশেও ওর ভালবাসা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ভাবতাম, যদি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয় তাহলে অন্ত বাধা এসে পড়বে না তো?—কিন্তু যখন দেখলাম কোন বাধাই নাই, তুমি যোগ্য পাত্র তাই প্রস্তাব করলাম। কিন্তু এবার হেসে উড়াতে পারল না, এবার কেঁদে প্রস্তাবটাকে ভাসিয়ে দিলে। আমার মনে হয় কোন একটা রহস্ত আছে এর ভিতর।—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বাউলের দিকে তাকাল। বাউল অন্তমনস্কের মতো বলল—হতেও পারে, কিন্তু তার কাছ থেকে কিছু জানতে পার নি—ওকে কিছু শুধাও নি?

সুধীর হাসল—শুধালেই যদি প্রকাশ করতো, ইচ্ছা করলেই যদি জানতে পারতাম তাহলে রহস্তের অবকাশ থাকতো কোথায়? বাউল কথা বলল না। উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকাল। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। ঝলমলে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে গাছের পাতায় পাতায়। সামনের অশ্বত্থ গাছটার টুগডালে বসে একটী পাখি লেজ নাড়ার তালে তালে গান গাইছে।

[৬]

পরন্ত রৌদ্র, বেলা যায়। বিদায়ী সূর্যের আরক্ত আলোর ছটা জানলার ফাঁক দিয়ে বাউলের চিন্তাক্লিষ্ট নিদ্রিত চোখে পড়তেই সে চোখ মেলল। যেন বিদায়ী আলো ওর চোখের উপর হাত বুলিয়ে জানাল—বেলা শেষের বিদায়। বলল—বন্ধু জাগো। বেলা হ'ল শেষ। বাউল বিছানার উপর উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে পশ্চিমের জানালাটা খুলে ফেলল। পরিষ্কার মেঘশূন্য আকাশের নীলিমায় অস্তগামী রবির সাতরাঙা রঙে এক রঙিন স্বপ্নের আবেশে ওর মনকেও স্বপ্নালু করে তুলল। সেখান থেকে আর সরে আসতে পারল না। দুহাতে জানালার কপাট দুটো চেপে ধরে জানালার রডের মধ্যে মুখ গুঁজে তাকিয়ে

রইল পশ্চিমের দিকে। ধীরে ধীরে আলোর ছটা কমে এল। গাছের পাতায় পাতায় ছড়ান আলোর টুকরো চোখের সামনেই নিজে কোন এক বিশেষ অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্যেই প্রকৃতির শুভ্রতায় ম্লানরূপ আত্মপ্রকাশের পথে। বেলা যায় যায়। বাউলের নাক দিয়ে নিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ল। তার জীবনেও অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। তার চোখের আলোও এমনি করে সরে যাচ্ছে। তাপসীও বিদায় নেবে। পশ্চিম আকাশের রক্তিম আলোর মাঝে ক্ষণিকের জন্যে তাপসীর মুখ-খানা ফুটে উঠল। তারপর প্রকৃতির পট থেকে আলোর সঙ্গে স্বপ্নও গেল মুছে। মসীলিপ্ত পশ্চিম আকাশের নিচে ঝাপসা দৃষ্টিকে হারিয়ে যাওয়া ছবিকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল—তাপসী!!! বলুন।—চা হাতে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে তাপসী উত্তর দিল—আপনি কি আমার ধ্যান করছিলেন ?

বাউল নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—কেন বলত ?

—না হলে পশ্চিমের জানালায় মাথা গুঁজে, আমি ঘরে আসার আগেই আপনি কেমন করে জানলেন আমি এসেছি !

—তুমি এসেছ জেনে।

—সেইত প্রশ্ন, জানলেন কেমন করে ?

বাউল হেসে বলল—দেবদ্বিজ প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী
তেনাহমবগচ্ছামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা।

বাউল শ্লোকটি আবৃত্তি করে তাপসীর দিকে তাকাল—একি, বিদায়ী বেশ ?—সত্যই তুমি যাচ্ছ বুঝি ?

তাপসী স্মিতমুখে বলল—এই বুঝি আপনার কবি হৃদয়ের পরিচয় ? কালিদাসের সৌন্দর্যবোধ যেমন ভানুমতির জন্মস্থিত তিলের কথা জানতে পেরেছিল তেমনি তার কবিহৃদয়, কল্পনাপ্রবণ মন সসেমীরার কয়েকটি অক্ষরকে অবলম্বন করে, ভালুকের ও রাজপুত্রের কাহিনীও রচনা করে নিতে পেরেছিল। কিন্তু আপনি আমার আগমনটা জানতে পারলেন আর যাওয়াটা জানতে পারলেন না ?—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাপসী বাউলের দিকে তাকাল।

—তাই হয়, তাপসী।—বাউল ম্লান হেসে বলল—ঐ একটা জায়গাতেই আর পুরুষের বুদ্ধি খোলে না। জ্ঞানী, অজ্ঞানী সবারই। কালিদাসও

জানতে পারেন নি যে লক্ষহীরাই তার প্রাণঘাতিকা। অসংলগ্ন কথা কটা বলে ফেলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল তাপসীর দিকে। কিন্তু তাপসী কিছুই বলল না। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বলল—দেখুন হয়তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

বাউল এক নিঃশ্বাসে চাটা পান করে খালি কাপটা ডিসের উপর নামিয়ে রাখল। তাপসী বাইরের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল, কাপটা রাখার শব্দ শুনে চমকে উঠল—একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেছল বুঝি? আচ্ছা লোক ত আপনি? কেন, বলতে পারলেন না?

বাউল হেসে বলল—লোকটার কি দোষ বল?

তাপসী রেগে বলল—কিচ্ছুনা। খুব ভাল লোক আপনি!

বাউল ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে আর সাহস করল না। তাপসী কাপটি হাতে নিয়ে বলল—আমি যাই।—এখুনিই বেরুতে হবে—গাড়ি বোধ হয় তৈরী।

বাউল আস্তে আস্তে বলল—এই অবেলায়? সন্ধ্যাত হ'ল হ'ল।

তাপসী হেসে বলল—কেন ভয় কি? তাছাড়া ট্রেণ ত রাত্রে। আগে থেকে পৌঁছে লাভ কি?

—তোমার ট্রেণ কটায়?

—নটায়! তবে এবার বেরুতে হয়েছে। এতটা রাস্তা গাড়িতে যেতে হবে, বরঞ্চ একটু earlier পৌঁছানই ভাল। ট্রেণ ফেল হওয়ার ভয় থাকবে না। দেখি গাড়ি তৈরী হল কিনা?—এই বলে ব্যস্ত হয়ে বাইরে পা বাড়াল।

এই হয়তো শেষ দেখা। আর হয়তো দেখা করবার সময়ই পাবে না তাপসী। এক কাপ চা দিয়ে শেষ বিদায় জানাতে এসেছিল।

সম্পর্কটাকেও চায়ের মতো খুবও তরল করে দিয়ে গেল। পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে গেল। চোখের সামনে ও আকাশের চিত্ররেখার মতোই মুছে যাবে। রাত্রির অন্ধকার নেমে আসবে।—ভাবতে ভাবতে ব্যাকুল হয়ে উঠল বাউল। উন্মাদের মতো ডেকে উঠল—তাপসী তাপসী! ডাক শুনে আমগাছের তলা থেকে ফিরে এল—কি বলছেন?

সহজ সরল প্রশ্ন। কোন ব্যকুলতা নাই। কোন উষ্মা নাই। বিচ্ছেদের এতটুকু বেদনারও ছাপ নাই তাপসীর প্রশ্নে। বাউল বিমূঢ়ের মতো

তাকাল ওর মুখের দিকে—কোথাও যদি এতটুকু মনস্তাপ বোধ—কোথাও যদি এতটুকু অনুরাগ!—কিন্তু কই? সহজ প্রশ্নের মতো সহজ সরল ওর মুখখানা। বাউল কিছুই বলতে পারল না।

তাপসী আবার প্রশ্ন করল—কই কিছুই বলছেন না যে! চা খাবেন কি আর একটু?

—না।

—তবে?

—শুধু তোমাকে একবার দেখবো বলে। কথাটা বলতে বলতে বাউল আড়ষ্ট হয়ে উঠল। তাপসী হেসে বলল—ও এই, তবে যাই। এখনই বেরুতে হবে। তাপসী যাবার জন্তে ঘুরে দাঁড়াল। বাউল আবার ডাকল—তাপসী !!!

তাপসী মুখ ফিরিয়ে বলল—বলুন। বাউল ছলছল চোখে তাপসীর মুখের দিকে একবার তাকাল, তারপর সহজ ভাবেই আবৃত্তি করল—

বক্ষে রাখিতে ভার যদি লাগি চোক্ষের দেখা দিও।

আবৃত্তি করতে করতে থর থর করে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। টস্ টস্ করে দুফোঁটা জল ওর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল। তাপসীর চোখ দুটোও স্বচ্ছ হয়ে উঠল। আঁচলের খুঁটে ওর চোখ দুটো মুছে দিতে দিতে বলল—চোখের দেখা দেব বলেই ত আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।

বাউল বিস্মিত হয়ে বলল—আমাকে? আমাকে নিয়ে যাবে?

তাপসী মাথা নেড়ে বলল—হাঁ আপনাকে।

—কই আমাকে ত বলনি।

—তাহলে কি আপনার চোখের দুফোঁটা অশ্রু মুছিয়ে দেবার সৌভাগ্য হ'ত। গভীর অনুভূতির সঙ্গে তাপসী কথাটা বলল।

বাউল রহস্য করে বলল—তাহলে তোমরা দুভাই বোনই বেশ রহস্য করতে পার দেখছি।

'—World is a Stage
And we men and women
Are players play in······আবৃত্তি করতে করতে সুধীর ঘরে এসে দাঁড়াল। মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি, পরনে একটা পাতলুন।

বাউল হেসে বলল—একি বিচিত্র বেশ তোমার ?

সুধীর হেসে বলল—মানুষের মনের কাছে আমার দেহের এই বিচিত্র বেশও হার মেনে যায়।

এই বলে একটু থেমে ব্যস্তভাবে বলল—চল, আর কেন ? রথ তৈরী।

তাপসী বলল—একবার বাড়ি যাব না ?

—কি করতে আর ! মিছিমিছি দেরী করতে যাবে। তোমার সবই গাড়িতে চাপান হয়ে গেছে।

তাপসী হেসে বলল—কিন্তু জিনিসপত্র ছাড়া কি আমার আর কিছুই নেই বাড়িতে !

সুধীর সহজ ভাবেই বলল—না।

—কেন, মাকেও কি গাড়িতে তুলেছ ?

—তাঁকে ত আর তোমার দ্রব্যজাত করা যায় না।—তবে তোমার প্রণাম গ্রহণ করবার জন্তে গাড়ির কাছেই অপেক্ষা করছেন।

তাপসী নিরুত্তরে বাউলের একতারাটি হাতে নিয়ে বলল—উঠুন, বাউল মশায়।

সুধীর বিস্মিত ভাবে বলল—ওকেও নিয়ে যাবে নাকি ?

—নয়তো কি আমি একাই যাব ভাবছ নাকি ?

—কেন, আমি রেখে আসতাম !

—তার লক্ষণ ত তোমার দরবেশী পোষাক !

—কেন পোষাকের দোষ কি ? লাঠি ঘাড়ে তোমার body guard সেজে পৌঁছে দেব।

তাপসী হেসে বলল—ফলেন পরিচিযতে। দেখাই যাবে রণস্থলে।

—তা দেখ, কিন্তু এখন যুদ্ধার্থে রথে চড়বে। চলোত লক্ষ্মী ছেলের মত। একতারাটি হাতে নিয়ে তাপসী বাইরে পা দিল। বাউলও সঙ্গে চলল।

যেতে যেতে সুধীর প্রশ্ন করল—আপনি চললেন তাহলে আমাকে ছেড়ে ? বাউল কিছুই বলতে পারল না। তাপসীই ওর হয়ে জবাব দিল—তাছাড়া ওর উপায় কি। একতারাটি যে আমার হাতে।

তাপসীকে উদ্দেশ্য করে সুধীর বলল—কিন্তু আমার কথাটা ভাবলে না। যদিবা বিচ্ছেদটা ভুলতাম ওর সহচার্যে, ওর গান শুনে, তাও

তুমি রাখলে না। গত জন্মে তুমি আমার শত্রু ছিলে নিশ্চয়ই। এ জন্মেও কম যাচ্চ না দেখছি—

—তোমার মারাত্মক রকমের ভুল হচ্ছে, সুধীরদা। আমি যে তোমার কতবড় মিত্র তা বুঝবার ক্ষমতা তোমার নেই। আর বাউল মশায়কে যে নিয়ে যাচ্ছি সেও তোমারই ভালর জন্যে। এ বিচ্ছেদ ভুলবার জন্যে বই পড়বে। বই পড়ে পাশ করবে। পাশ করে চাকরী করবে। চাকরী করে ঘরে আনবে নূতন অবগুণ্ঠিতা কুণ্ঠিতা বেতসীলতার মতো বিনয়ী বধূ। বাঁধবে সুখের সংসার। ভুলবে পুরাতন স্মৃতি। হাস্য চপল অলীক দিনগুলি আর আমার বিচ্ছেদ। বন্য জীবনের কাঁটার একটু সামান্য আকারের স্মৃতির মতো সবই হয়ে যাবে বিস্মৃত।

—আর বাউলকে রেখে গেলে? প্রশ্ন করল সুধীর।

—তাহলে হ'ত উল্টো। জীবনটাই যেতো পাল্‌টে। বাউল মশায় মনে পড়িয়ে দিত আমার ছায়া। তুমি রূপ দিতে কাব্যে—ও সুর দিত গানে। তোমার ও ওঁর মধ্যে বিচ্ছেদ ধারণ করতো অসম্পূর্ণ ভাবে। তমসার ছায়ার মতো ছেয়ে ফেলত তোমাদের। ওঁর সাধনার একাগ্রতা চুরমার হয়ে যেত। তোমার অধ্যয়ন হ'ত অধঃ,—তুমি পরীক্ষায় হতে ফেল। উনি তোমার সঙ্গে তাল রেখে চলতেন। যখন তুমি ভুলতে আমাকে তখন তুমি ভারি বকে যেতে। দেখতে একটা মিথ্যা রোম্যান্স জীবনের রোমান্সটাই খেয়ে ফেলেছে। জীবনের সব স্বপ্নই গেছে শুকিয়ে। নির্মম বাস্তবের বন্ধুর পথ চলায় অভ্যস্ত হওনি। সেদিন রক্তরাঙ্গা পায়ে আড়ষ্ট হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে। বাউলের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—বাউলেরও হত সেই দশা। একদিন এই স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গত। সেদিন নিজেকেও চিনতেন, জগতকেও চিনতেন। কিন্তু সেদিনের সেই অভিজ্ঞতা নিজের কোন কাজে আসতো না। সেদিন বুঝতেন সাধনাও হ'ল না, সাধও মিটল না। সেদিন উন্মাদ হয়ে হয়ত পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন।

সুধীর হেসে বলল—ও, তোমার কি অসীম দয়া, ভাগ্যিস তুমি এত বুদ্ধি খাটিয়ে বাউলকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, তাইত আমরা বেঁচে গেলাম!

তাপসী গম্ভীরভাবে বলল—রহস্য নয়, সুধীরদা। যা বলছি সত্যই তাই হ'ত তোমাদের।

—যেখত তার পরীক্ষাই হ'ক না।

তাপসী চলতে চলতে—পরীক্ষাই যেখানে শেষ পরিচয়, যেখানে সংশোধনের উপায় থাকে না, যেখানে ভুলটা শুধু ভুলই থাকে না সে বিধাতার কলমের অনিবার্য, ভবিতব্য—কপালের শেষ পরিণতি ?

বাউল কিছুই বলল না। নির্বাক পদক্ষেপে এগিয়ে চলছিল অদূরের এই বাঁকটার দিকে—যেখানে গো-গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল।

সুধীর মাথা নেড়ে বলল—তা ত বুঝলাম না।

—কি বুঝলে না ?

—তোমার কথার অর্থ তোমার বক্তব্য।

—তোমার বুদ্ধির দোষ।—এই বলে স্মিতহাস্যে তাকাল ওর দিকে। বলল—পিয়াঁজ দেখেচ তো ? পিয়াঁজ খোঁসারই গ্রন্থি—এই শ্রুত সত্যকে অবিশ্বাস করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে যাও তাহলে দেখবে খোঁসা ছাড়িয়েই মরবে, পেঁয়াজ খাওয়া আর হবে না।

তারা কথা বলতে বলতে গাড়ির কাছে এসে পড়েছিল। তাই সুধীর আর প্রতিবাদ করতে পেল না। শুধু একটা সংক্ষিপ্ত 'হু' বলল। সেটা যে স্বীকৃতি না তা বুঝবার অবকাশও দিল না তাপসীকে।

গাড়োয়ান তাড়া দিল—চেপে পড় দিদিমনি, ইষ্টিশিন পৌঁছাতে তিন ঘণ্টার কম হবে না। ওঠুন দাদাবাবু।

তাড়াতাড়ি সুধীর আর বাউল চেপে পড়ল গাড়িতে। ওদের দেখা দেখি তাপসী সুধীরের মা ও পিসীকে প্রণাম করে গাড়িতে চেপে বসল।

সুধীরের মা ম্লান মুখে ওকে চুমু খেয়ে বলল—আবার আসবে, মা। এবার যেন ওবেশে এস না। মেয়ের সম্পদই যে, মা, স্বামী। সে সৌভাগ্য যেন তোমার হয়, মা।

সুধীরের পিসি মুখ গোঁজ করে বলল—যেন সুমতি হয়।

তাপসী নিরবে মাথা পেতে নিল ওদের আশীর্বাদ। একটু প্রতিবাদও জানাল না। গাড়ি ছেড়ে দিল।

তিনজন যাত্রী। সাদা সাদা দুটো বলদ, ভারি তাগদ—নাদুস নুদুস চেহারা নিয়ে হেলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে লম্বা পা ফেলে। ওরা চলার সঙ্গে সঙ্গে গলার ঘন্টিগুলো বেজে উঠল। গাড়ি এগিয়ে চলল ঝুম ঝুম্—ঝুম্—ঝুম্। গাড়োয়ান গলা ছেড়ে নিজস্ব সুরে গান ধরল—

ছইএর ভিতর নির্বাক তিনটি প্রাণী। কারো মুখেই কথা নাই। তাপসী পিছনের দিকে, অস্পষ্ট অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে আছে। ঘন হয়ে উঠছে ক্রমে অন্ধকারটা। দিনের আলো নিমেষে মুছে গেছে পৃথিবীর পট থেকে। একটা কালো ছায়া ক্রমেই পৃথিবীর বুকে আসন পেতে ফেলছে। গাছের পাতায় পাতায় জলছে জোনকীর দল। ঝিঁঝির দল ধরেছে সান্ধ্যবন্দনা একটানা একঘেঁয়ে সুরে। তবু ভাল লাগে তাপসীর। কান পেতে ওদের গান শোনে, চোখ মেলে অন্ধকারকে ভাল করে দেখে নেয়?

হঠাৎ গাড়োয়ান গান থামিয়ে বলল—দাদাবাবু, বিড়ি আছে?

বিড়ি দিয়ে সুধীর শুধাল—কতটা পথ এলাম রে?

লোকটি বিজয়গর্বে বলল—এবার শেষ করে এনেছি, দাদাবাবু। আর মাইলটাকও হবে নাই। চ্যাংবেঙ্গে গরু নতুনের কান কেটে দিবে।

সুধীর নিজেও একটা বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলল—তা তোর গরু ভাল।

—ভাল কি দাদাঠাকুর, গাঁয়ের সেরা গরু। গাড়ি ছাড়লেই ওরা বুঝতে পারে কোথায় যেতে হবে?

তাপসী হেসে বলল—তাহলে তুমি কষ্ট করে না এলেই ত পারতে!

লোকটি দমবার পাত্র নয়। বলল—তাত পারতাম কিন্তু—

সুধীর ওর অসম্পূর্ণ কথায় বাকিটা যোগ করে দিল—কিন্তু বাঘ ভালুক।

লোকটি উত্তেজিতভাবে বলল—রেখে দাও তোমার বাঘভালুক। আমার বাদশার কাছে বাঘভালুক?

তাপসী প্রশ্ন করল—তোমার গরু দুটির নাম বুঝি বাদশা?

লোকটি একগাল হেসে বলল—না দিদিমনি, এই ডাইনেরটির নাম বাদশা। নামেও বাদশা কাজেও বাদশা। চালটা পর্যন্ত বাদশার মত। দেখচেন না কেমন চলছে—যেন মস্ত বাদশা।

তাপসী হেসে বলল—বাদশা বুঝি এমনি চলে?

লোকটি বলল—তা চলে না? যেন কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। পিথিমিতে যেন কাউকে ভয় নাই।—চেহারাটা দেখচেন না, দিদিমনি, যেন হাতী। বাঘ সিংহ চাপা পড়ে মারা যাবে। খাওয়া দাওয়াও বাদশার মত। বাবুর মত ভালটি-মন্দটি ছাড়া রুচে না।

তাপসী ফিক্ করে হেসে ফেলল—কি খায়, লুচি মিষ্টি?

লোকটি ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল—হাসি নয়, দিদিমনি, লুচিমিষ্টিই খায়। আমাদের যেমন লুচিমিষ্টি আছে গরুদেরও তেমনি লুচি মিষ্টি আছে। সব গরু যেমন পোয়াল খায়, শুক্নো ঘাস খায়, ওর তা রুচে না। ওর জন্তে ছোট ছোট করে ছানি কেটে দিতে হয়। তাও আবার খোল ভিজিয়ে ছিটে না দিলে মুখে করে না। কচি কচি তাজা ঘাস যে মাঠে থাকে না সেখানে ও মুখ নামায় না—ও বড্ড বাবু দিদিমনি।

সুধীর বলে উঠল—তাহলে বাদশাই বটে। আর একটার যেন কি নাম?

—বাঘা।

—বাঘা? তা ওর নাম এমন হ'ল কেন?—তাপসী বিস্মিতভাবে তাকাল।

লোকটি প্রসন্ন মুখে বলল—ও যে বাঘকে হারিয়ে দিয়েছেন গো।

—সে কি, বাঘকে হারিয়ে দিয়েছে?

—সেকি এখন, দিদিমনি! তখন ও ছিল এতটুকুন। মায়ের সঙ্গে বনে গেছলেন চরতে। একটা বাঘ বেরিয়ে উনার মাকে ধরেছিলেন; কিন্তু এতটুকুন বাদশা বাঘকে হারিয়ে দিয়ে একাই ঘরে ফিরে এসেছিল।

তাপসী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল—ওর মাকে কি বাঘে খেল?

—তা খাবে না, দিদিমনি, বাঘ কি আর সোজা জিনিস? তেনারা কি ছাগল কুকুর? হাতজোড় করে বাঘের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল।

সুধীর ওর স্বরের অনুকরণ করে শুধাল—তা বটেন। তবে এটান তোমার ঘরেরই কি?

—সেকি দাদাঠাকুর? আমরা সদগোপ, আমরা কি এঁড়ে বাছুর দামড়া করতে পারি? এক মুছুলমানের কাছে কিনেছিলাম।

তাপসী জেরা করল—তাহলে ওর ছোটবেলার খবর তুমি জানলে কি করে?

গাড়োয়ান অপ্রসন্ন মুখে বলল—সেই ত বলেছিলেম, দিদিমনি। লোকটা খুবই বিশ্বাসী। সে ফিবছরই গরু দিয়ে যায় আমাদের গাঁয়ে—সে কি মিথ্যে বলতে পারেন?

—তুমি ঠিকই বলেছ, মুরুব্বি। জগতে যা ঘটে তাই সত্য নয়।

বিশ্বাসই হ'ল সত্য। তার বড় আর সত্য থাকাও উচিত নয়।

এতক্ষণে নির্বাক বাউল কথা বলল—ওটা কিসের হল্লা?

লোকটি তাচ্ছিল্য করে বলল—ওরা মাতাল।

তাপসী উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল—মাতাল? মাতাল আমি কখন দেখিনি!

লোকটি শান্ত কণ্ঠে বলল—মাতাল আর কি দেখবে, দিদিমনি? উয়ারাও আমাদেরই মতন মানুষ। তবে মদ খেয়ে উনারা যাতা বলেন। ঐ যে উরা এদিকেই আসছেন। মদ খেয়ে ফিরছে বোধ হয়।

দেখতে দেখতেই ওরা এসে পড়ল। টলতে টলতে, গান গাইতে গাইতে তারা গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

লোকটি মুখ বাড়িয়ে বলল—তোরা সব সরে যা ইখান থেকে, ট্রেণ ধরাতে হবেন।

একজন টেনে বলে উঠল—কেন হে বাপু? অন্ত রাস্তায় যা ক্যানে?

আর একজন বলল—শালার মেজাজ দেখ! যেন আমরা কে আর কি!

একজন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল—জানিস আমার ঠাকুরদার রাস্তা! ইংরাজ আমার বাবা।—আমার বাবা বেলেগু। (bar-at-law ব্যারিষ্টার)।

আর একজন বলে উঠল—আমার বাবা সব (জজ)।

একজন রাস্তার উপর বসে পড়ল। বলল—এটা আমাদের গায়েনের আসর। নে শালারা গায়েন ধর। তারপর একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—

হবেনা হবেনা শ্যাম

মদ খাওয়া আর হবে নাই—

শালার বেটা শালা শুঁড়ি বলে কিনা মদের সাত আনা গলা।

একজন বলে উঠল—মদ? কেনে কিনে খাব? বাখর দিয়ে ঘরে তৈয়ার করে খাব, চল শালারা। আর কিছু বলতে হ'ল না, ওরা নিজেরাই টলতে টলতে ছুট দিল—টেনে টেনে দিলখুস গলায় গান গাইতে গাইতে—

বিয়াইকে ম্যারেছে কাড়াতে

ও বিয়ান ছুটে এসে কাড়াগুলান তাড়াতে।

তাপসী হেসে বলল—মাতালগুলো বড় খেয়ালি ত?

লোকটি গাড়ি চালাতে চালাতে বলল—সব মাতালই এমনি, দিদিমনি। একবারের একটা গল্প বলছি। গল্প নয়, সত্যিকথা। তখন আমার উমের

বিশ কি চব্বিশ। গায়ে ভারি তাগদ্। দিন রাত্তির গাড়ি বাইছি। সেই উঠতি বয়েসের কথা বলছি। তখন গরম কাল। গাড়ি নিয়ে ফিরছি ভৈরব ডাঙ্গা থেকে। বেশ খানিকটা রাত্ত হয়ে গেছেন। একাই ফিরছি। তখন বাদশা ছিল না, তবে তখনও গরু দুটাও বড় সখের ছিলেন। গলায় ঘন্টি বাজিয়ে ঝম্ ঝম্ চল্‌ছে। এমন সময় শুনতে পেলাম কারা যেন হাল্লা করছে। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলাম। ডাকাত নয়ত? কিন্তু ঢুকচেন কাছ হতেই বুঝলাম মাতালগুলো লাচছে। কাঁধে একটা লোক রইছেন। সেত প্রাণপণ চীৎকার করছে।—লোকটি একটু থেমে আবার আরম্ভ করল—দেখলাম, আমি যদি লোকটাকে না বাঁচাই তাহলে ঠিক মারা যাবেন। সাহসে ভর করে উদের কাছকে গেলাম। বললাম—তোরা কাকে কাঁধে নিয়ে লাচচিস? মাতালগুলো আমাকে দেখে লাচ থামিয়ে বলল—মাষ্টারকে লিয়ে।

বললাম—মাষ্টারের কি হলেন যে লাচচিস?

মাতালগুলো বলল—মাষ্টার আজ একটা ভারি অঙ্ক বলেছে।

—তা বলে লাচতে হবে?

লোকগুলো রেগে উঠল—তা লাচবো নাই—ইনি ভারি পণ্ডিত আছে। ভারি অঙ্ক বলেছে।

আমি বলাম—তাত আছে, কিন্তু ও বেচারীর যে কষ্ট হচ্ছে। আর তোদেরও কষ্ট হচ্চেন। আমার গাড়িটা খালি যাচ্চেন, ছেড়ে দে, চাপিয়ে নিয়ে যাই।

পণ্ডিত নাকে কেঁদে বলল—হে বাবারা, ছেড়ে দে বড় কষ্ট হচ্ছে।

লোকগুলো বলল—কষ্ট হচ্চে, তা এতক্ষণ বলিস নাই কেনে? তাহলে ছেড়ে দিতুম। তুই পণ্ডিত হলে কি হবে তুইও বোকা—আমারাও বোকা। যা নিয়ে যা।

পণ্ডিতকে ছেড়ে দিল। পণ্ডিত ছিল আমার চেনা লোক—আমাদের পাশের গেরামেই বাড়ি। গাড়িতে চাপিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে শুধালাম—এদের পল্লায় পড়লেন কি করে? পণ্ডিত কপালে হাত দিয়ে বললেন—কপালের ভোগ। হামিচারী থেকে ফিরছিলাম, পথে ওরা আটকাল—পণ্ডিত একটা আঁক করে দিয়ে যা। ভারি শক্ত অঙ্ক। পারিস তোকে নিয়ে লাচবো, না পারিস মারবো। আমি পথে একা। চারিদিকে ওরা ঘিরে ফেলল। কি পণ্ডিত যদি না পারিস ভাল হবেক নাই। দুর্গা

নাম জপ করতে করতে শুধালাম—বল্ তোদের অঙ্কটা। লোকগুলো একসঙ্গে ভিজামাটিতে লাঠিগুলো গেদে বলল—এই যে গাদলুম মাটিটা গেল কুথায়?—এ এক মস্ত প্রশ্ন বটে। যদি মাতালের মনের মতো না হয় তাহলে মারই খেতে হবে। দুর্গানাম জপতে জপতে বললাম উঁই টিপিতে ঐ মাটি জমছে। তাইত উঁই টিপি এত উঁচু। উত্তরটা ওদের খুব মনমত হয়ে গেল। তাই সব খুশি হয়ে বলল পণ্ডিত ভারি অঙ্ক করেছে। এবার কোলে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিবার কথা। এই রকম লুফতে লুফতে বাড়ি পৌঁছতে যাচ্ছিল। আধপোয়া রাস্তা আসিনি, কিন্তু বুকে পিঠে দরদ করে দিয়েছে। যদি আর দুমাইল বেয়ে বাড়ি পৌঁছে দিত তাহলে হয়ত হাড়কখানাও যেত। সমস্ত ঘটনাটি বর্ণনা করে লোকটি থামল।

তাপসী শুধাল—তারপর কি হ'ল?

লোকটি হেসে বলল—কি আর হবে, দিদিমনি, আমি তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসেছিলাম।

আর কোন কথা হ'ল না। নিকটেই ষ্টেশনের আলো দেখা গেল।

গাড়োয়ান হাত বাড়িয়ে দেখাল—ঐ ষ্টেশন।

গাড়ি ষ্টেশনের কাছে পৌঁছাতেই সশব্দে ট্রেণটা প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল।

সুধীর ব্যস্ত হয়ে উঠল—আর দেরী নয়। তাড়াতাড়ি নেমে পড়। আমি ততক্ষণ টিকিটটা কেটে নিয়ে আসছি। সুধীর ছুটে টিকিট করতে চলে গেল।

যখন টিকিট কেটে প্ল্যাটফর্মে ঢুকল তখন গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পিটাচ্ছে। এরপর গার্ডের বাঁশীর সংকেতের অপেক্ষা মাত্র। তাপসী সুধীরকে দেখতে পেয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাকল—সুধীরদা, আমরা এখানে বসেছি।

সুধীর তাপসীর হাতে টিকিট ধরিয়ে দিতেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

বাউল নমস্কার জানাল সুধীরকে—শীঘ্র এস।

তাপসী গাড়োয়ানের হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে বলল—তোমার বাদশাকে খোল দিও কিনে।

টাকাটা আঁচলের গেরোতে বাঁধতে বাঁধতে বলল—আবার আসবে, দিদিমনি। লোকটির চোখদুটো ঝাপসা হয়ে এল। কিন্তু তা তাপসীর চোখে পড়ল না—ওর সজল বেদনাক্লিষ্ট চোখ দুটো। হয়তো ওর কথাটাও কানে গেল না। সর্পিল গতিতে ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গেল গাড়িটা।

বাউল সোনাপুরে এসে আর বাউল রইল না। বেশভূষায় সে ফিরে এল পৈতৃক যুগে। নিজস্ব গড়া যুগ গেল স্বপ্নলোকের ধুঁয়ায় মিলিয়ে। কিন্তু বাইরে বাইরে নিজেকে সে যতটা পূর্বের মধ্যে টেনে এনেছে ততটাই আর সে সত্যই ফিরে আসতে পারেনি। সোনাপুরে এসে এই প্রশ্নটাই তার মনে বার বার আসছে। সে ফিরে পেয়েছে তার হারিয়ে যাওয়া সমাজ। ফিরে পেয়েছে তার অস্তিত্ব, তার আবাস, তার স্বপ্নসৌধ। কিন্তু এই প্রাপ্তিযোগের মধ্যে রয়ে গেছে একটা বিরাট ব্যবধান। একটা বিরাট অভাব।

এখানের শ্যামল প্রকৃতি,—সোনালী সূর্য,—বিদায়ী দিবসের ভূমিকায় রূপায়িত আকাশের বিচিত্র পট,—সবুজ ক্ষেতের স্নিগ্ধ হাওয়া,—পাখির গান,—ফলাবনত বৃক্ষ,—আনন্দময়ী প্রকৃতি,—শিশুর আনন্দ উচ্ছ্বাস,—আর —গাছের ছায়ায় ছায়ায় নেমে আসা স্নিগ্ধ সন্ধ্যা,—ছম্‌ছমে অন্ধকার,—ঝিল্লির ডাক,—পাতায় পাতায় জোনাকির আলো। এসব যেন বহুকাল হারিয়ে গেছল বাউলের মন থেকে। এমন করে প্রকৃতি বিচিত্রময়ী আনন্দময়ী উষসীর মতো চোখে পড়েনি দীর্ঘ দিন। যেন একটা যুগই প্রকৃতির যে এত রূপ, এত মধুময় এই জগৎ, তা কোনদিনই এমন করে উপলব্ধি করেনি বাউল। তবুও কোথায় যেন শূন্যতা মনের মধ্যে।

ছেলেরা রৌদ্রে ছুটছে, গাছে চড়ছে,—যে গাছের টুগ্‌ডালে পাতার উপর টুনটুনি পাখিটা দুলছে সেই গাছের একটা ডাল ধরে ঝুলছে। সাঁতার কেটে পুকুরের মাঝখানে যেখানে পদ্ম ভিড় করে রয়েছে—সেখানে চলে যাচ্ছে। মারামারি করছে। এতটুকু অবসর নেই ওদের সারাদিন। কিন্তু ক্লান্তিও নেই এতটুকু। কিন্তু ওর নিজের মনে শুধুই ক্লান্তি।

পুকুরে সাঁতার কাটার কথা চিন্তা করলে মাথা ভার হয়। রৌদ্রে মাথা ধরে। ছুটলে লোক হাসির ভয়। ওর শৈশবের কথা মনে পড়ে যায়। সেও একদিন ছোট ছিল—এমনি করে সেও ক্লান্তিহীনভাবে মাঠে ঘাটে ঘুরেছে। গাছের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মাঝজলের ওপরে। কই কোনদিনত

ক্লান্তি বোধ করেনি তার জন্যে? সেই ক্লান্তিহীন শৈশবের দিনেও মনে অসন্তোষ ছিল; কিন্তু এমনি পুঞ্জীভূত বেদনাক্লিষ্ট নিরাশার দিন ছিল না। সেদিন আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল—বড় হবে, পরিপূর্ণ হবে যৌবনে, স্বাধীনভাবে ঘুরবে—হবে অসীম শক্তির আধার। কিন্তু আজ? যৌবন এসেছে কিন্তু শৈশবের চোখের স্বপ্ন এ যৌবন নয়। এর সঙ্গে তার বিরাট তফাৎ রয়ে গেছে। এখন দেহ বেড়েছে আনন্দ কমেছে, বয়স বেড়েছে উৎসাহ কমেছে; আজ যেন মরীচিকার ছলনা ধরা পড়ে গেছে।

শৈশবে দেখতো পদ্ম, এখন মৃণালটিও চোখে পড়ে। বাউল ভেবে পায় না, কেন এই স্বপ্নভঙ্গ?—প্রকৃতিও একইভাবে চলেছে। পাখি গায়, ফুল ফোটে, বর্ষায় বৃষ্টি হয়, ছেলেরা আনন্দ করে; কিন্তু তার আনন্দ গেল কোথায়?

চিন্তা করতে করতে এই সমস্যার এক দার্শনিক সমাধান বাউলের মনে এল,—এর মূলে হয়তো রূপ আর অরূপ। শৈশবের রঙীন চোখে সকল স্বপ্নই হয়ে ওঠে রঙীন—সুন্দর। পৃথিবীর দিনযাপনের গ্লানিতে ধীরে ধীরে চোখের সে রঙ মলিন হয়ে ওঠে—দিনাগত কুসুমের মলিনতার মতো। তখন রূপ দিয়ে আর জগৎকে দেখা যায় না। অরূপে তাকে উপলব্ধি করতে হয়। সাধারণ মানুষ রূপ দিয়েই জগৎকে দেখতে চায়, অন্তর্দৃষ্টি খোলে না—তাই হয় তাদের অন্ধের অবস্থা। রূপ যতই অস্পষ্ট হয় ততই মনে হয় ডুবছে।

বাউলের মনে হয় সেও ডুবছে ধীরে ধীরে অতল কালো জলে। তারও মনে হচ্চে হঠাৎ আলো বাতাস ফুরিয়ে গেছে।—এমনি কত চিন্তাই সে করছিল বাইরের ঘরটায় বসে বসে। বেলা বেড়ে যাচ্ছিল; কিন্তু বাউলের সেদিকে খেয়াল ছিল না।

তাপসী হাতে এক বাটি তেল নিয়ে ঘরে ঢুকল— বলি, আপনি কুটুম এসেছেন নাকি? বাইরে থেকে তাড়া না দিলে বুঝি কিছু করবেন না?—কত বেলা হয়ে গেছে সে বুঝি খেয়াল নেই!

বাউল চমকে উঠল—অ্যাঁ, বেলা হয়ে গেছে বুঝি?

—তা হয়নি? আপনার জন্যে বেলা অপেক্ষা করছে? কদিনই ত এসেছেন, কিন্তু না পারলেন বাবা-মাকে নিজের মতো ভাবতে, না পারলেন ঘরটাকে নিজের মতো করতে! গ্রামে ত না হয় বেরুনই না। নিন, তেলটা মেখে ফেলুন।

বাউল তেল মাখতে মাখতে হঠাৎ প্রশ্ন করল—আচ্ছা, তাপসী, তোমাকে একটা কথা শুধাব ?

তাপসী হেসে বলল—হাজারটা কথা শুধাচ্ছেন বিনা অনুমতিতে, আর একটার বেলায় অনুমতির প্রয়োজন হয়ে গেল ? বেশ বলুন।

—আচ্ছা, তোমার আনন্দটা ঠিক আছে ত ? ঠিক যেমন ছিল ছেলে-বেলায়,—যখন রান্না করতে খেলাছলে কাদাবালি দিয়ে, মিছিমিছি পুতুলের বিয়ে দিতে, কনে ঘরের তত্ত্ব নিয়ে মিছিমিছি ঝগড়া করতে তোমার সাথীদের সঙ্গে—

তাপসী হেসে বলল—কে বললে আপনাকে যে আমি এসব করতাম ? আপনি কি ভাবছেন আমি ওমনি প্যানপেনে মেয়ে ? দস্তুর মত পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতাম ছোট থেকেই। ছেলেদের সঙ্গে বড় বড় গাছে চড়তাম, টুগডালে উঠে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। চলুন না, পুকুরেই দেখিয়ে দিইগে।—বাউলের বুক থেকে একটা গভীর নিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ল।

তাপসী বিস্মিত হয়ে শুধাল—একি, দীর্ঘশ্বাস ?

বাউল ম্লান হেসে বলল—তোমার উপর হিংসে করে।

—কেন ?

—তোমাদের সুখ দেখে।

তাপসী হেসে উঠল—কেন আপনার দুঃখটা কি ?

বাউল ম্লান হেসে বলল—অবশ্য দুঃখের কারণটা তোমাদের সুখ নয়, দুঃখ আমার নিজস্ব। তোমরা সকলেই হয়তো realised the sweet youth, dreamt in the childhood; কিন্তু আমি যেদিন যৌবনের নাগাল পেলাম, দেখলাম একটুকরো কাঁচ। আমার সূর্য তখন অস্ত গেছে। তার জ্যোতিও সরে গেছে। মনে হচ্চে—মনে হচ্চে যৌবন চিরদিনই কেন দূরে রইল না। আর একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ল। তাপসী গাঢ় স্বরে বলল—ও শুধু তোমারি নয়, ও সবারই। আমরা সবাই মরীচিকার পিছুপিছু ছুটেছি। যেদিন সেই পিছু ছুটা বন্ধ হবে সেদিন জীবনেরও হবে শেষ।

—কিন্তু তোমার যখন মরীচিকা আছে তখন সুখও আছে। শৈশবের আনন্দও আছে।

তাপসী হেসে বলল—সুখে আছি ঠিক, কিন্তু শৈশবের আনন্দ কই ?

আগে আনন্দ ছিল সুলভ আজ সে দুর্লভ। সেদিন ধুলো ঘেঁটে যে আনন্দ পেতাম আজ সিনেমা দেখেও সে আনন্দ পাই না। কাল যেটা ছিল আনন্দের বস্তু আজ সেটা ছেলেখেলা বলে কৌতুক বোধ করি। সুখদুঃখ মনের বস্তু। মনটা যতই পাল্টাচ্ছে সুখদুঃখের তারতম্য হচ্চে তত। যদিও তোমার মিটারে এখনও পৌছিনি, কিন্তু পথ ঐ এক।

বাউল চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করল—তাহলে তোমরাও সুখী নও?

তাপসী নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল। বাউল তেল মাখা শেষ করে কাঁধের উপর গামছাটা ফেলে আবার শুধাল—আচ্ছা, যৌবনে মানুষের মনে শৈশবের মতো আনন্দ থাকে না কেন?

তাপসী হেসে বলল—খুব সহজ।

—সহজ?

—সহজ বৈকি! শৈশবে মানুষ স্বপ্ন দেখে যৌবনের—রূপ লাবণ্য পরিপূর্ণ সুন্দর মানুষের; কিন্তু যৌবনে মানুষ দেখতে পায় বার্দ্ধক্যের রূপ অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং···আর বার্দ্ধক্যে দেখে মৃত্যুর কাল রূপ। তাই মানুষের বয়স যতই বাড়তে থাকে আনন্দও তত কমতে থাকে।

বাউলের কিন্তু মনোমত হ'ল না উত্তরটা। কোথায় যেন একটা মস্ত বড় অসত্য। তাই জোরে জোরে মাথা নেড়ে জানাল—না—না।

তাপসী লক্ষ্যই করল না। ঘরের শিকলটা টেনে দিয়ে বলল—চলুন স্নান করে আসিগে। বাউল নীরবে ওর পিছু পিছু চলল।

ছোট্ট পুকুর, কিন্তু জল আছে বেশ। উঁচু পাড়ের উপর গজিয়ে উঠেছে কয়েকটা তাল আর কদবেলের গাছ। ঘাটের উপর কদম্ব গাছ।

তাপসী কদম্ব গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একটি মোটা ডালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল—ঐ ডালটা থেকে আমরা ঝাঁপ মারতাম। তখন পুকুরটা আরো একটু বড় ছিল। জলও আরও বেশি থাকতো। দেখবেন, দেব ঝাঁপ?

বাউল পুকুরে নামতে নামতে বলল—না, আর অত বাহাদুরী দেখিয়ে কাজ নেই। শেষে—

হুড় মুড়িয়ে
পতন নচে দুড় মুড়িয়ে—
হাড়গোড় সব চুড় চুড়িয়ে
ভাঙল মটাৎ মটাৎ—

তাপসী হেসে বলল—সেত বাবা শেয়াল গো?

একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের ছিপ্‌ছিপে ত্রিশ বছরের যুবক হাতে একগাছা ছিপ নিয়ে উত্তরের পাড়ে যাচ্ছিল। ওদের দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘাটের কাছে এসে তাপসীর দিকে তাকিয়ে রইল বড় বড় চোখ মেলে। তাপসী শহরের মেয়ে, কিন্তু ওরও লোকটির ক্ষুধার্ত দৃষ্টির সামনে লজ্জা করছিল। ঘৃণাও হচ্ছিল লোকটার উপর। কর্কশ স্বরে বলল—মেয়ে মানুষের দিকে এমন করে তাকিয়ে কি দেখছেন? ভদ্রতা শেখেননি বুঝি?

লোকটি খোঁচা খোঁচা একমুখ দাড়ির মধ্যে লাল ছোপ দেওয়া দুপাটি দাঁত বের করে হেসে বলল—তুমি আমাকে চিনতে পারলে না, রাই?

'রাই?'—চমকে উঠলো তাপসী।

তের বছর আগে এখানেই ঐ নামেই একজন ওকে ডাকতো। সে নামে আর কেউ ডাকতো না। শহরের জীবনযাত্রায় এ নামও ভুলে গেছল, কিন্তু আজকের এই ডাকেই তের বছরের সেই পুরনো স্মৃতি মনে পড়ে গেল। তাই ডাক শুনে সে চমকে উঠল। কোন কথাই বলতে পারল না।

লোকটি বলে চলল—তোমাকে কিন্তু আমি দূর থেকে দেখেই চিনেচি। তোমার চাউনি, কথা বলা, দাঁড়ান—এসকলের মধ্যে এখনও স্পষ্ট ছাপ রয়েছে তোমার শৈশব স্মৃতির।

তাপসী এতক্ষণে কথা বলল—কে বাঁশরী? তুমি?

লোকটি হেসে বলল—তাহলে তোমার মনে পড়েছে এবার?

তাপসী মাথা নিচু করে পায়ের ধুলো নিতে নিতে বলল—কি করে চিনবো বল, আজ তের বছর দেখা সাক্ষাৎ নাই। তায় আবার মুখে এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পাকও ধরেছে দু একগাছি। একটু থেমে বলল—আচ্ছা, শরীরটা কি করে ফেলেছ বলত? সে সৌন্দর্যটাও কি এমনি করে মুছে দিয়েছ দেহ থেকে!

লোকটি ম্লান হেসে বলল—রূপ হয়তো আমার এই ছিল, রাই। সেদিনের চোখদুটোই তোমার ছিল অন্ধ। কিন্তু তবুও তোমার চেনা উচিত ছিল।

—কি করে চিনি বল! বাঁশরীর যে হাতে বাঁশীটিও নেই। আচ্ছা, বাঁশীটা আছে? না, বাঁশীটাকে বাড়িয়ে বড়শী করে মাছ ধরার কাজে লাগিয়েছ?

লোকটি বলল—কি আর করি বল, রাই-ই যখন গেল তখন বাঁশীটা রেখে লাভ কি ?

তারপর বাউলের দিকে ইংগিত করে শুধাল—উনি কি তোমার সঙ্গে এসেছেন ? তাপসী মাথা নেড়ে 'হাঁ' জানাল।

বাউল স্নান সেরে উঠতেই লোকটি হাত জোড় করে নমস্কার জানাল—নমস্কার দাদা।

বাউল প্রতিনমস্কার জানাতেই লোকটি ছিপ্ হাতে ওধারে চলে গেল—যান আপনারা, বেলা হচ্চে।

বাউল বাড়ী ফিরতে প্রশ্ন করল—লোকটি কে ? তোমাদের বড় ভাব দেখছি ?

—কেন হিংসে হচ্ছে বুঝি ? তাপসী হেসে বলল—ও আমার কাছে বাঁশরী, আমি ওর কাছে রাই। এ ছাড়া পরস্পরের কাছে অন্য পরিচয় ছিল না। সেই ও।

বাউল কিছুই বুঝল না, বিস্মিতভাবে ওর দিকে তাকাল।

তাপসী পিঠের দুগাছা চুল নাড়তে নাড়তে বলল—ছেলেবেলায় ঐ ছিল আমাদের খেলা। ঐ কদম গাছেরই একটা ডালে দোলনা টাঙ্গিয়ে আমরা ঝুলন খেলতাম। কাঁটাল পাতার মুকুট পরে ও সাজতো বাঁশরী, আমি সাজতাম রাই। কোথা থেকে একটা ভাঙ্গা বাঁশী যোগাড় করেছিল, দোল খেতে খেতে বেশ সুর করে বাজাত। আমি শুনতে শুনতে ওর পাশে বসে দোল খেতাম। অন্য ছেলেমেয়েগুলো সুর করে বলতো—

ও রাই নেমে এস
ও বাঁশরী নেমে এস।

মাঝে মাঝে একবার করে দোল খাইয়ে দিত—তারপর সুর করে আবার তারা গাইত —এবার ঠেলে দেব গো
হাত-পা ছেড়ে কদমতলে
ফুঁটি ফাটা হবে গো।

মনে নেই, আরো সব কত কি বলতো। যখন থেমে আসতো তখন আবার দোল খাইয়ে দিত, নইলে আমাদের নামিয়ে দিয়ে অন্য দুজন চাপত। খেলা ছেড়ে যখন সবাই ঘরে যেত তখন সিদাম, সুদাম, গোপ, গোপী সবাই আপন আপন স্মৃতি কদমতলায় ফেলে যেতো। কিন্তু বাঁশরী

আমাকে দেখলেই বলতো—ও রাই! আমিও পালটে বলতাম—বাঁশরী। এমনি করেই ও আমার কাছে বাঁশরী, আমি ওর কাছে রাই—

বাউল সব শুনে মন্তব্য করল—বাঁশরীবাবু তোমাকে ভালবাসতেন।

তাপসী অন্যমনস্কভাবে বলল—হয়তো তাই। আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে; কিন্তু তের বছর বয়সে যখন গ্রাম ছেড়ে চলে যাই তখন কোন মোহই আমার জন্মেনি। তাই তের বছর পরে আর ওকে চিনতেই পারলাম না।

—কিন্তু ও তোমাকে চিনেছে।

তাপসী ওর দিকে তাকাল। মুখে হাসি, চোখে ধমকের সুর।

সেদিনই বিকাল বেলায় বাউল তাপসীর সঙ্গে বেড়াতে বেরুল। গ্রামের শেষে উত্তর-মাঠে উঠতে পথের শেষে যে বাঁশ ঝাঁড়টা তারই নিচে সেই বাঁশরীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বাঁশরী দুহাত তুলে নমস্কার জানায়—কি দাদা, বেড়াতে বেরিয়েছেন?

বাউল উত্তর দেওয়ার আগেই তাপসী পালটে প্রশ্ন করল—তুমি কি ফিরবার পথ ধরেছ?

—তাই ত ধরেছিলাম।

—কেন, এখন কি আমাদের সঙ্গে যাবার মতলব করছ?

লোকটি হেসে বলল—সেই রকমই তো দুরভিসন্ধি। তারপর বাউলকে সম্বোধন করে বলল—আপনার কি আপত্তি আছে?

বাউল সঙ্কুচিত হয়ে উঠল—সে কি, আপত্তি কেন থাকবে?

বাঁশরী ওদের সঙ্গে চলল। অন্ধকার গলিটা পেরিয়েই ফাঁকা মাঠ। মাঠের শেষে একটা মস্ত বড় বাঁধ। পুকুরে মাঝখানে কয়েকটা পদ্ম। কয়েকটা সারস তাদের বড় বড় ঠোঁট নিয়ে পুকুরের ধারে ধারে চরে বেড়াচ্চে। পুকুরটার দিক তিন ঘিরে রয়েছে ক্ষেত একটা পাড়। পাড়টা মিশে রয়েছে সাধারণ মাঠের সঙ্গে; তবে সাধারণ মাঠের চেয়ে পাড়টা কিছু উঁচু। পাড়ের উপর বড় বড় কয়েকটা পাথর। ওরা তিনজনে বসল একটা পাথরের উপর। তাপসী পশ্চিমের ক্ষেতের দিকে রক্তাক্ত আকাশের দিকে তাকাল। বাঁশরী শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল।

বড় বড় সরাল দুটোর উপর চোখ পড়তেই বাঁশরী বলে উঠলো—বেশ সরাল দুটো আছে?

বাউল বলল—সরাল চেনেন দেখছি। কিন্তু মারবেন কিসে?

—কেন মেরে কি হবে? তাপসী বিস্মিতের মতো তাকাল।

বাউল সংক্ষেপে উত্তর দিল—মাংস।

—মাংস? তাপসী চম্‌কে উঠল।—আপনি না বাউল সন্ন্যাসী ছিলেন?

বাউল হেসে জবাব দিল—নষ্টস্য কাণ্যাগতি?

তাপসী হেসে বলল—তা বটে?

বাঁশরী বাউলকে প্রশ্ন করল—আপনি কি মাঝে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন?

বাউল বলার আগেই তাপসী বলতে শুরু করল—রীতিমত সন্ন্যাসী। সে এক বনের ধারে নদীতীরে তালপাতার কুটিরে বসে তপস্যায় রত মহামুনি ইনি। মাছ খান না, মাংস খান না, তপস্যায় দিন যায়। ভিক্ষে করে যা পান তাই চারটি সপাক রেঁধে পেট ভরান। সে এক মস্ত বড় উপন্যাস!

একে একে সমস্ত পরিচয় দিল তাপসী।

বাঁশরী সব শুনে শুধাল—তাহলে বিয়েও করেন নি দেখছি?

তাপসী মুচ্‌কি হেসে বলল—কেন, হাতে মেয়ে আছে বুঝি?

—আছে।

—কোথায়?

—এই গ্রামেই আছে।

তাপসী বক্রদৃষ্টিতে বাউলের দিকে তাকিয়ে শুধাল—বলনা, সে দেখতে কেমন? শুনে যদি পছন্দ হয়ে যায়—!

বাঁশরী হেসে বলল—তা আবার না হয় তাহলে আমি ঘটকালিই করি মিথ্যে। ভারি সুন্দর!

—কেমন? ব্যাকুল হয়ে উঠল তাপসী জানবার জন্তে।

—ভারি সুন্দর। ঢলঢলে পদ্মের মতো মুখ। টানাটানা কাজল ভরা টলটলে চোখ। মুক্তার মতো দুপাটি দাঁত। দেবকন্তার মতো কপালে একটি তিল। মেঘের মতো কাল কোঁকড়ান এলোমেলো চুল। তারই কয়েক গোছা কপালের দুটোধারকে ঢেকে রেখেছে। না আর, বর্ণনা করবো না। এর পর হয়তো নারীত্বের মর্যাদায় ঘা লাগতে পারে।—

তাপসী হেসে বলল—থাক কেন সম্পূর্ণ কর। সৌন্দর্য বর্ণনায় কদর্য পৌঁছাতে পারে না। নাও, বলে ফেল।

—ঠিক তোমার মত। বুকের পিঠের ওমনি ভরন্ত গঠন, কোথাও যেন এতটুকু তফাৎ নাই। সে তুমিই।—সে তুমিই রাই—!!

অভিমানের সুরে তাপসী বলল—তুমি আমাকে বিলিয়ে দিচ্ছ, বাঁশরী।

বাঁশরী হেসে বলল—সত্যিকারের বাঁশরীও ত তাই করেছিল।

বাউল হেসে উঠল—আপনি তাহলে কাল্পনিক কাহিনীর বাস্তব অনুবাদ করছেন ?

তাপসী কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করে বলল—ছাই করছেন। বৌদির ভয়ে গ্রহ অপরের কাঁধে চাপিয়ে চাচ্ছেন।

বাউল হেসে বলল—ঠিক ধরেছ, তাপসী। পাছে তুমি পুরোন সম্পর্ক ধরে বৌদির অধিকারে ভাগ বসাও সেই ভয়ে তোমার বিয়ে দেওয়ার ভাবনাটাই চট করে ওঁর মাথায় এসে গেছে।

তাপসী ঠোঁট উল্টে বলল—এল ত বয়ে গেল। ওকে ছাড়ছে কে ? ওর বাড়ি গিয়ে সতীনকে বলবো—এবার তোমার পালা শুধু রাঁধা। বলি, হ্যাঁগো বাঁশরী, আমার সতীন কি বড় ঝগড়াটে ?

বাঁশরী মৃদু হেসে বলল—না।—একটুও না।

তাপসী বড় বড় চোখ করে বলল—সে কেমন সতীন গা ? বেশ ঝগড়া করব দু'সতীনে, তোমার দুটো হাত ধরে আমরা দু'সতীনে টানাটানি করবো, তা না তুমি বলছ একটুও ঝগড়া করবে না!—আমি কোথায় দাঁড়াব গো ?

—তুমি দাঁড়াবে সত্যাশ্রয়ী বাউলের পাশে।

—আর তুমি ? তুমি তাহলে সতীনকে নিয়ে আনন্দে বাস করবে ? সেটি হতে দিচ্চি না।

বাঁশরী হাসল, কিছু বলল না।

তাপসী শুধাল—হ্যাগো, সতীন ঝগড়া করে না কেন ?

—সে যে অন্য জগতের মানুষ। তপজপ নিয়েই ব্যস্ত।

—দিন রাতই তপজপ নিয়ে থাকে ? রান্নাবান্না করে কে ?

—মা।

—তিনি কিছু বলেন না ?

—না। বলবেন কি, তাঁর শাপেই তো তার এই অবস্থা। তার কিছুতেই তপ ভাঙ্গছে না। আমারও দেখা হচ্ছে না। দুজন বিরহী

বিরহিনী গভীর ব্যথায় ব্যথিত। সে তপস্যা করছে দিনের পর দিন মাসের পর মাস, তবুও তার সিদ্ধি হচ্চে না। ইষ্টদেবতা দেখা দিচ্চে না। আমি ভাবছি, হয়তো তার তপস্যা এখনও নিম্নস্তরে। আরও গভীর তপস্যা করতে হবে তাকে। সে বড় কঠোর। আজ-কালের মেয়েরা বড় একটা সে তপস্যা করে না। এদিকে আমার মাস কাটে তবু শাপ মোচন হয় না। ভাবি, সভ্যতার যুগটা আবার কেন তপস্যার যুগে ফিরে যায় না। কিন্তু সে যুগেই কি স্বামী অভিলাষিনী তপস্বিনীদের সে আসন জানা ছিল? বড় ভাবনা হয়, যদি সে আসনটা কেউ না করে।

তাপসী ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করল—কি আসন?

—বিষ্ঠাসন। মা বলেছিলেন, যে বিষ্ঠায় বসে তপস্যা করবে কেবল সেই তোমার মতো অপদার্থের গলায় মালা দেবে।

বাউল শুনে হো হো করে হেসে উঠল। তাহলে আপনার এখনও বিয়েই হয়নি? আমিত আপনার হেঁয়ালী বুঝতেই পারছিলাম না। বাঁশরীও হাসল তাপসীর দিকে তাকিয়ে।

তাপসী বলে উঠল—হাসছ যে? মেয়েদের বয়ে গেছে বিষ্ঠাসন করতে।

বাঁশরীও হাসতে হাসতে বলল—তা বটে, আজ-কাল মেয়েরা অনেক আসনই করছে, কিন্তু বিষ্ঠাসনটা আর কেউ করছে না। আর আমিও বছরের পর বছর চুলদাড়ি পাকাচ্চি। কিন্তু বিয়ে করতে পারছি না। হাল ছেড়েও দিয়েছিলাম, কিন্তু জ্যোতিষী গুণে বলেছে, বিবাহ সুনিশ্চিত। কখন কে জানে?

—সুনিশ্চিত হয়েই গেছে। তাপসী বলল—আমার সঙ্গে যে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে সেটা সুনিশ্চিতের থেকেও সুনিশ্চিত। তুমি সেটা কেন ভুলে যাচ্ছ, বাঁশরী? ছিঃ—ছিঃ তুমি স্বর্গের কথা একদম ভুলে যাচ্ছ!

তাপসীর অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানে বাঁশরী বলে উঠল—সে কথা মনে থাকতে দিচ্ছ কই, রাই? পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতা স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন ছিন্ন ভিন্ন করে দিচ্ছে।

—কিন্তু আমারতো বাপু দিব্বি মনে পড়ছে। বাসুকী নাগের উপর দুজনে শুয়ে বেমালুম নাক ডাকতাম। ইন্দ্রবাবাজী লাঠি ঘাড়ে করে মশা মাছি তাড়াত—

বাউল হেসে বলল—মশামাছি তাড়াতে লাঠি ?

তাপসী হেসে লুটিয়ে পড়ল—আপনি দেখছি কখনও স্বর্গের সিঁড়িতে পা দেন নি। একি আপনাদের এখানের পিন্‌পিনে মশামাছি পেয়েছেন যে কেবল নাকে কাঁদবে ? স্বর্গের কীটপতঙ্গ পর্যন্ত আলাদা। মশা মাছিগুলোও ছোটখাট রকম পাখীর মতো। সাড়ে বার হাত—

বাউল হেসে বলল—থাক, আর তোমাকে স্বর্গের মশার রূপ বর্ণনা করতে হবে না। যদি বা মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবার কিঞ্চিৎ ইচ্ছা ছিল তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে নরকে যাওয়াই ভাল। কারণ নরকের মশামাছিগুলো হয়তো এখানের মশামাছির থেকেও ছোট হতে পারে।

তাপসী প্রতিবাদের সুরে বলল—আহা, ভুল বুঝছেন। ছোট হলেই ভাল না বড় হলেই খারাপ ! বাঘ ভালুকের জন্যে ডিডিটি ছড়াতে হয় না, মশারীও খাটাতে হয় না ; কিন্তু মশা ?

বাঁশরী এদের আলোচনা শুনতে শুনতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল মনে মনে। বলল—পেটে কি আফিং গেছে ?

তাপসী বলল—আজ্ঞে না। পেটে পস্ত গেছে এবং মাত্রাটাও একটু বেশিই।

বাঁশরী হেসে বলল—তাহলেই হ'ল। যাক্ আর দেরী করে লাভ নেই, চল এবার বাড়ি ফিরে যাই—।

তাপসী নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল—

কেন সখে ?—সৃষ্টি তব এই পৃথ্বি।
নীলাকাশ, ভাঙ্গা ঐ তৃতীয়ার চাঁদ।
তোমার নয়নে মোর যৌবনের ছায়া—
তোমার সৌন্দর্য মোর শুভ্র কায়া
সবার ঐশ্বর্য মাঝে প্রকৃতি পাতিয়াছে ফাঁদ।
আর সেই ফাঁদ কাটি বিহঙ্গের মতো
পালাব না আকাশেতে রবে যতক্ষণ চাঁদ।

বাউল হেসে বলল—তোমার সুধীরদার বিদ্যেটা বেশ আয়ত্ত করে ফেলেছ দেখছি। এবার একটা কবিদল খুলে ফেল।

তাপসী কৃত্রিম বিনয়ের সুরে বলল—আজ্ঞে, হাঁ। যদি আপনি অনুগ্রহ করে—

তাপসীর ভাব দেখে বাউল হেসে বলল—অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ। থাক, অত ভক্তি দেখিয়ে কাজ নেই। কেন, তোমার সুধীরদাকে সঙ্গে আনলেই হ'ত। আমি গদ্যময় লোক, সুর উঠবে কোথায়! জীবনের তারটায় মরচে ধরে গেছে,—সুর তাতে উঠবে না।

—তাহলে আমাকে বলতে হ'ল। তাপসী সবুজ ঘাসের উপর ভাল করে বসে বলল—এতগুল প্রশ্নের উত্তর এক সঙ্গে দেওয়া যায় না। একে একে দিচ্ছি। প্রথম, চোরত বটিই,—চুরির বস্তু আপনার হৃদয়। দু'নম্বর, সুধীরদার কথাগুলো পদ্য, কিন্তু হৃদয়টা; গদ্য আর আপনার কথাটা গদ্য রীতি কিন্তু হৃদয়টা কাব্য প্রীতি অর্থাৎ ভাবপ্রবণ। আর তারের কথা বলছেন?—আমি শিল্পী, কাজেই বাদ্যযন্ত্রের মরচে ছাড়াবার কায়দাটা আমার জানা আছে।

—জানা নেই শুধু জীবনের রূঢ় বাস্তবতা।

তাপসী সুর করে ধরল—সব আছে মোর জানা।

বাঁশরী মুগ্ধ হয়ে বলল—রাই, একটা গান গাও না।

—গান শুনবে, ভাল লাগবে তো?

—ভাল? বাঁশরী হাসল। শুধু আমরাই ভাল লাগবে না রাই, সমস্ত প্রকৃতিরই ভাল লাগবে। এমনি ম্লান জ্যোছনায়, এমনি ফাঁকা মাঠে, এমনি এক বর্ষাশেষের রজনীতে তোমার গান না শুনলে বিশ্ব প্রকৃতিই অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে।

তাপসী হেসে বলল—এত প্রশংসা আমার সহ্য হয় না। শেষে কি অসুখে ফেলবে আমাকে। আচ্ছা শোন। তাপসী গান ধরল—

ভজন পূজন সাধন আরাধন সমস্ত থাক পড়ে
রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস সংগোপনে
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে দেবতা নাই ঘরে।

তাপসীর গান শেষ হতেই বাঁশরী বলল—আর একটা, রাই।

তাপসী হেসে বলল—একটা কেন, যটা খুশি শুনবে। আজ তোমার যত ইচ্ছা শুনবে।

তারপর বাউলের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি সেদিন যে গানটা গেয়েছিলেন সেটা গাইছি। ভুল হলে কিন্তু সুধরে দেবেন।

বাউল হেসে বলল—আচ্ছা।

তাপসী আবার গান ধরল—

পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই ঘাটে
পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে—

বাউল ওর সংগে গলা মিলিয়ে ধরল—

মিটিয়ে দিয়ে বেচাকেনা এই বাটে।—
তখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই ঘাটে—

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ওরা দুজনে গানটা গাইল। শেষে এক সময় গানটা শেষ হতেই বাঁশরীর বুক থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ল। স্পষ্ট আলো থাকলে দেখতে পেত ওর দুচোখে অশ্রু ঢলঢল করছে। তাপসী আবার গান ধরল—

আমি ভয় করবো না ভয় করবো না
দুবেলা মরার আগে মরবো না ভাই মরবো না
তরীখানা বাইতে গেলে যদিই—……

গানটা যখন থামল তখন অনেকটা রাত হয়ে গেছে। ভাঙা চাঁদটা আকাশের কোথায় মিলিয়ে গেছে। অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ার মতো তিনটি মূর্তি বাড়ি ফিরবার জন্তে উঠে দাঁড়াল।

[৮]

সকালবেলায় তাপসী হারমোনিয়াম সংযোগে গাইছিল—

তুমি নির্মল কর মংগল কর
মলিন ঘর্ম মুছায়ে
তব পুণ্য কিরণে দিয়ে যাক মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে

তাপসীর মা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনছিলেন। যখন গান শেষ হল' তাপসী মুখ তুলে সামনের দিকে তাকাল—মা, তুমি বুঝি শুনছিলে?

মা হেসে বললেন—তোর গাওয়া এই গানটাই আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। কবার ত গানটা গেয়েছিস, কিন্তু আমার মনে হয় কত নতুন!

তাপসী শান্তভাবে জবাব দিল—তাই হয়, মা, যে গানের ভাব যত গভীর তার ভেতর তত নতুনত্ব। ভাবের প্রেরণা উপলব্ধির বিষয় বস্তুকে কখনও পুরোন হতে দেয় না।

মা হেসে বললেন—হয়তো তোর কথাই সত্য, মা; কিন্তু ভাব নিজেই প্রকাশ পায় না। গান রচনায় ভাব যতটুকু প্রকাশ পায়, গাইবার সময় ততটুকু প্রকাশকে বজায় রেখে গাইলেই গান পুরোন হয়ে যায়। কিন্তু সেই রচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবের সংগে গায়ক যখন তাই উপলব্ধি করে নিজের হৃদয়ের ভাবরাজ্যের দ্বার খুলে দিতে পারে তখন গান চিরনূতনের পথে যাত্রা করে।—শুধু গানটাই ভাল নয়, মা, তোর গাওয়াটাও ভাল।

তাপসী মায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়ে হারমোনিয়ামটা তুলে রেখে বলল—চা হ'ল, মা?

মা হেসে বললেন—যার জন্যে চায়ের খোঁজ করছিস, আগে দেখ্ সে-ই উঠেছে কিনা? জল ত চাপানই আছে, যখন বলবি করে দেব।

তাপসী হেসে বলল—তা বটে, মা, যা কুঁড়ে মানুষ ওঠেই নি এখনও।

তাপসীর বাবা হুঁকোর জলটা ঠিক করতে করতে এসে দাঁড়ালেন—কে কুঁড়ে মানুষ গো?

তাপসীর মা রহস্য করে বললেন—এই তুমি!

তাপসীর বাবা বিস্মিত হয়ে শুধালেন—কেন, আমার কুঁড়েমি কি দেখলে তোমরা মায়ে-ঝিয়ে।

তাপসীর মা হেসে বললেন—যথেষ্ট গো, যথেষ্ট। দিনরাত শুধু হুঁকো আর হুঁকো।

তাপসীর বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন—তাই বল! কিন্তু হুঁকো টানলেই কি কুঁড়ে হয়? এতেও পরিশ্রম আছে। জল পাল্টান, জলের মাপ ঠিক করা, তাছাড়া একটু নরম পাকের তামাক হলে নেশা হয় না, আবার একটু বেশি কড়া হলে কাশি পায়।

তাপসীর মা হেসে বললেন—তা হলে বেজায় পরিশ্রম হয় বল!

—তা ত হয়ই।

তাপসীর মা জেরা ধরলেন—তবে ধরেই বা ছিলে কেন, আর ছাড়ছই বা না কেন?

তাপসীর বাবা হেসে বললেন—তামাক ধরেছিলাম কেন জান? ছোটবেলায় রীতিমত স্বপ্ন দেখতাম, বুড়ো হয়েছি, চুল পেকে গেছে, হাতে ডাবাহুঁকো নিয়ে চোখ বুজে ঘুমুবার আগে আরাম করে বিছানার উপর বসে টানের উপর টান মারছি—and at last that dream is realised.

তাপসী হেসে বলল—ছোটতে ত বুড়ো হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন—এখন কিসের স্বপ্ন দেখছেন শুনি?

ওর বাবা হেসে বললেন—তোর মা শুনলে এখুনি রাগ করবে। এখন কিসের স্বপ্ন দেখি জানিস? স্বপ্ন নয়, মা, আতঙ্ক। এসব ফেলে যেতে হবে। ধীরে ধীরে দিনে দিনে নির্দিষ্ট সময়ের সীমায় পৌঁছোতে চলেছি। একদিন সংসার রঙ্গমঞ্চের কাজ ফুরোবে। সেদিন নীরবে মঞ্চ থেকে নেমে যাব। সেদিন তোর সঙ্গে তোর মায়ের সঙ্গে সব সম্বন্ধ চুকে যাবে। অজ্ঞাত অন্ধকার আমার স্মৃতিকে আস্তে আস্তে ঢেকে ফেলবে। আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, অবশ্য না থাকারই স্বপ্ন দেখি আমি, চিতাবহ্নির উপর পার্থিব দেহ চিরদিনের মতো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আমারও শেষ হয়ে যাবে।

তাপসীর মা কিছুই বললেন না। আস্তে আস্তে সেখান থেকে উঠে গেলেন। তাপসী ম্লান মুখে বলল—এখানেই সব শেষ হয়ে যায় জীবনের? আত্মা বলে কি কিছুই নেই? তবে রবীন্দ্রনাথই বা কেন বলেছেন—যে ফুল না ফুটিতে—

ওর বাবা ম্লান হেসে বললেন—সেই চরম সত্য নয়, মা, কবির মনের বিশ্বাস, কবি হৃদয়ের উপলব্ধি; কিন্তু মীমাংসার অতীত নয়।

তাপসীর মা ফিরে এলেন। বললেন—তোমরা সকাল থেকে বাপে-ঝিয়ে যতসব অলুক্ষণে কথা নিয়ে বসে বসে গল্প কর, এদিকে চা ঠাণ্ডা হ'ক। ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে আয়, তাপসী, বাপের সঙ্গে বক্‌বক্‌ করিস না।

ওর বাবা হেসে বললেন—মৃত্যু সম্বন্ধে যদি কথা উঠল তাহলে তোর মার মহাঅলুক্ষণ হয়ে গেল। মরণকে বড় ভয় তোর মায়ের।

মরণ ছাড়া দর্শনের অন্য যে কোন আলোচনায় ওঁর খুব উৎসাহ ; কিন্তু দৈবাৎ ঐ কথা এসে পড়লেই সব উৎসাহ নিভে যায়। তারপর তাপসীকে তাড়া দিলেন—যা, মা, ডেকে নিয়ে আয় ছেলেটিকে। না ডাকলে ছেলের মতো আসতে জানে না—বড্ড Shy—Shine যে কি করে করবে ?

তাপসীর মা গর্জে উঠলেন—সে তোমায় ভাবতে হবে না। যা, তাপসী, শীগগির ডেকে আনগে।

কিন্তু ডাকতে যেতে আর হ'ল না। বাউল নিজেই এসে হাজির হ'ল। তাপসী তাড়াতাড়ি একটা সতরঞ্চ বিছিয়ে দিল। বলল—বসুন।

ওর মা চায়ের কাপ সামনে নামিয়ে রেখে বললেন—এমনি করে ছেলের মতো নিজেই আসবে, বাবা। বাইরে পরের মতো পড়ে থাক, চা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হয়, সেটা কি ভাল দেখায়। আমরা তো তোমাকে পর ভাবিনে, বাবা।

তাপসীর বাবা হুঁকোয় একটা জোর টান মেরে বলে উঠলেন—ঠিকই ত, কেন তুমি বাইরে পড়ে থাকবে ? তাপসী মা, বাবাজীবনকে আমার পাশের ঘরটা পরিষ্কার করে দেবে।

তাপসী হেসে বলল—আজ যে বড় নিজেই চলে এলেন ? আমি ভাবছিলাম হয়তো আপনার এখনও ঘুমই ভাঙেনি।

—ঘুম সকালেই ভাঙে, তাপসী। কিন্তু কাজের কোন তাগিদ থাকে না বলেই আর একবার ঘুমিয়ে পড়ি।—একটু হেসে আবার বলল—আজ তোমার গান শুনতে শুনতে মনটা এমন চঞ্চল হয়ে উঠল যে আর ঘুমোতে পারলাম না। শেষে এখানেই চলে এলাম তোমার গান শুনবো বলে।

তাপসীর গানের প্রশংসা শুনে ওর বাবাও ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন—ভারী ভাল গান গায়। সিনেমা আর্টিষ্টেদের মধ্যেও এত ভাল গলা নেই। উনি আরো হয়তো বকেই চলতেন, কিন্তু তাপসীর মা ওঁকে নিরস্ত করে দিলেন।

—কি বাজে বকছ ? গানের তুমিও ছাই বোঝ, তাই অভিনয়ের সঙ্গে অকৃত্রিম হৃদয়োচ্ছাসের তুলনা করছ। তারপর বাউলের দিকে তাকিয়ে বললেন—সত্যি বাবা, এমন হৃদয় দিয়ে গাওয়া গান তুমি কোথাও শোননি। দরদী হৃদয় ছাড়া এমন করে গাইতে পারবে না। তুমি ত আমার তাপসীকে জেনেছ। এমন মেয়ে হাজারে একটাও মিলবে না।

বাউল হেসে বলল—হাজারে কেন, ভারতের সমগ্র নারী সমাজে এর জুড়ি মিলবে না। সকল নর-নারীই আপন আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জন্মে থাকে, তাই সত্যিকারের দুটো একই জিনিষের সত্যিই অভাব।

বাউলের কথায় তাপসীর মা প্রতিবাদ করে জানালেন—যদিও জগতে সম্পূর্ণ অভিন্ন বস্তু দুর্লভ, তবুও সমগুণের অভাব নেই, বাছা। তাপসীও দুটো জন্মায়নি সত্য, কিন্তু তাপসীর মত দরদী সুগায়িকা দুর্লভ নাও হতে পারে।—এই বলে ওর মা সেখান থেকে চলে গেলেন।

তাপসী হেসে বলল—আপনি নিজেই ত একজন দরদী সুগায়ক।

বাউল কিছুই বলল না। তাপসীর বাবা সাগ্রহে বললেন—তাই নাকি? তাহলে বাবাজী সুগায়কও? ঐ সকাল বেলায় একটা ভৈরবীরই আলাপ করে ফেল। লজ্জার ত কিছু নেই, আমরা তোমার মা বাপের মত। নাও, গেয়ে ফেল। একটা শ্যামা সঙ্গীত বা রবীন্দ্র সঙ্গীত গোছের।

তাপসী ওকে আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে বলল—কি, হ'ল ত এবার?

বাউল সহাস্যে বলল—এবার তোমার একাধিপত্য গেল ত?

তাপসী ওর কথার কোন উত্তর না দিয়ে ওর দিকে হারমোনিয়ামটা আগিয়ে দিয়ে বলল—নিন, মান বাড়াবেন না। গেয়ে ফেলুন।

বাউল গান ধরল—

দাও হে আমার মাথা নত করে
তোমার চরণ ধূলার তলে
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে
ইত্যাদি

আজ যেন একটা নূতন দিন বাউলের। একটা পরম স্মরণীয় দিন। সংসার ছেড়েও সে ছিল মানুষেরই কাছে—সমাজের অষ্টোপাশের আলিঙ্গনে। তবুও যেদিন সে গৃহত্যাগ করে ঐ নূতন জীবনের যাত্রা সুরু করেছিল সেদিনটাও ছিল জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। এক জীবনারম্ভের নূতন প্রভাত। গেরুয়া ত্যাগ করে এসে পর্যন্ত সে দাঁড়িয়েছিল সংসারের

দরজায়, কিন্তু প্রবেশ করা হয়ে ওঠেনি। তবে আজ যেন তাকে বিশেষ করে টেনে নিয়ে গেছে সংসারের অভ্যন্তরে।

এখন সে এই পরিবারেরই একজন। সমস্ত ব্যবধান গেছে মুছে। সমাজ-সংসারে সে তার ফিরে আসাকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পেরেছে। এক নূতন জীবনের দ্বার গেছে খুলে। রাত্রি শেষে নূতন জীবনের আলো ফুটে উঠেছে। তাই আজও একটি স্মরণীয় দিন। এ দিনটা কি ভোলা যায়? সে ভুলবে না কোনদিন। জীবনযাত্রার চাকার সঙ্গে এও ঘুরছে। অম্লান স্মৃতি জীবনের পট থেকে মুছবে না কোনদিন। মুছবে না তাপসী। তাপসী তার হৃদয়ের সমগ্র আসন জুড়ে আছে,—হয়তো সে আসনে আর কাউকে বসাতে পারবে না কোনদিন।

কিন্তু তাপসী যদি সে আসনে বসতে না চায়? যদি সে তাকে গ্রহণ না করে? কিন্তু কাকেই বা সে গ্রহণ করবে? কেনই বা সে এমনি করে সবাইকে এড়িয়ে এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াবে? সুধীরের কথা মনে পড়ে গেল। সেও ত তাপসীকে ভালবাসত। তাপসী?—সেও তাকে ভালবাসে। কিন্তু তবু কেন তাকে গ্রহণ করল না। বিবাহের প্রস্তাবকে সে দূর থেকে দূরেই ঠেলে দেয়। যেন পুরুষের কোন মূল্য নেই—নারীর উপর কোন প্রভাব নাই। চিন্তায় বাউলের ঘুম আসে না রাত্রে।

মনে পড়ে, কত বিপ্লব এল জীবনে—এল সমাজে—এল রাষ্ট্রে। তিনশ বছরের পরাধীনতার হাত থেকে ভারত হ'ল স্বাধীন। বন্দেমাতরম্ হ'ল মহামন্ত্রে—জাতীয় সঙ্গীত। উমেশচন্দ্রের কংগ্রেস ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেস। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত সখের কংগ্রেস হ'ল ওদের ফাঁসের কংগ্রেস। ক্লাইভ কার্জন পর্যন্ত ক্রমবর্দ্ধমান উপনিবেশ একদিনের আইনেই হ'ল শেষ। ইংরেজ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত গেল।

ভারত স্বাধীন। সবাই শুনছে, কিন্তু কেউ কি তা জেনেছে, কেউ কি তাকে চিনেছে? তাহলে ওরা পিছন তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেন?

দেশে নির্বিবাদী লোকের বড় অসুবিধা হয়ে গেছে। খাঁচার পাখির খাঁচার জন্তে আফশোষ। বেশ ছিলাম ছোট্ট টিনের খাঁচায়। লাল লাল ফল খেতাম দাঁড়ে বসে বসে। তৃষ্ণার সময় পেতাম স্বচ্ছ জল। কোন বিপদের ভয় পর্যন্ত নেই। খাঁচার বাইরে এসে সবটাই অসুবিধা। নিজের খাবার খুঁজে মর। নিজের প্রাণ সামলে চল। আকাশে দাঁড় নেই। এত অসুবিধায় কি মানুষ বাঁচে?

এমনি নানা চিন্তা ভিড় করছিল ওর মনে। কিন্তু তবুও এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ঘুম ভাঙল তাপসীর ডাকে—বাউল মশায়, উঠুন, বেলা যে অনেক হ'ল।

বাউল চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে উঠল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, এ কোথায় রয়েছে সে। গতকল্যের স্থান পরিবর্তনের কথা মনে ছিল না; তাই বিস্মিতের মত তাকাল তাপসীর দিকে।

তাপসী হেসে বলল—কি ভাবছেন, এ কোথায়? কাল যে বারমহল ছেড়ে ভিতর মহলে এসেছেন, স্মরণ হচ্ছেনা বুঝি?

বাউল সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকাল। বলল—চা হয়েছে?

চা খেতে খেতে বাউল সামনের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে একটা ফটো দেখছিল। চা শেষ হতেই খালি কাপটা নামিয়ে রেখে ফটোটার কাছে এগিয়ে গেল। এ কার ফটো? কত বছর আগে যেন একে দেখেছে, কিন্তু ঠিক স্মরণ করতে পারল না।

তাপসী ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। শুধাল—কি দেখছেন?

তাপসীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধাল—কার, তোমার?

—না, আমার বোনের?—চোখদুটো ছল্‌ছল্‌ করে উঠল তাপসীর। ও এখন নেই—তের বছর আগে পুকুরে ঝাঁপ দিতে গিয়ে ডুবে মরেছে। সেদিনটা কি না গেছল। লোকে এসে খবর দিল—মানসী ডুবে গেছে। বাবা কলকাতায় তখন চাকরী করেন। মা ছুটলেন পাগলের মত। আমিও কাঁদতে কাঁদতে তার পিছুপিছু ছুটলাম। যখন তোলা হল সব শেষ! মা শয্যা নিলেন। বাবা তার পরে এসে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তারপর সেখানেই তের বছর কেটে গেল।

বাউল আর কিছু শুধাতে পারল না। সারাদিনে তাপসীর সঙ্গে আর কথাও হ'ল না। রাত্রে ঘুমাবার আগে তাপসী অন্য দিনের মত এসে দাঁড়াল। বলল—গ্লাসে জল ঢাকা রইল, বিছানা ঝেড়ে শুয়ে পড়ুন।

বাউল নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

তাপসী একটু দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই বাউল ডাকল—তাপসী!

—কিছু বলবেন ? বাউল সংকোচে কিছুই বলতে পারল না। শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

তাপসী হেসে বলল—এত লজ্জা কেন ? বলুন।

—ফটোটা, মানে—বলতে বলতে ক্রমে আরও সংকুচিত হয়ে উঠল। কে জানে ফটো প্রসঙ্গে হয়তো আহত হতে পারে তাপসী। হয়ত নির্বাপিত শোকের শিখা আবার জ্বলে উঠতে পারে। তাই অনুমতির প্রার্থনা জানিয়ে ওর দিকে আবার তাকাল।

তাপসী বিচলিত হ'ল না। হাসি মুখে প্রশ্ন করল—কি হ'ল আপনার ? ফটো কি ?

বাউল এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলল—ও মুখখানা আমি চিনি।

তাপসী হেসে বলল—তা চিনবেন বৈকি ? কাল থেকেই ত দেখচেন অনবরত।

বাউল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল—না-না, তাপসী, আমি ওকে চিনি। হ্যাঁ, ওকে চিনি।

তাপসী সহাস্তে বলল—বেশ ত। ও আপনাকে চিনতো নিশ্চয়ই—হয়তো কোনদিন এখানে এসেছিলেন। না হলে পূর্বজন্মের কোন পরিচয় আপনাদের ছিল। তাছাড়া চেনার কোন উপায় নেই।

বাউল প্রশ্ন করল—কেন, অন্ত কোথাও যদি দেখা হয়ে থাকে ?

তাপসী হেসে বলল—যদি আমাকে বলতেন তা হলে হয়তো সম্ভব হ'ত, কিন্তু ও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানের মাটি ছেড়ে একদিনের জন্তেও কোথাও যায়নি। আর চিনলেই বা কি হবে, সে ত আর আসবে না! শেষের কথাটা উচ্চারণ করতে তাপসীর গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠল। বাউল আর কোন কথাই বলতে পারল না।

তাপসী শুধাল—আর কিছু বলবেন ?

—না।

—তাহলে আমি আসি, আপনি শুয়ে পড়ুন।—এই বলে তাপসী দ্রুত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই পায়ের শব্দ বহুক্ষণ ধরে নিজের বক্ষে অনুভব করল বাউল। বহুক্ষণ কানের মধ্যে হেঁটে যাওয়ার শব্দ বাজতে লাগল।

তাপসী হয়ত এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু বক্ষের প্রতিটি স্পন্দনে

ধ্বনিত হচ্চে তাপসীরই পায়ের শব্দ। বক্ষের উপর চাপ দিয়েও সে যেন থামল না। সে যেন থামবে না। যেন ভূতে পাওয়ার মত শব্দটা তাকে পেয়ে বসেছে।

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করল; কিন্তু ঘুম এল না। শেষে নিরুপায় হয়ে বিছানার উপর উঠে বসল। খাবার জলের গ্লাসটা থেকে খানিকটা চোখে মুখে দিল। তারপর বাকিটা টেবিলের উপর ঢাকা দিয়ে রেখে দিল।

এবার একবার ফটোটা চোখে পড়ল। রাত্রে যেন ও মুখখানা, ও চোখ দুটো সজীব হয়ে উঠেছে। নিষ্প্রভ বাতিটার পলতে উস্কে দিয়ে সে আলোটা ফটোর মুখের উপর ভাল করে ধরল। একটি দশ এগার বছরের বালিকার ছবি। বয়সের তুলনায় মুখখানা অনেক বেশি বাড়ন্ত। সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের মত মুখখানা ওর, কাঁচের আবরণের মধ্যেই ঢলঢল করছে। ঢলঢলে চোখের চাহনিটাই সব থেকে বেশি জীবন্ত করে রেখেছে ফটোখানা। ওরই দিকে যেন রহস্যভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

বাউল বিগত জীবনের পাতা উল্টে চলে: কোথায় দেখেচে ওকে? জীবনের বর্ষলিপি থেকে অনেক ছবিই চোখের সামনে ভেসে উঠল, কিন্তু কই তাদের মধ্যে এর মুখখানা ত পাওয়া যায় না। বিস্মৃতির স্তূপ থেকে এর স্মৃতিকে উদ্ধার করতে পারল না।

চিন্তা করতে করতে চোখ জড়িয়ে এল। মস্তিষ্কের শিরা শিথিল হ'ল! মুহূর্তের জন্যে মুক্তি পেল সকল চিন্তা সকল অশান্তির হাত থেকে! দেখল, গভীর বন, শাল কুড়চির ফুল ফুটে রয়েছে গাছে গাছে। দু-একটা পাখি ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে মধু খাচ্চে ফুল থেকে। বিচিত্র রঙের প্রজাপতি উড়ছে গাছে গাছে। একটি বার তের বছরের ছেলে বনের পথে পথে এগিয়ে চলছে। মাথায় এক মাথা চুল, গায়ে গেঞ্জি, পরনে নীল রঙের একটা হাফপ্যান্ট। হেঁটেই চলেছে—হেঁটেই চলেছে। কত ফুলের কুঞ্জ পাখির কূজন মৌমাছির গুঞ্জরণ আর দুর্ভেদ্য কাঁটার বন রইল পিছে পড়ে। পিছে পড়ে রইল পায়ে হাঁটা আঁকা-বাঁকা পথ। রোদ উঠল পেকে। মাথার উপর সূর্য। ঘেমে উঠে কাছেই একটা গাছের নিচে বসল। বাউল একবার চিনে ফেলল ছেলেটিকে। এরই মাঝে নিজেকে নিজের ফেলে আসা জীবনকে উপলব্ধি করল। এ সেই—সে নিজেই।

তারপর দ্বিতীয় দৃশ্য: বনের শেষে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামকে

ঘিরে আম কাঁটালের বন। শেষে সে পেটের জ্বালায় একপাল গরু নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে মরছে। ক্ষুধায় পেট জ্বলে যায়।

একটি মেয়ে এল। হাতে তার নানা রকমের খাবার। চিরপরিচিতের মতো সে তার পাশে এসে দাঁড়াল। ঠিক ফটোর মেয়েটিরই মতো। বলল—খাওনা, ভাই—এক সঙ্গে খাই। কত স্নেহ করে খাওয়াল। শেষে প্রতিদিনের সাহচর্যে সে বড় আপনার হয়ে উঠল। একদিন সে জানাল—সে বাড়ি যাচ্চে। বড্ড খারাপ হয়ে গেল মনটা। দেখল সেই বালক বড় ব্যাকুল হয়ে বালিকার হাত দুটো ধরে ফেলল—তুমি যেও না মনো, তুমি যেও না।

মেয়েটি হাসি মুখে বলল—আমি চিরদিন কি থাকতে এসেছি? চলে ত যাবই। চলে যাব বলেই তো এখানে এসেছি।

বালকটি ছলছল চোখে বলল—তুমি তাহলে আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?

—কি করবো, আমাকে যে যেতেই হবে।

শুনে ছেলেটির চোখে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। মেয়েটি সস্নেহে বলল—তুমি কেঁদনা, আমি আবার আসবো। ঠিক আসবো, দেখবে।

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল—না। তারপর ব্যাকুলভাবে ওকে জড়িয়ে ধরল—না না, তোমাকে ছেড়ে দেব না। তোমাকে আমার কাছে রেখে দেব।

মেয়েটি বিজ্ঞের মতো বলল—তুমি কি আমার বর? তুমি কি আমাকে বিয়ে করেছ?

ছেলেটি মাথা দুলিয়ে বলল—হ্যাঁ, করেছি ত।

—ধ্যাৎ, মিথ্যে কথা। কই, আমার মাথায় সিঁদুর কই! মায়ের কপালে সিঁদুর আছে, বিয়ের সময় বাবা পরিয়ে দিয়েছিলেন। মালতিদির বিয়ে হ'ল, ওর বর গলায় মালা দিয়েছিল, মাথায় সিঁদুর দিয়ে দিয়েছিল। মাথাটা সিঁদুরে লাল করে দিয়েছিল।

যুক্তিতে হেরে গিয়ে ছেলেটি নিরুপায় হয়ে ওর হাতটা ধরল—না, তোমাকে যেতে হবে না!

মেয়েটি সহানুভূতির সঙ্গে শুধাল—তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

ছেলেটি বলল—সিঁদুর কোথায় পাবো?

মেয়েটি যত্নে রক্ষিত তামার পয়সাটি ডুরে রঙের সাড়ির খুঁট থেকে

বের করে দিল। ছেলেটি দৌড়ে সিঁদুর নিয়ে এল। ললাটে মাথায় বেশ করে মাখিয়ে দিল। বালিকারই গাঁথা একটি মালা পরিয়ে দিল ওর গলে। বলল—তুমি আমার বৌ—বৌ—বৌ। মেয়েটি হাসতে হাসতে ওর গলায় পরিয়ে দিল আকন্দ ফুলের একটি মালা। দু হাতের তালু দিয়ে ছেলেটির গণ্ডদুটো টিপে বললে—তুমি আমার বর—ও বর!

তারপর? চমক ভাঙল ছেলেটির—একি করেছে সে? মনোর গোটা মাথাটা যে সে সিঁদুর ভর্তি করে দিয়েছে। ছেলেটি দৌড়ল বনে বনে। আর মনো? সে ভয়ে ভয়ে দৌড় দিল ঘরে। ছেলে দৌড় দিল বনের মধ্যে—নিরুদ্দেশের পথে। দৌড়াতে দৌড়াতে হোঁচট খেল। বাউল চোখ মেলল পায়ে আঘাত পেয়ে; কিন্তু ঘুম ছাড়বার আগেই চোখ দুটো জড়িয়ে গেল আবার। বাউল আবার স্বপ্ন দেখল—মেয়েটি, ফটোরই মেয়েটি—মাথায় এক মাথা সিঁদুর। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুকুরে—ডুবছে—হাত পা ছুঁড়ছে বাঁচবার চেষ্টায়। বাউল চীৎকার করে উঠল—কিন্তু গলা থেকে সাড়া বেরুল না। মেয়েটি ওর চোখের সামনেই ডুবে গেল। সেও ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। ঘুম ভেঙে গেল বাউলের। দেখল, সমস্ত জামা কাপড় ভিজে গেছে ঘামে। বাউল বিছানার উপর উঠে বসল। জামা কাপড় ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। খুব তৃষ্ণা পেয়েছে। গ্লাসের বাকি জলটা ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে ফেলে আবার শুয়ে পড়ল। আবার সেই মেয়েটি হাসতে হাসতে পুকুরের কালো জল থেকে উঠে এল। বলল—তুমি এসেছ? পায়ের মল বাজিয়ে মেয়েটি এগিয়ে চলল। বলল—এস।

বাউল শুধাল—কোথায়?

মেয়েটি খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল—আমার সঙ্গে।

বাউল ভয়ে ভয়ে শুধাল—কোথায় যাবে?

—যাব যেখান থেকে এলাম সেখানে।

বন পথ ধরে মেয়েটির পিছু পিছু চলল বাউল। মেয়েটি ঝম্‌ঝম্ করে পা ফেলে ফেলে একটা দীঘির ঘাটে এসে দাঁড়াল।

বাউল চমকে উঠল। এ যে পুকুর? এখানে কোথায় যাবে?

উত্তর না দিয়ে মেয়েটি ছুটে জলে নেমে গেল। দেখতে দেখতে জলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। বাউল বিহ্বলের মতো তাকিয়ে রইল জলের দিকে।

মেয়েটি জলের উপর মাথা তুলে আবার ডাকল— ওগো, নেমে এস।

—কোথায়, জলের নিচে ?

বাউল ভয় পেয়ে গেল। মনো কি নেই ? সে কি জলে ডুবে মরে গেছে ? যে তাকে ডেকে আনল সেকি তবে ভূত ? ভয়ে ঘামছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

মেয়েটি আবার মাথা তুলে বলল—কি, ভয় পেলে ? তারপর হাসতে হাসতে ফেটে পড়ল। হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে নিজেও হারিয়ে গেল। কালো জলের উপর কয়েকটা পদ্ম গভীর বেদনার মতো ওর বুকে আশ্রয় নিয়েছে।

বাউল চিৎকার করে উঠল—কিন্তু গলার স্বর বেরুল না। একি তবে দুঃস্বপ্ন ? জোর করে চোখ মেলতে চাইল, কিন্তু খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। মনে হ'ল, তাকে ঘিরেই সে ঘুরে বেড়াচ্চে, তবুও তাকে দেখা যাচ্চে না। মনে হচ্চে, তাকে ঘিরেই ঘাটের চারধারে সে ঘুরচে। অস্পষ্ট কালো ছায়ার মতো তাকে দেখা গেল। গুণগুণ সে গান গাইছে। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল তার গান—

তোমারে আমি চিনেছি—
আমার হৃদয় খুঁজিয়া তোমারে আমি
পেয়েছি—আমি জেনেছি—
ঘুরিয়া ঘুরিয়া তোমারে খুঁজেছি।
রাত্রি জুড়িয়া আঁধার হয়েছে
ওগো এতদিনে দেখা পেয়েছি—
তোমায় জেনেছি—ওগো তোমায় চিনেছি।

বাউল কম্পিতকণ্ঠে শুধাল—তুমি কে ? মেয়েটি গানের সুরে বলল—

আমি হারিয়ে যাওয়া—
আমি তলিয়ে যাওয়া ঐ জলের নিচে।
বনের ধারে ফুলের মালায়,
তোমার এই হাতের রেখায়,
আমার সিঁথির সিদুর লিখায়,
আমি যে ছড়িয়ে যাওয়া।
আমি যে হারিয়ে যাওয়া—
তুমি চক্ষু বুজে আমায় খুঁজছ মিছে।

—মনো, তুমি এসেছ ? আবার চোখের সামনে থেকে মুছে গেল মনোর প্রতিচ্ছবি। চোখের সামনে ফুটে উঠল দিনের আলো।

কানে শুনল গান নয়, তাপসীর গলা—আস্ত সকাল বেলায় পড়ে-পড়ে স্বপ্ন দেখছিলেন? মা ত বললেন—যা তো, দেখে আয় কেন এমন করে চেঁচাচ্ছে?

বাউলের স্মৃতি থেকে তখনও মুছে যায়নি গত রজনীর স্বপ্ন। তখনও স্বপ্নজগতের প্রতিক্রিয়া মন থেকে নষ্ট হয়নি; তাই তাপসীর প্রশ্ন শুনে নির্বোধের মতো তাকাল ওর দিকে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল —তাপসী, তুমি?

তাপসী হেসে বলল—কেন, সন্দেহ হচ্চে বুঝি? এখন সোনাপুরের এক মেটে ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে নেই, এখনও খলিফ হারুনঅল রসিদ।

বাউল তাপসীর কথায় উত্তর দিল না। উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ক্ষণেক। তারপর হঠাৎ বলে উঠল—তাপসী!

—বলুন।

—না, থাক।

—থাক কেন, বলে অন্তরটা খোলসা করুন অন্তত।

বাউল ম্লান হেসে বলল—বলে ফেললেই অন্তরের সব ভার লাঘব হয় না। মনের মধ্যে শুধু পাপপুণ্যেরই দ্বন্দ্ব হয় না, তাপসী। তাছাড়াও অনেক ধরণের ঝড় মানুষের মনে উঠতে পারে। হ্যাঁ, চা হয়েছে?

—হয়েছে। এই যে নিয়ে আসছি। এই বলে ব্যস্তভাবে তাপসী উঠে গেল। তারপর হাতে চা নিয়ে এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল।

—এই নিন চা।

বাউল ওর হাত থেকে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে বলল—বস। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

তাপসী বসতে বসতে বলল—মেয়ে মানুষের কি বসে থাকলেই চলবে?

বাউল হেসে বলল—এটা তোমাদের, অর্থাৎ মেয়েদের সম্বন্ধে বললে, না আমাকে আঘাত করলে?

—আজ্ঞে না, এটা আপনাকে বলা হয়নি।

—কিন্তু আমারও ত কাজ করা উচিত?

—উচিত অনুচিতের কথাও আমি বলিনি, আমি প্রয়োজনের কথা বলছি। যেদিন সত্যই প্রয়োজন হবে সেদিন আপনিও বসে কাটাবেন না। থাক, আমি উঠি এবার, মাকে কাজে সাহায্য করতে হবে।

—তবে যাও। তাপসী শূন্য কাপ-ডিসটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। বাউল স্বপ্নজগত থেকে এল চিন্তা জগতে।

তাপসীর বোনের ফটোটা ঝুলছে দেওয়ালে—বড় সুন্দর মুখখানা। দিনের বেলায় আরও স্পষ্ট দেখাচ্ছে ছবিখানা। স্বপ্নে দেখা মেনকার সঙ্গে এতটুকু তফাৎ নেই। তবে কি সত্যই এ সেই মনো? সত্যই কি সে এসেছিল? বাউল যত্ন করে ফটোটা নামিয়ে আনল। চোখের সামনে ধরে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

অনেকক্ষণ দেখবার পর মনে হ'ল এ সেই। স্বপ্নে দেখা দিয়ে সে জানিয়ে গেল তার অকৃত্রিম প্রেম, অবিকৃত শুভ্র প্রেম।—জানিয়ে গেল সে ভালবাসে! বাউল বুকে জড়িয়ে ধরলো ফটোটা। অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলে চলল—মনো, আমি এসেছি, আমি এসেছি। বিধাতা আমাকে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে দিয়েছে, কিন্তু তুমি নেই? সব সম্ভাবনা ব্যর্থ করে দিয়ে তুমি সরে গেছ আগেই। বহু আগেই। শুধু ফেলে রেখে গেছ তোমার অকৃত্রিম পতিঅনুরাগ।—তোমার নির্মল ভালবাসা। যদি মর জগতের বাইরেও আত্মা বেঁচে থাকে, মানুষের কামনা বাসনা অরূপ হয়ে মর জগতে স্বীয় স্বতন্ত্র অবেষ্টনীতে বেঁচে থাকে, যদি তোমায় ভালবাসি—আমি তোমায় চিনেছি—আমি জেনেছি, ওগো জেনেছি।

বাউলের দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। দুহাতে চোখ মুছে ভাবল, একি, আমি পাগল হলাম না কি? শৈশবের খেলার একটা তুচ্ছ স্মৃতিকে জড়িয়ে জড়িয়ে কত বড় মিথ্যার সৌধ গড়ে তুলেছি। মিথ্যা—সব মিথ্যা। মানুষই যখন মিথ্যা তখন মিথ্যার মধ্যে সত্য কেমন করে আসবে? জীবন যৌবন সব মিথ্যা। মিথ্যা জনপদ সমাজ রাষ্ট্র। কালস্রোতে সবই বুদ্বুদের মতো ফেটে পড়ে।

তার নিজের গ্রামের কথা মনে পড়ে। তাদের গ্রামটা কত সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে দিন দিন। হয়তো কালক্রমে একদিন বড় শহরই হয়ে উঠবে। কিন্তু কত বছরেরই বা পুরাতন এই গ্রাম! আদিকালের মানুষ, মহাকাব্যযুগের মানুষ, পৌরানিক যুগের মানুষ, হিন্দু যুগের মানুষ সেখানে বাস করেছিল কিনা অজ্ঞাত। কে জানে ওখানের মাটি খুঁড়লে কোথাও সে যুগের একটু স্মৃতি বেরুবে কিনা? কে জানে সে যুগের দীর্ঘাকৃতি মানুষের কঙ্কাল, প্রস্তর যুগের কুঠার, মহাকাব্য যুগের রথচক্র, পৌরানিক যুগের

সাহিত্য, আর হিন্দু যুগের শিলালিপি পাওয়া যাবে কিনা? তবে পুকুর বা কুয়া খুঁড়ে কাঁকর আর মাটি ছাড়া কিছু পাওয়া যায় নি। মুসলমান যুগের কোন ভগ্ন পল্লীর স্মৃতিও সেখানে নেই। ইংরাজ যুগের প্রারম্ভে যখন এখানে সেখানে নূতন করে গ্রাম গড়ে উঠছিল তখনও সেখানে ছিল মস্ত বড় বন। উত্তর প্রান্তে যেখানে বনের শেষ বা আরম্ভ সেখানে ছিল একটা কাঁচা রাস্তা—এখন সেইটাই ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা। তখন সেই কাঁচা রাস্তাটাই ছিল বাঁকুড়া থেকে বর্দ্ধমান যাবার পথ। যখন বাঁকুড়া জেলার কতকাংশ জঙ্গল কেটে নামে ইংরাজী কাগজপত্রে উল্লেখ করা হ'ত, তখন তার জন্মভূমি ছিল জঙ্গলঘেরা। সে বনে বাস করতো বাঘ ভালুক আর যে কি থাকতো সে খোঁজ কেউ রাখতো না। তখনও ইংরাজী বাঁধন এমন আষ্টেপৃষ্ঠে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায়, পুলিশ চৌকিদারী বাঁধা ছিল না, ইড়িমিড়ি কিড়ি বাঁধন তখনও ছিল আলগা। জনসাধারণ তখন চোর ডাকাতের থেকে দারোগা পুলিশকে বেশি ভয় করতো। ডাকাতকে তখন ভয় কি? ঘরে ঘরে তেলে পাকা লাঠি,—ঘরে ঘরে আধমণে পলোয়ান—ভর্তিপেটেও দশ সের চিঁড়ে খেয়ে ফেলতে পারে। এসব কথা সবই বাউলের শোনা। সে নিজে দশ ছটাকি পলোয়ান।

একদিন সেই বনে দুচার ঘর লোক বাস করতে এল। ঝোপ জঙ্গল কেটে তা কঘরেই কয়েক বছরেই বহু জমি তৈরী করে ফেলল। মাটি কেটে স্নানের ও পানের পুকুর তৈরী করে ফেলল। এক ঘর পুরুত আনলে কোথা থেকে।

সবুজ ক্ষেতে ভরা গ্রামটি বনের মাঝে জমে উঠল। ঘরে ঘরে দুধ, আঙ্গিনায় আঙ্গিনায় মরাই। বড়ই সুখে দিন কাটছিল তাদের। একদিন কোথা থেকে এক ব্রাহ্মণ এলেন—দশাসই চেহারা, প্রশান্ত মুখ। ভারি ব্রাহ্মণ। বাড়িতে তাঁর দুর্গোৎসব, নিজে ত্রিসন্ধ্যে না করে জল খান না। সবাই ভক্তিতে মাথা নত করল। তিনি এখানের আদি-বাসীদের জানালেন, তিনি এখানে বাস করবেন। তিনি বাড়ি তৈরী করলেন। ছেলেরাও তাঁর এসে জুটল। পাশাপাশি চুরি ডাকাতি সুরু হ'ল। কেউ কেউ ঠাকুরমশায়ের ছেলেদের সন্দেহ করতো—যা তাগদ ছেলেদের! রাত বারোটায় এখান থেকে তিনি মাইল দূরে নিজেদের

আগের বাড়িতে শুতে যায়, আবার ভোরেই ফিরে আসে। একটা দশ সেরে খাসি একবারে খেয়ে ফেলে এর একজন।—সন্দেহ কার না হয়?

এই রাস্তার ধারে ছিল তারক বেনের দোকান। দোকান যে কিসে চলতো আর কি যে লাভ হ'ত সেই জানে। তবে শোনা যায়, যে তার দোকানে পা দিত পথে তার রাহাজানি হ'তই। সর্বস্ব খুইয়ে দোকানে ফিরে এলে সে ঠাকুরমশায়ের বাড়িতে পৌঁছে দিত। তিনি আদর যত্ন করে খাইয়ে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু তবুও তারক বেনের বদনাম, ঠাকুরমশায়ের বদনাম। লোকে বলে, তিনিই ছিলেন সর্দার, দোকানি তারক দিত সন্ধান। ঠাকুরমশায় যেমন বাড়ি এলে অতিথির যত্ন নিতেন, তেমনি ছেলেদের নির্দেশও দিতেন পথের মধ্যে রাহাজানি করবার। না হলে দোকানি আর ঠাকুরমশায়ের এত শ্রীবৃদ্ধি কেন? কিন্তু এসব কিংবদন্তিতে বাউলের বিশ্বাস হয় না। ঠাকুরমশায় প্রাতঃ-স্মরণীয়। এখনও অনেকে নাম করে তাঁর। যাঁরা তাঁর নিন্দা রটিয়ে গেছেন তাঁরা হয়তো তাঁর ছেলেদের শক্তির কথা, উপার্জন ক্ষমতার কথা বিস্মৃত হয়েছেন।

ঠাকুরমশায়ের পর অভি মুখুজ্জে হ'ল গ্রামের পয়গম্বর। দেনার দায়ে কাউকে করল উচ্ছেদ কাউকে করল পথের ভিখিরী। তার দাপটে সব চুপ। এর সমস্ত জীবনটাই বাউলের শোনা নয়, তার শেষ বয়সের দাপট খানিকটা সে সচক্ষে দেখেছে।

তারপর চাটুজ্জেরা এল দৌহিত্র হয়ে। তাদের আমলেই গ্রামের নাম বেরাল। তারা সাধারণের হাতে তুলে দিল ব্যক্তিস্বাধীনতা—স্বাধিকার। অর্থাৎ গ্রামটা গণতন্ত্রের পথে এল। কিন্তু লোকে তাও কি মেনে নিতে পারল? তবুও লোকে নিন্দে করে চাটুজ্জেদের! বলে, ওরা লোককে বিনা পয়সায় ঔষধ দেয় যখন-তখন, নিশ্চয়ই সরকারের কাছে মোটা রকম টাকা খাচ্চে। ওরা বই দান করছে—নিজেরাই খেতে পায় না, বই দান কেন? নিশ্চয় দুরভিসন্ধি আছে কোন!

চাটুজ্জেরা নিজেদের মানও রাখতে পারলে না, মিছিমিছি মুখুজ্জেদের একচেটিয়া আমলটা নষ্ট করে দিলে। লোকে বলে, আমল ছিল মুখুজ্জের। কি শাসন! চাঁদা দেবে না? নাইবা খেতে পেলে—মর না কেন—ঘটিবাটি তুলে নিয়ে আসত। লোকে তাঁরও নাম করে, তাঁকেও বলে প্রাতঃস্মরণীয়।

আর গ্রাম! শহরের মতো হয়ে উঠছে দিন দিন। পাকা রাস্তা, ইস্কুল, পোষ্টাফিস, লাইব্রেরী, ষ্টেশন, বাসরুট, পিচ্ ঢালা রাস্তা—হয়তো ইলেক্ট্রিকও একদিন আসবে। কি ছিল আর কি হ'ল!

আবার তারই এক মাইল দূরে কোদমা গ্রাম। তারই খানিকটা দূরে যেখানে ভীমের লাঙল—লোকে বলে গরু লাঙল সব পাথর হয়ে গেছে, সেই পরিত্যক্ত গ্রামটাও একবার ভেসে উঠল বাউলের চোখে। লোকের মুখে মুখে ভীমের লাঙলের প্রবাদ। তারা বলে শিবের আদেশে রাত্রির আগেই চাষ করতে করতে রাত শেষ করে ফেলেছিল বলেই ভীম লাঙল গরু শুদ্ধ পাথর হয়ে আছে কত যুগ ধরে। ভীমের মুক্তি নেই। হয়তো পাথরটা নিশ্চিহ্ন হবার আগে হবেও না।

বাউল একবার দেখতে গেছল। নিরক্ষর লোকেরা যাকে গরু বলে গরুর সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই। ছাদের খিলান আর মন্দিরের চূড়ার সঙ্গে বেশ মিল আছে বরঞ্চ।

যেসব পাথর সেখানে ছড়িয়ে আছে সেগুলি জোড়াতালি দিয়ে একটা দুর্গ বা একটা তৎকালীন জনপদের কল্পনা করা অসম্ভব নয়। কখন যে ছিল আর কখন যে ভাঙল সে ঐতিহাসিকরাই বলতে পারেন। এমনি পাশাপাশি একদিকে ভাঙছে একদিকে গড়ছে—একদিকে জন্মাচ্ছে একদিকে মরছে। জন্ম আর মৃত্যু, ভাঙা আর গড়া, এই হচ্চে সত্য।

একটি মানুষের প্রয়োজনে হচ্চে কত সহস্র সহস্র মানুষ। বংশানুক্রমে আদম আর ইভ থেকে এলো মানুষের সমাজ। যদি সব মানুষই বেঁচে থাকতো তাহলে যেমন মানুষে মানুষে ঠোকাঠুকি হ'ত, তেমনি যদি মরা মানুষের আত্মা-গুলোও আকাশ জুড়ে থাকতো তাহলে তাদের মধ্যেও ঠোকাঠুকি হ'ত। আর আত্মা যদি অমর হ'ত তাহলে এত অপর্যাপ্ত আত্মা বৈধ ও অবৈধ প্রেমের সিঁড়ি বেয়ে জন্মগ্রহণের জন্মে এত ভিড় জমাত না। যদি ভগবান নিত্য নূতন আত্মা তৈরী করতে পারেন তাহলে পুরাতন আত্মাকে আত্মার উপাদানে মিশিয়ে দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব নয়। মানুষের দেহটা একটা যন্ত্র বিশেষ। ঘড়ির দম বন্ধ হয়ে যায়, আঘাত লেগে স্প্রিং কাটে, ব্যালেন্স ভাঙে, আরও কত কারণে ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু স্প্রিংকে যখন আবার যথানিয়মে চালিয়ে দেওয়া যায় ঘড়ি আবার চলে। ঠিক

একভাবেই চলে। আগের ঘড়ির থেকে ভিতরে বাইরে কোন পার্থক্য থাকে না। মানুষেরও তাই।

ঘড়ির মত টুক্‌টুক্ করে হৃদ্‌যন্ত্রটা চলছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্ত যন্ত্রপাতিও চলছে। মানুষের জীবনযাত্রাও চলছে। যেদিন হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয় মানুষের জীবনও শেষ হয়ে যায়। যদি ঘড়ির বিশেষজ্ঞের মতো হৃদ্‌যন্ত্রের বিশেষজ্ঞ জন্মে তাহলে সেও আবার যন্ত্রটাকে ঘড়ির মতো চালিয়ে দিতে পারবে। তখন দেখবে সেই মৃতপূর্ব ও মৃতোত্তর মানুষের আচার ব্যবহার, রূপ গঠন, ভিতর ও বার সবই এক—অভিন্ন। আত্মা যে একটা শক্তি বিশেষ, বিশ্বের সমগ্র শক্তিরই অভিন্ন অংশ তা সেদিনই প্রমাণ হয়ে যাবে। ভূত দেখা, আত্মার উপলব্ধি, অন্ধ বিশ্বাস আর হেলিসিনেসন ছাড়া কিছুই নয়। স্বপ্ন মনেরই ছবি। নিদ্রিত মনের উপর নার্ভ, ইচ্ছা ও বিবেক কারোই কর্তৃত্ব থাকে না। মনের মধ্যে অনেক চিন্তা অনেক ইচ্ছা সুপ্ত থাকে ধারণারই বাইরে। সেই ধারণা ও ধারণাতীত জীবনই প্রতিফলিত হয় স্বপ্নে। তাই মনে হয়—Dream is not only reflection and focus of life and livelihood—career and character—it is vision, to premonition and fascination of an unconscious mind.

এমনি নানান চিন্তায় মাথা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল বাউলের। যতই ঝেড়ে ফেলতে চায় চিন্তাকে ততই কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে ধুঁইয়ে উঠছে মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কে চায় স্বপ্ন দেখতে? সুনিদ্রার আশায় মানুষ শোয়, কিন্তু কতক্ষণই বা মানুষের সুনিদ্রা হয়। তার ত হয়ই না। নানা অদ্ভুত স্বপ্নজাল তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অনেকে বলেন চিন্তা বা স্বপ্ন দুর্বল মস্তিষ্কের লক্ষণ। ভাবপ্রবণতাও স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ। কিন্তু কাব্য দর্শন বিজ্ঞান সবই ত ভাবপ্রবণ আর কল্পনাপ্রবণ মনেরই সৃষ্টি। যদি দুর্বল মস্তিষ্ক না থাকতো তাহলে কাব্য দর্শন বিজ্ঞান সব কিছুই পিছিয়ে থাকতো। কিন্তু এগিয়েই বা কি লাভ হয়েছে? হাসি পায় বাউলের। যখন বিজ্ঞান দর্শন ছিল না তখনও মানুষ ছিল, ঔষধ যখন ছিল না তখনও মানুষ সুস্থ থাকতো। যখন কাব্য সৃষ্টি হয় নি মন তখন আপনিই আনন্দ পেত। দর্শন যখন ছিল না তখন বিশ্বাসই ছিল চরম সত্য পরম শান্তি। In youth which seems to be principal traits of happiness were altogether neglected in child-

hood and again in old age will be belittled—scorned... চিন্তা করতে করতে মাথা উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাউলের। না, এমন করে চিন্তা করলে হয়তো পাগলই হয়ে যেতে হবে। আর সে চিন্তা করবে না। তাই সে তার একতারাটা বের করে গান ধরল—

গান গাইতে গাইতে বাউলের চোখ বুজে এল। মুদ্রিত নয়নে পরম উপলব্ধির সঙ্গে গেয়ে চলল। একতারা বাজতে লাগল ঝম্ ঝম্ করে। যখন চোখ মেলে তাকাল দেখল তাপসী নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে।

বাউল হেসে বলল—তুমি—তুমি লুকিয়ে গান শুনছিলে!

তাপসী আস্তে আস্তে বলল—হ্যাঁ। কিন্তু লুকিয়ে নয়। বড় চমৎকার গাইলেন ত। অনেক গানই শুনেছি, কিন্তু এমন গান গাওয়া শুনিনি কোনদিন।

বাউল ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলল—আমিও কোনদিন এমন তৃপ্তি পাইনি। এ যেন আমার অন্তরে বসে কেউ গেয়েছে। তাপসী!

—বলুন।

—আর কতকাল আমাকে আটকে রাখবে?

—আটকে? যদি পারতাম চিরজীবনই আটকে রাখতাম; কিন্তু আপনাকে চিরদিন আটকাবার ক্ষমতা হয়তো আমার হবে না।

তাপসীর বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠল বাউলের কাছে। বাউল ম্লান হেসে বলল—জোর করে আটকা পড়ার ইচ্ছা আমারও নেই; কিন্তু তোমারই বা একান্ত নিভৃতে আপনাআপনি অনাঘ্রাত অবস্থায় ঝরে পড়বার এমন কি আবশ্যক হ'ল?

—সে আপনি বুঝবেন না। তবে কেন জানিনা আপনাকে সত্যই আমি ভালবাসি, যেটা স্বামীর প্রতিই হয়তো মেয়েদের জন্মায়।

একথা বলবার পর আর তাপসী দাঁড়াল না।

তারপর কয়েকদিন ধরেই তাপসীর সঙ্গে কথা বলবার মতো সুযোগ হয়ে ওঠেনি। একদিন সন্ধ্যার সময় তাপসীকে একাকী পেয়ে বাউল প্রশ্ন করল—তোমার সঙ্গ যে ক্রমেই দুর্লভ হয়ে পড়ছে তাপসী?

তাপসী গলায় কাপড় দিয়ে তুলসীর মূলে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে নমস্কার জানাল। তারপর হাসিমুখে বলল—হ্যাঁ।

বাউল কষ্ট করে মুখে সামান্ত হাসি ফুটিয়ে বলল—তোমার সঙ্গ ক্রমে দুর্লভতর হয়ে উঠবে না তো ?

তাপসী হাসি মুখে বলল—আমার সঙ্গ আপনার কাছে এত মূল্যবান ?

—অমূল্য !

তাপসী হেসে বলল—তাইত এত দুর্লভ।

এই বলে তাপসী প্রদীপ হাতে নিয়ে বাড়ির ভিতর চলে গেল। বাউল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল তাপসীর কথার ইংগিত, তাপসীর মন। কেমন যেন হেঁয়ালী—কেমন যেন পুঞ্জিভূত ঝড়ের সংকেত ওর মনে। যেন বাউলের হাত থেকেও মুক্তি চায়। চিন্তা করতে করতেই সে বাড়ি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাঁশরীদের দরজায় এসে দাঁড়াল। ডাকল—বাঁশরী !

—বাউল ভায়া ! এস, এস। এই তোমার কথাই ভাবছিলাম, কদিন আসনি কেন ? রাইকেও কদিন দেখিনি, ভাল আছে ত ?

এক সঙ্গে অনেক প্রশ্নই করে বসল বাঁশরী।

বাউল হেসে বলল—কোনটার উত্তর দিই, বল। তার থেকে তুমিই বল নিজে যাওনি কেন ?

বাঁশরী চিন্তিত হয়ে উঠল। বলল—তা বটে, ভারি ভুল হয়ে গেছে আমার। কাজ যে আমার অনেক। বলতে বলতে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

—মা একটু চা করে দেবে ?

মা ওঘর থেকে জবাব দিলেন—শ্যামাকে বল।

শ্যামা ছোট মেয়ে। বয়স বার-তের। ফ্রক পরে, গোছা গোছা কাল চুল পিঠে ফেলে এসে দাঁড়াল।—এই মাত্র জল চাপিয়েছি।

—ক' কাপ চাপিয়েছিস ?

—তিন কাপ। আর এক কাপ দেব ?

—তা দিবি নে, দেখছিস না আর একজন এসেছেন।

ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি জানিয়ে শ্যামা বেরিয়ে গেল। বাঁশরী হেসে বলল—বয়সে ছোট হলে কি হবে কাজে ও মস্ত বড়। বাড়ির সব কাজই ও করে। রান্না পর্যন্ত।

বাউল বলল—সে ওর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।

বাঁশরী হাসি মুখে বলল—আমাকে দেখলে কি বোঝা যায় ?

—নিষ্কর্মা। সংসারের কোন কাজই হবে না!

বাঁশরীর মা ঘরে এসে দাঁড়ালেন,—বুঝলে বাবা, যদি সংসারের একটি কাজও ওর দ্বারা হয়!—ঐ ছোট মেয়েটার ঘাড়েই সব। সারা দিন কি যে করে বেড়ায় তা ঐ জানে! বাইরে থাকলে ঘরে যে ফিরবে তার কোন লক্ষণই থাকে না। আর ঘরে থাকলে হয় লেখা, নয় পড়া, না হয় ওষুধ দাতব্য!

বাঁশরী ওর মাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—তুমি বাজে চেঁচাচ্চ কেন মা! বাবা ভাই সবাইত দাদার ওখানে গিয়ে জুটেছে। তুমিও ত পরশু শ্যামাকে নিয়ে যাচ্চ। চিঠিতেও ত দাদাকে তাই লিখেছ। মাত্রত দুদিন আছে, একটু যত্ন কর—অন্ততঃ বাক্যবাণটা বন্ধ কর।

—কেন করবো শুনি? বাঁশরীর মা আবার আরম্ভ করলেন—যে উড়ুনচণ্ডি, হয়তো আমার ঘরের খড়ও রাখবিনি।—যা পারিস করবি—আমার কি?—ঘরের পয়সা দিয়ে ওষুধ কিনে কত লোককেই ত ওষুধ বিলিয়ে বেড়াস; কিন্তু কোন্ লোকটা তোর উপকার করে শুনি?

শ্যামা দু'হাতে দুগ্লাস চা নিয়ে অতি সাবধানে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। গ্লাস দুটো নামিয়ে রেখে মাকে বলল—আবার তুমি বকছো মা? বকে কি কোন ফল হয়েছে? এস চা খাবে এস।

—তুই নিয়ে আয় চাটা এখানেই।

শ্যামা আদেশের সুরে বলল—না, না, তুমি আবার বকবে।

—না, তুই নিয়ে আয়, আর বকবো না।

শ্যামা চা আনতে বেরিয়ে গেল। ওর মা শুধালেন—তুমিত তাপসীর সঙ্গে এসেছ?

বাউল বিনীতভাবে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাঁশরীর মা আবার প্রশ্ন করলেন—তোমার সঙ্গেই ত বিয়ে হবে?

বাউল লজ্জিত হয়ে উঠল। কিছুই বলল না। কারণ সে নিজেই জানে না যে সত্যই তার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে কিনা? বাঁশরী ওর হয়ে বলল—ও কি বিয়ে করবার জন্যেই এসেছে? আর ও কি করে জানবে যে তাপসীর মা বাবা মনে কি এঁটেছেন?

—তুই চুপ কর্ হলা, তোর সবটাতেই মোড়লি। ও বিয়ে করতে আসেনি ত কি করতে এসেছে শুনি?

কিন্তু হলাকে আর এর কৈফিয়ৎ দিতে হ'ল না। তার পূর্বেই শ্যামা এসে দাঁড়াল—আবার তুমি বকছ মা ?

—নে তুই বকিসনে শ্যামা—দে চা দে।

—না, এখানে দেব না তাহলে আবার ঝগড়া করবে।

ওর মা উঠে যেতেই বাঁশরী বলল—কিছু মনে কর না। মা ঐরকমই।

—মনে করবার কিছু নেই, তিনি স্পষ্ট করে শুধালেন। তা অন্য কেউ না বললেও প্রত্যেকের মনেই তাই জিজ্ঞাসা। আমার মনেও সেই জিজ্ঞাসা।

বাঁশরী হেসে বলল—তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়াই ত উচিত ছিল, কারণ মনের সঙ্গে তোমাদের যতটা সাদৃশ্য আর কারও সঙ্গে সে মিলটা হবে না।

বাউল কিছুই বলল না। নিরবে একবার তাকাল রুমটার চারিদিকে। তারপর হেসে বলল—চারিদিকে যে বইয়ের ছড়াছড়ি! দু একখানা দেবে পড়তে মাঝে মাঝে।

বাঁশরী এক ফোঁটা মিষ্টি হাসির সঙ্গে বলল—কি বই আর আছে আমার যে তোমাকে পড়তে দেব? তোমার মত জ্ঞানীর খোরাক যোগাবার মত ঐশ্বর্য আমার নেই। যা দেখছো ওর অধিকাংশই হচ্চে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বই আর রামায়ণ মহাভারত। তার সঙ্গে খান-কয়েক উপনিষদ। এই আমার বইএর পুঁজি—এই আমার জ্ঞানের পুঁজি।

বাউল অপ্রসন্নভাবে বলল—তুমি নিজেকে এত ছোট ভাবছো কেন? তাহলে আপনিই ছোট হয়ে পড়বে।

বাঁশরী হেসে বলল—ঐখানেই তুমি ভুল বুঝছো। দম্ভ করার মত কিছুই আমার নেই আর ছোটও নিজেকে ভাবিনি। শুধু সত্যটুকু প্রকাশ করি মাত্র। ভাবি, জ্ঞান বুদ্ধি অনেকখানি পিছিয়ে আছে। আমার থিওরীর মধ্যে যদি বিরোধী ভাব না থাকে তবুও আমার ব্যক্তিগত সত্যটুকু বড় নয়। আমার বিশ্বাস, আমার ধারণা অপরের কাছে জ্ঞানের মর্যাদা পেতে পারে কিন্তু নিজের কাছে এর যথেষ্ট যাচাই-এর প্রয়োজন আছে।

বাউলের আর তর্ক বাড়াবার ইচ্ছা ছিল না। সে অন্য প্রশ্ন করল —তুমি বুঝি হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস কর?

—চেষ্টা করি ফলও পাই—বিশ্বাসও জন্মে। হয়ত জ্ঞান বলে আমার অভিজ্ঞতার মূল্য অনেকের কাছে নির্ণিত হতে পারে।

বক্তব্য শেষ হবার আগেই শ্যামা এসে দাঁড়াল।

—দাদা ওষুধ নিতে এসেছে—

—কে রে ?

—আজ্ঞে আমি। একটি লোক ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

—কার কি হয়েছে ?

—আজ্ঞে আমার স্ত্রীর হঠাৎ ভেদ বমি ?

—ভেদ বমি ?

—আজ্ঞে।

—আগে পেটের অসুখ-টসুখ হয়েছিল ?

—আজ্ঞে না।

—তবে কি হঠাৎ—

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হঠাৎ সেকি ?

—আচমকা ভেদবমি হয়ে গেলেন কিনা।

বাঁশরী উদ্বিগ্নভাবে আবার শুধাল—ছটফটানি তিষ্টা এসব কিছু আছে ?

লোকটি মাথা নেড়ে বলল—আজ্ঞে না। সে সব কিছু নাই কেবল বলছে আর বাঁচব না।

বাঁশরী জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে—শিশি এনেছিস।

লোকটি ময়লা কাপড়ের খুঁট থেকে একটি শিশি বের করে রাখল।

বাঁশরী শিশির গন্ধ পরীক্ষা করে শুধাল—কিসের শিশিরে ?

—তেলের।

—বলেছি না গন্ধআলা শিশি আনিস না—শ্যামা একটা ওষুধের খালি শিশিতে Aconite IX তিন দাগ দিয়ে দে ত। লোকটিকে বলল—আধঘণ্টা অন্তর খাওয়াবি, বুঝলি ?

শ্যামা ঔষধ তৈরী করে দিতেই বাঁশরী তাড়া দিল—যা চট করে খাইয়ে দে গা।

লোকটি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল—আপনি একবার যাবেন না বাবু ?

বাঁশরী চুপে চুপে বলল—তুই যা, আমি আধঘণ্টার মধ্যেই যাচ্ছি।

লোকটি চলে যেতেই ওর মা ঘরের ভিতর এলেন—কই তুই যা দেখনি! সংসারের কোন কাজে ত নেই, ওষুধ না হয় অমনি দিলি—আবার ঐ—ঐসব রোগের কাছকে যাওয়া। তুই গেলে মাথা খুড়ে মরব বলে রাখছি।

বাউল ভয়ে ভয়ে বলল—নাই বা গেলে। ওষুধ ত দিলে। গিয়ে আর কি করবে মিছিমিছি।

বাঁশরীর মা সন্তুষ্ট হয়ে বলে উঠলেন—বলত বাছা, ওষুধত দিলি—আবার যেতে হবে কেন?

বাঁশরী ব্যস্তভাবে বলল—না-না, আর যাব না, যাও।

বাউল এই উত্তপ্ত পরিবেশে আড়ষ্ট হয়ে উঠছিল। এবার যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল—তাহলে আমি এখন আসি?

বাঁশরীও বাতি হাতে উঠে দাঁড়াল—চল, বড় অন্ধকার পৌঁছে দিয়ে আসিগে।

ওর মা অবিশ্বাসের সুরে বলে উঠলেন—ঐ ফাঁকে ওদের ঘর যাবিত!

বাঁশরী হেসে বলল—তোমার এখনও ঐ স্বপ্ন? দেখনা পৌঁছে দিয়েই আসছি। এই যাব কি আসব।—আর কোন অনুমতির অপেক্ষা না করেই বাঁশরী বাউলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। খানিকটা এসে একটা গলির সামনে দাঁড়িয়ে বলল—কি, আর যেতে হবে, না পারবে?

—তুমি কি এখান থেকে বাড়ি ফিরবে?

বাঁশরী ম্লান হাসি হেসে বলল—না। এই গলি দিয়ে ওদের ঘরে একটু খবর নিয়েই এক দৌড়ে বাড়ি। তারপর লক্ষী ছেলের মত খেয়েদেয়ে ঘুম। মা জানতেও পারবেন না।

বাউল একটু দাঁড়িয়ে কি ভাবল, তারপর বলল—চল, আমিও যাই তোমার সঙ্গে।

—তাই চল।

লোকটি দরজায় দাঁড়িয়ে বাঁশরীরই অপেক্ষা করছিল। বাঁশরী লোকটিকে দূর থেকে দেখেই শুধাল—কিরে, কেমন আছে এখন?

লোকটি হেসে বলল—আপনার ওষুধ আবার বলতে, আপনার ওষুধে কথা শুনে। দুদাগ খেতেই ধরে গেছে।—একবার মাত্র হয়েছিল এতক্ষণে।

বাঁশরী নাড়ী দেখে শুধাল—ওষুধটা আর ক'দাগ আছে? সেটা খাইয়ে দাও।

লোকটি শুয়ে ভয়ে, শুধাল—কেমন দেখছেন দাদাবাবু?

বাঁশরী হেসে বলল—ভয় নেই, ঠিক ওষুধই পড়েছে। নাড়ী দ্রুত, আর একদাগ পড়লেই ঘুমিয়ে পড়বে।—কাল সকালে সম্পূর্ণ সুস্থ।

বাউল যখন এখান থেকে বাড়ি ফিরল তাপসী তখন বাতি হাতে নিয়ে ওকে খুঁজতে বেরুচ্ছিল। বলল—আচ্ছা লোক বটে, ভাবলাম হারিয়ে গেলেন বুঝি।

বাউল হেসে বলল—হাঁ, হারিয়েই যাচ্চি।—এবার আঁচলে গেরো না দিয়ে দিলে দেখবে সত্যই হারিয়ে গেছি।

তাপসীর মা বাউলের সাড়া পেয়ে শুধাল—কিরে, এসেছে?

—হাঁ এসেছে, তুমি খেতে দিয়ে যাও, আমি শুতে যাচ্চি। এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই তাপসী চলে গেল। ওর মা খাবার জায়গা করে বলল—বস বাবা।

বাউল নিঃশব্দে খেয়ে চলল। ওর মা শুধাল—কোথায় গেছলে, বাঁশরীদের বাড়ি?

বাউল খেতে খেতে উত্তর দিল—হাঁ।

—তোমার কি খারাপ লাগছে বাবা এখানে? বড্ড একা একা। তাপসীকে সঙ্গে বেড়াতে যেতে বলি, কিন্তু ও আমার একরকমের মেয়ে। তোমাকে খুব ভালবাসে অথচ বিয়েও করবে না বলছে। আজ সেই নিয়েই ওকে কত বকলাম।

বাউল শান্ত কণ্ঠে বলল—ভাল করেননি মিছিমিছি বকে।

—কেন বাবা, মেয়েমানুষ কি আইবুড়ো থাকবে!

বাউল ম্লান হেসে বলল—তা বলেত আর জোর করে বিয়ে দিতে পারবেন না, বা উচিতও নয়। আমি ওকে যতটুকু চিনেছি ও বিয়ের বন্ধন থেকে এড়িয়ে থাকতে চায়।

তাপসীর মা ব্যস্ত হয়ে বললেন—না বাবা, তুমি ওর হাল ছেড়ে দিও না। যদি ও ভুল পথেই চলে তা বলে কি ওকে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনা যায় না?

বাউল গাঢ় স্বরে বলল—সে পথ ভাল কি মন্দ সে আমি জানি

না, তবে সে পথ থেকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বও আমার নয় বোধ হয়।

—সে দায়িত্ব তোমারই বাবা। তাপসীর বাবা থেলো হুঁকো হাতে এসে দাঁড়ালেন—আমি ওর বাবা। হুঁকোতে আগুন রইছে, আমি তাই ছুঁয়ে শপথ করছি আমি ওকে তোমার হাতে সম্প্রদান করলাম। এরপর তোমার ইচ্ছা হয় গ্রহণ করবে, ইচ্ছা না হয় গ্রহণ করবে না। আমি আর এ অধিকার ফিরিয়ে নেব না।

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই সেখান থেকে উঠে গেলেন। কিছুক্ষণ এদের মধ্যেও কথা হ'ল না, তারপর তাপসীর মা বললেন—শুনলেত বাবা।

বাউল মনে মনে বলল—সবাই পাগল। মুখে বলল—ওত আর অচেতন পদার্থ নয় যে ইচ্ছা করলেই গ্রহণ করা যায়, আর ইচ্ছা করলেই দান করা যায়। তবে উঁনি যেমন ওঁর অধিকার দান করছেন আমিও তেমনি নিজের আগ্রহে তা গ্রহণ করছি। এই অধিকারের আদান প্রদানের বাস্তব রূপায়ণের অপেক্ষাও করব, তবে—

তাপসীর মা ওর অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানে বলে উঠলেন—তবে নয় বাবা, ও যদি আমাদের আদেশ না মানে তাহলেও আমাদের চোখে তুমি ওর স্বামী। যদি প্রয়োজন হয় ওকে স্বামীর অধিকার নিয়েই দেখো। আমরা চলে যাবার পরে—

[৯]

এমনি করে কয়েকটি মাসই অতীত হ'ল। বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত চলে গেল। শীত এসে পড়ল। গাছের পাতা শুকিয়ে শুকিয়ে খসে পড়ল পৃথিবীর বুকে। গম আর ছোলার চারায় সবুজ হয়ে উঠল সোনাপুরের ক্ষেত। নব বসন্তের আনন্দ জেগে উঠল মাঠে ঘাটে। পাখির গলায় জাগল আনন্দের ঢেউ। কোন বিরাট পরিবর্তন নেই। বিবাহের প্রস্তাব তাপসী আজও এড়িয়ে চলে আগের মত একই ভাবে।

সেদিন ওর মা জেদ ধরলেন—তোকে বিয়ে করতেই হবে। কেন করবিনে তাই বল?

তাপসী হেসে বলল—কেন বিয়ে করব আগে তুমি তাই বল।

মা রেগে বললেন—মিছে তর্ক করিসনে তাপসী। সংসার কর্তে হবে, ছেলে মেয়ে চাই।

—সংসারে রইচিই ত মা, আমি কি সংসার ছেড়ে বৈরাগী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্চি? আর ছেলে মেয়ে বলছো—মেয়ে নিয়ে তোমরাই বা কি সুখ পাচ্ছ বল!—কেবল ভয় আতঙ্ক আর হতাশা।

মা বললেন—সংসারে সত্যিই সুখ নেই, তবুও ত মানুষ সংসার করে।

তাপসী হেসে বলল—কিন্তু সংসার কাকে নিয়ে করব—ঐ বৈরাগীকে নিয়ে?

—কেন, সংসার যাকে নিয়ে খুসি করতে পারিস। ওকে নিয়েই যে করতে হবে এমনত কথা নেই। সুধীরই কি মন্দ ছেলে? আর তা ছাড়া কি ভাল ছেলে দেশে নেই?

তাপসী মিনতিভরা চোখে ওর মায়ের দিকে তাকাল—মা! তোমরা জোর করে আমার বিয়ে দিও না মা। যাকে নিয়ে আমি সুখী হব এমন ছেলের খোঁজ যখন তোমরা করছ, তেমনি আমি খোঁজ করছি এমন একজনের যাকে নিয়ে সত্যই আমি ঘর করতে পারি।

মা একথার উপর আর কোন যুক্তি খুঁজে পান না।

বাউলও পথ খুঁজে পায় না। তার কানেও এসব আলোচনা পৌছে। মায়ের অনুরোধ, মেয়ের অনুযোগ, সবই কানে যায়। কিন্তু তাপসীর সত্যকারের ইতিহাসের কোন হদিস পায় না। বাউল ভাবে মনস্তাত্ত্বিক হলে কাজ হ'ত। তাহলে হয়তো ওর মনের খানিকটা হিসাব মিলত।

বাঁশরীর সঙ্গে এসম্বন্ধে আলোচনা হয়।

বাউল শুধায়—আচ্ছা বাঁশরী, তাপসী কি সত্যই ভালবাসে আমাকে?

—তোমার কি সন্দেহ হয়?

বাউল চিন্তিতভাবে বলল—ওকেই চিনলাম না ত ওর ভালবাসা মন্দবাসা চিনব কেমন করে?

—খুব সহজ। বাঁশরী এমন করে কথাটা বলল যে বাউল বিস্মিত হয়ে তাকায় ওর দিকে।

—খুব সহজ ?

—হাঁ খুব সহজই। যে প্রকৃত ভালবাসে সে প্রকৃত ভালবাসা চিনতেও পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যতটা স্পষ্ট ধরা পড়ে এমন ধরা আর কিছুতেই যায় না।

—তুমি কি কাউকে প্রকৃত ভালবাস ?

—হাঁ বাসি, নিজেকে—তাই কোন কারণেই নিজের উপর রাগ হয় না।

বাউল হাসল—নিজেকে কে ভালবাসে না ?

প্রতিবাদের সুরে বাঁশরী বলে উঠল—অধিকাংশ লোকই। ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্যে অধিকাংশ লোকই নিজের সর্বনাশ করে। অনেকেই দাস রূপে আত্মহত্যা করে, নিজের দোষ লক্ষ্য না করে নিজেকে নিচের তলায় ঠেলে নামিয়ে দেয়।

—থাক ওসব কথা। তুমি কোন মেয়েকে ভালবেসেছ—as a lover।

বাঁশরী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল—আজ এ প্রশ্নের উত্তর থাক।

এই বলে বাঁশরী সেখান থেকে উঠে গেল।

এমনি সময় একদিন হঠাৎ সুধীর সোনাপুরে এল। রৌদ্রক্লান্ত প্রকৃতিতে ছাতা মাথায় দিয়ে দুই পা লাল ধূলায় রাঙা করে শ্রান্ত দেহে ঠিক ভর দুপুর বেলায় এসে দাঁড়াল।

তাপসী ওকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল—ওমা, সুধীরদা যে—এই রৌদ্রে ষ্টেশন থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছ ?

—কই আর-রথ পাঠিয়েছ যে হেঁটে আসব না ?

—রথ আর কেমন করে পাঠাব বল, তুমিত আর খবর দিয়ে আসছ না !

সুধীর হেসে বলল—হঠাৎ আসার কেমন আনন্দ বল। যেমন হ'ল তোমার আনন্দ তেমনি আমার।

—আর আমার কি নিরানন্দ হ'ল বলতে চাও ? সুধীরের গলার সাড়া পেয়ে বাউল বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল—এই আসছ বুঝি ?

—সে নমুনা ত পায়েই রইছে ভাই। আর তুমি নিরানন্দ হলে কিনা জানি না, তবে আনন্দ তোমার হবার কথা নয়।

তাপসীর মা সুধীর এসেছে শুনতে পেয়েছিলেন আগেই ; কিন্তু হাতে

অসম্পূর্ণ কাজ থাকায় সম্বর্দ্ধনা জানাতে বিলম্ব হ'ল। এবার বাইরে এসে চেঁচিয়ে উঠলেন—তাপসী, তুই আচ্ছা মেয়ে ত। সুধীর এক পা ধুলো নিয়ে এতটা হেঁটে আসছে তাকে পা ধুতে জল দিবি, বসতে আসন দিবি, তা না তাকে খামকা দাঁড় করিয়ে রেখেছিস! কবে আর তোর আক্কেল হবে, মা।

তাপসী সুধীরের আসা যতটা আকস্মিক ভাবল, বাউল যতটা আশ্চর্য মনে করল, এর কোনটাই ততটা পরিমাণে সুধীরের আসার মধ্যে ছিল না। যদিও সুধীর আকস্মিক ভাবে এসে পড়ল কোনরূপ খবর না দিয়েই, কিন্তু সে হঠাৎ বিনা আহ্বানে, বিনা উদ্দেশ্যে এখানে এসে পড়েনি। আর যদিও তাপসীর প্রতি ওর মোহ অকিঞ্চিৎকর নয় তবুও তাকে সংযত করার মত শক্তির অভাব ছিল না। তবুও সুধীর এল। সে কেবল তাপসীর মায়েরই আমন্ত্রণে। কিছুদিন আগে ওর মা একটা পত্র দিয়েছিলেন তাতে তিনি কোন কথাই বাদ দেননি। তাপসী যে বাউলকে চায় না তাও স্পষ্ট করেই লেখা ছিল। আর ওকে জানিয়েছিলেন এখানে আসবার নিমন্ত্রণ। কিন্তু সে সময় পরীক্ষা থাকায় সত্বর আসা হয়নি।

বসন্ত বিদায় নিল। প্রকৃতির বুকে চৈতালী ঘূর্ণি জানিয়ে গেল কালবৈশাখীর নিমন্ত্রণ। কাঠফাঠা রৌদ্রে ঘুঘু পাখির একটানা ডাক ঘুঘুচুচু। সুধীরের কাছ থেকে যে সমস্যা সরে গেছল সেই সমস্যার মাঝে আবার নিজেকে জড়িয়ে ফেলবার ইচ্ছা তার ছিল না। তাপসীকে বাউলের ঘাড়ে চাপিয়ে ভেবেছিল এবার মুক্তি পেল—ভূতের বোঝা দানোর ঘাড়ে গেল। কিন্তু তাপসীর মায়ের পত্রে জানল দানোর ঘাড়ে ভূত থাকতে রাজি নয়। সুধীর ভেবেছিল সেও আর এর মধ্যে মাথা গলাবে না, তার মাও তাকে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তাপসীর প্রতি আকর্ষণই ওকে টেনে আনল এখানে। কিন্তু একি? একটা যুগ যেন পেরিয়ে গেছে। এরই মধ্যে একটা যুগান্তর ঘটে গেছে এখানে। সে মনকেও যেন খুঁজে পাচ্ছে না, হারিয়ে গেছে কোথাও। স্থবির মন রাজত্ব করতে চায় ওর মধ্যে। তাপসীও যেন বদলে গেছে। সে আর কথায় কথায় হাসে না। সে এখন কথায় গুরুত্ব দেয়, ওজন করে কথা বলে। বাউল সবই হারিয়েছে—সর্বহারা বাউল। দীন নয়নে

তাপসীর দিকে তাকিয়ে আছে, তাকিয়ে আছে পরিবর্তনের দিকে। তবুও পরিবর্তন ঘটছে—old older changeth yielding place to new—পুরাতন চলে যায়, নূতন আসে।

সুধীরের যৌবন খতম হয়ে গেছে। গজভুক্ত কপিথের মত অন্তঃসার শূন্য যৌবন দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের মোহে নারীমুগ্ধ হয় প্রেমে পড়ে কিন্তু ভিতরে ক্লান্তি—পরম ক্লান্তি। সে ক্লান্তি আরও বেড়ে গেছে এখানে এসে। নিরাপত্তা বন্দীর জীবন যেন। খাও দাও আর ঘুমাও। কোন আনন্দ নেই, কোন বৈচিত্র্য নেই। ভাল লাগে না একটুও। ফেরবার তাগিদ হয় মনে। সুধীর তাপসীর মাকে একদিন আড়ালে শুধাল, আমার থাকার কি প্রয়োজন আছে?

সর্বজয়া বললেন—প্রয়োজন আছে জেনেই ত ডেকেছি, বাবা। বাউলকে বিয়ে করবে না জেনেই তোমাকে ডেকে পাঠাই। তোমার অভাবে হয়তো সেটা ও বুঝবে। তাছাড়া দুজনকে একসঙ্গে পেয়ে যাচাই করেই নিতে পারবে ও, কাকে বেশি ভালবাসে, কাকে ও গ্রহণ করতে পারবে।

সুধীর শান্তভাবে জবাব দিল—কিন্তু সে-পরীক্ষা ওর আগেই হয়ে গেছল মাসীমা। ও আমাদের দুজনের মধ্যে বাউলকে গ্রহণ করেছিল।

সবজয়া চিন্তিতভাবে বললেন—পরীক্ষার তখনও সময় আসেনি, বাবা। যেটাকে তুমি পরীক্ষা বলে মনে করছ আমি সেটাকে পরীক্ষা বলে মেনে নিতে পারি না। তখন বাউল ছিল নবাগত—নূতন। তুমি পুরাতন। তাই ওর কাছে রহস্যময় ছিল বাউলই। সেই রহস্যেই ওর মন আকৃষ্ট হয়েছিল। পরেও ওকে ও ভালবাসবে মনে করে ভুল করেছিল।

সুধীর বলে উঠল—হয়তো আপনার কথাই ঠিক হ'ত, যদি আমার আগমনে ওর মধ্যে সেই প্রাণখোলা কথাবার্তা মেলামেশা আজও দেখতে পেতাম। মনে হচ্চে সে তাপসী এ নয়।

তাপসী হাসি মুখে এদের আলোচনায় এসে দাঁড়াল—সে তাপসী কে নয়?

—তুই। সর্বজয়ার কথার মধ্যে রাগ ছিটকে পড়ল—তোর একি ব্যবহার তাপসী? কোথায় সুধীরকে নিয়ে দুদিন আনন্দ করবি তা না—

—থাক মা। তাপসীর কথা কিছুটা তপ্ত হয়ে উঠল—তুমি কি জন্যে

সুধীরদাকে ডেকে এনেছ তা এমন করে খুলে বলবার দরকার ছিল না। নারী-পুরুষ বাজারের পণ্য বস্তু নয় আর গরু ঘোড়াও নয় যে দুদিন ব্যবহার করে যাচাই করে নেবো। আর দুদিনের পরিচয়েই পরিচয়ের শেষ যাচাই হয় না। কদিনের জানাতেই চিরদিনের অজানাকে জানা যায় না। আমি জানতেও চাইনে—চিনতেও চাইনে। যে আমার সত্যি-কারের স্বামী, সে যেদিন আসবে তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না কোনদিনই। পাকা ফল আপনিই পড়ে—তার মিষ্টিও আছে। এই বলে তাপসী নিজের কাজে চলে গেল।

সর্বজয়া বিষণ্ণভাবে বললেন—দেখলে ত বাবা!

সুধীর চিন্তিতভাবে বলল—বাউলের সঙ্গে কোন মনোমালিন্য হয়নিত?

সর্বজয়া বাউলের নাম শুনে রেগে উঠলেন, বললেন—ওর কথা আর বলছ কেন বাবা—ওটা একটা মনুষ্যই নয়। পুরুষ হয়ে একটা মেয়েকে ভুলাতে পারলে না?

তাপসীর বাবা তামাক টানতে টানতে এদের কাছে এসে দাঁড়ালেন—Here you are—তোমার কথার দাম আছে। ঠিক বলেছ, একটা পুরুষ একটা মেয়েকে ভোলাতে পারলে না? বুঝলে বাবা সুধীর, এই আমি দশটা মেয়েকে এমন বশ করেছিলাম যে দশ জনেই বায়না ধরে-ছিল আমাকে বিয়ে করবে। সে এক ইতিহাস। শোন তাহলে—

সর্বজয়া ধমকে তাঁকে থামিয়ে দিলেন—কি বাজে বকছ পাগলের মতো। যত বুড়োচ্চ তত যেন ছেলেমানুষী বাড়ছে—বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে। সুধীর ছেলের মতো—তবু যদি তোমার জ্ঞান থাকে একটুকু!

তাপসী আড়ালে বসে কার্পেটের আসন বুনছিল। কথাটা কানে যেতেই নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না। বলল—তুমিইত নিজেকে আগে ছেলে-মানুষ করেছ মা, তাইত বাবা আর বুড়ো থাকতে পারলেন না। ছিঃ, তোমার লজ্জা করছে না মা, মেয়ের সম্বন্ধে ওরকম ধরণের আলোচনা করতে? লেখাপড়া শিখেও তোমার ওরকম প্রবৃত্তি হচ্চে? তুমিত আমার বান্ধবী নও, তুমি আমার মা—এইটাই সব সময় মনে রাখবে। তাহলে বাবারও আর ভুল হবে না।

তাপসীর বাবা সর্বজয়ার নিকট তিরস্কৃত হয়ে নিরবে ধূমপানে মন দিয়েছিলেন, কিন্তু তাপসীর কথা শেষ হতে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন—ঠিক কথা বলেছিস তাপসী।

সর্বজয়া এবার রেগে উঠলেন।

—ঠিক বলেছে তোমার মেয়ে আর তুমি, আর বেঠিক বলেছি আমরাই! আচ্ছা, তোমরা তোমাদের অনাসৃষ্টি বুদ্ধি নিয়েই থাক, আমি না হয় কোথাও পালিয়ে যাই এখান থেকে।

—তুমি কি সৃষ্টির বুদ্ধি নিয়ে পালাবে? তাপসীর বাবা কথাটা বলে ফেলেই সেখান থেকে পালালেন।

সর্বজয়া পালাব বললেও সত্যই আর পালান হ'ল না। সুধীরেরও যাওয়া হ'ল না এত তাড়াতাড়ি, সর্বজয়ার অনুরোধেই তাপসীর মানসিক চিকিৎসার জন্যে আরও কয়েকদিন মেয়াদ বৃদ্ধি করে ফেলল। কোন ফল না হলেও পদে পদে সংশোধনী ধারা প্রয়োগ করতে ত্রুটি করল না সুধীর।

সেদিন সকালবেলায় তাপসী গরদের লাল পেড়ে শাড়ি পরে দেবতার পূজায় ফুলগুলি নিঃশেষ করে খালি সাজি হাতে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতেই সুধীর বলল—এই তোমার পূজার বয়স?

তাপসী হাসিমুখে বলল—পূজার আবার বয়স আছে নাকি?

—তা নেই? আমাদের হিন্দু ধর্মে চারটে আশ্রমই রয়েছে। বাল্যে অধ্যয়ন, যৌবনে সংসার, প্রৌঢ়ে ধর্মকর্ম, আর বার্দ্ধক্যে তপজপ।

তাপসী বিদ্রূপ করে বলল—তুমি কোন মুনির আশ্রম থেকে আসছ?

—কেন?

—কেন? আমাদের এযুগে কেইবা আশ্রম মানছে বল? তাছাড়া ভগবানকে ডাকব তার আবার কালাকাল কি? মায়ের ত বয়স হয়েছে কিন্তু ধর্মে তাঁর মন বসেনি। আবার আমার কেমন যেন ভাল লাগে।

সুধীর বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করল—ভাল লাগে?

—লাগে বৈকী? না হলে কি আমি জোর করে মন্দিরে যাচ্চি? কি গরজ আমার, কি ভবিতব্য, কি উদ্দেশ্য?

সুধীর হেসে বলল—বিয়েকে ঠেকিয়ে রাখা।

তাপসী বিরক্ত হয়ে বলল—দেখ, নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে। বিয়ে? কিন্তু কি এর সার্থকতা বলতে পার? হয়তো ছোট প্রানিকর কথাগুলো শুদ্ধ দার্শনিক ভাষায় বলবে সৃষ্টি রক্ষা, গৃহধর্ম্ম, আত্মার প্রশস্তি, না হয় আর কিছু! যতই শুদ্ধ ভাষায় বল মূল তার এক। বিবাহে ত্যাগ আসে না ভোগেরই প্রবৃত্তি দেয়। তোমরা সেই আদিম পশু প্রবৃত্তিরই গুণ গাইছ। কিন্তু কেন বলতে পার?

—পারি। সুধীর তাপসীর কথাকে গ্রাহ্যই করল না। বলল—দেখ, আমরা তোমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, আমরা যা ভাল বুঝেছি সেই ভালটুকুই আমরা আমাদের ছোটদের জন্যে করতে চাই। তাই এত আগ্রহ।

—কিন্তু তারও একটা নিজস্ব বিবেক আছে। ভালমন্দ বুঝবার স্বাধীনতা আছে।

—আছে সত্যই, কিন্তু যদি কোন জলমগ্ন ব্যক্তি পরলোকে স্বর্গসুখ ভোগের বিবেক বুদ্ধিতে জল থেকে উঠতে না চায় তাহলে কোন প্রত্যক্ষদর্শী বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি তার বিবেক বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য করে জল থেকে তুলবে না বলতে চাও ?

তাপসী হেসে বলল—তোমার উত্তর আমার প্রশ্নের বহুদূরে।

সুধীর হেসে বলল—কিন্তু কাল থেকে তোমার ধর্মের দরজায় তালা ঝুলবে ?

পরদিন পুজা করতে গিয়ে তাপসী দেখল সত্যই তালা ঝুলছে মন্দিরে। তাপসী হাসবে না কাঁদবে, দণ্ড দিয়ে তালা ভেঙ্গে ফেলবে, না পুজা করাই ছেড়ে দেবে, তা ভেবে পেল না। স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে সে সেই কথাই ভাবছিল। হঠাৎ একটা মিষ্টি ডাক কানে এল—তাপসী! তাপসী মাথা তুলে তাকাল, দেখল বাউল বাড়ি থেকে বেরবার পথে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো কিছু দরকার আছে।

তাপসী ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল—আপনি এখনও আছেন এখানে ?

বাউল ও কথার কোন উত্তর দিল না। একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকাল।

তাপসী আবার শুধাল—কি বলছিলেন আমাকে ?

বাউল অসংলগ্ন ভাবে বলে ফেলল—তুমি বড় সুন্দর, তাপসী !

তাপসী হেসে বলল—কেন, এতদিন আমার সৌন্দর্য সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ ছিল নাকি ?

বাউল মাথা নেড়ে জানাল—না। বলল—যেদিন তোমাকে সুধীরদের বাড়িতে প্রথম দেখি সেদিন মনে হয়েছিল উর্বশীও বুঝি ম্লান তোমার ঐশ্বর্যের

কাছে। প্রকৃতির উষার মত ক্লান্তিহীন, অম্লান—জ্যোতির্ময়ী। অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের ধারা। কিন্তু আজকের এই রূপ সেদিনের ঐশ্বর্যকেও হার মানিয়ে দেয়। তোমার রূপের মধ্যে আর সে ঐশ্বর্য নেই, সে উজ্জ্বলতা নেই। আজ সামান্য একখানা গরদের লালপেড়ে শাড়িতে ভাবময়, স্নেহময়, শান্তিময় হয়ে উঠেছে তোমার রূপ। মনে হচ্ছে ঐশ্বর্যহীনা, ভাবময়ী, নিরাভরণা, শুভ্রকান্তি, সজীব সুন্দর পবিত্রময়ী উমার কথা—

তাপসী বলল—থামলেন কেন, বলুন। ভালই লাগছে আপনার বলা।

বাউল বলল—মিথ্যে বলছি না একটুকুও। তোমার ঐ মেঘের মত চুল থেকে টুপ্ টুপ্ করে ঝরে পড়ছে জলের ফোঁটা। কপালে মুখে জলের কণা, সদ্যস্নাত কোমল অঙ্গ, শিশির ধোয়া প্রভাতের প্রস্ফুটিত কুসুমের মত পবিত্র মুখ—যেন কতকালের বেদনার আঘাতে আঘাতে শুভ্র বেদনার পবিত্র ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সমগ্র মুখে। কিন্তু তাতে সৌন্দর্যের মহিমার এক চরম শুভ্রতা, পরম পবিত্রতা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

—তারপর ?

—তারপর ? ছন্দপতনের মত বলে উঠল বাউল।—তারপর আমার মনের চঞ্চলতা তোমার চোখের শীতল শিখায় নির্বাপিত স্তব্ধ। ভাবের প্রকাশ নেই, ভাষার নিবেদন নেই, আছে শুধু উপলব্ধি।

তাপসী হাসল। বলল—অন্যদিন হলে আপনার স্তুতি ভাল লাগত না, কিন্তু তবু কেন আজ ভাল লাগল। মনে হচ্ছে, আপনার বলার মধ্যে ছলনা নেই, ভাষার মধ্যে অন্তরের স্বচ্ছলতা।

বাউল হাসল—অন্যদিন হলে আমি বলতাম না, তাপসী।

—কেন, আপনি কি জ্যোতিষী ?

বাউল হাসল—কেন মনে নেই। একদিন বলেছিলাম জিহ্বাগ্রে সরস্বতী—তা তোমার পূজাগৃহে তালা ঝুলছে কেন ?

তাপসী হেসে বলল—দেশে দেশে রাজা করিল রটনা

স্তূপে যে করিবে অর্ঘ রচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্বাসনে।

বাউল শুধাল—তা পূজারিণী এখন কি পথ নেবে ? কবি নির্দিষ্ট পথ, না উল্টো পথ ?

—সাহিত্যের উল্টোটাই বাস্তব। মিছিমিছি শেষ আরতির শিখাটুকু অকালে নিভিয়ে দিয়ে লাভ কি ?

—তাহলে তোমার পূজার স্বাধীনতাটুকুও গেল ? একটা চাপা নিঃশ্বাস বাউলের বুক থেকে বেরিয়ে এল।—বড় অন্যায় জুলুম কিন্তু।

তাপসী কিছুই বলল না। বাউল কিছুক্ষণ নিরবে দাঁড়িয়ে থেকে বলল—এখন চলি।

—কোথায় যাবেন ?

—তার কি ঠিকানা আছে ?

—আমাকে সঙ্গে নেবেন ? তাপসীর গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠল।

বাউল ওর মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে বলল—অভিমানকে যত বাড়াবে ততই বাড়বে। ওর নিবৃত্তিই করতে হয়। তা না হলে অন্তরের ক্ষত বেড়েই চলবে, ব্যাথাও তার সঙ্গে বাড়বে। শেষে আত্মবঞ্চনার প্রবৃত্তি জাগবে। কিন্তু মেয়েমানুষের সে পথেও স্বাধীনতা নেই, তাপসী। মানিয়ে চলাই নারীর ধর্ম।—বাউলের গলার স্বর গাঢ় হয়ে আসছিল, সে আর দাঁড়াতে পারল না। বলল—আমি এখন আসি, তাপসী। সময় পেলে পরে আলোচনা হবে।

বাউলের স্নেহস্পর্শে তাপসীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। সে কোন কথাই বলতে পারল না। বাউল উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল।

বাউল বাড়ি ফিরল অনেক রাত্রে। বাইরের দরজাটা কেবল ঠেসান ছিল। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন। বাউল বাড়িতে প্রবেশ করে বাতিটা দাওয়া থেকে তুলে নিয়ে নিজের নির্দিষ্ট ঘরের দরজার শিকলটা খুলে ফেলল। দেখল, বেশ পরিপাটি করে বিছানাটা পাতা রয়েছে। সন্ধ্যার পরে হয়ত ঝাড়া হয়েছে। খাটটার মাথার দিকে একটা টেবিল একখানা চাদর দিয়ে মোড়া। একতোড়া গোলাপ বেশ গন্ধ ছাড়ছে ঘরটায়। ফুলের পাশেই একটা টাইমপীস ঘড়ি অবিরাম গতিতে টিক্-টিক্ করে চলেছে। বাউল দেখল, একটা বাজছে। ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বিস্মিতভাবে বলে উঠল—বা-বা, একটা বেজে গেছে !

—হাঁ, একটা বাজছে। তাপসী ঘরের ভিতরে পেরিয়ে এল—দিব্যিত চুপ্‌চাপ শুয়ে পড়ছেন, খাবেন না?

বাউল বিনীতভাবে বলল—আর থাক, না হলেও চলবে।

—চলে ত শতকরা নিরেনব্বই জনারই। খাব বললেই বা তারা পাবে কোথায়? কিন্তু আপনার গৃহস্থের ঘরে বাস করে কদ্দিন অনাহারে চলবে বলুন ত? চলুন খেয়ে নেবেন, চলুন।

বাউল সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। বলল—আমি খেতে পারব না আজ।

—কেন, কোথায় খেয়ে এলেন শুনি? মিথ্যা কথা বলবেন না যেন।

বাউল মিথ্যা বলতে পারদর্শী ছিল না, তাই চুপ করে রইল।

তাপসী বাউলের হাত ধরে টানল—উঠুন, খেয়ে নেবেন চলুন।

বাউল আর কিছুই বলতে পারল না। বিবিধ ব্যঞ্জনযুক্ত একথালা ভাত পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করল। তাপসী বাউলের জন্যে পান সাজতে সাজতে বলল—উপোস দিয়ে থাকছিলেন ত? বাউল কিছুই বলল না। পানটা দিয়ে তাপসী হঠাৎ গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করল—এমনি করে না খেয়ে কদ্দিন কাটাচ্ছেন?

—যতদিন তুমি আমাকে দেখবার সময় পাওনি।

তাপসী ক্ষোভের সঙ্গে বলল—আপনি এখান থেকে পালান নি কেন?

—সে শুধু তুমি ব্যথা পাবে বলে।

উত্তরটা শুনে তাপসীর বুক থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ল। বলল—আমারই ভুল হয়েছিল। যে হৃদয় সহজেই সাড়া দেয়, যে হৃদয় মানুষের বেদনা অনুভব করে, আর ধৈর্য পাথরের দেবতার থেকেও শক্ত, এমন একজনের পূজা না করে পাথরের দেবতায় নিজেকে নিযুক্ত রেখে দেবতার থেকে বহুদূরেই রয়ে গেছি।

বাউল আপন মনে পান চিবোচ্ছিল। সে কিছুই বলল না। কিছুক্ষণ পরে বাউল বলল—তুমি আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? রাত ত অনেক হ'ল, এবার শোওগে। খেয়েছ ত? না, আমার অপেক্ষায় উপোস দিচ্ছিলে?

তাপসী নিম্নস্বরে বলল—আর কিছু দরকার নেই ত?

বাউল বলল—না, আমার আর কিছু দরকার হবে না; কিন্তু তুমি খেয়েছ কিনা তা ত বলছ না?

তাপসী সজল চোখ মেলে ওর দিকে তাকাল—আপনার কি মনে হয়?

বাউল এক নিঃশ্বাসে বলল—না, খাও নি ?

তাপসী চুপ করে রইল। বাউল উদ্বিগ্নভাবে বলল—যাও, খেয়ে নাও গে।

তাপসী ফিরবার জন্তে নিরবে পা বাড়াল। বাউল ব্যস্তভাবে বলে উঠল—খেতে যাচ্চ ত ?

তাপসী হাসিমুখে বলল—আর না খেলেও চলবে।

—না খেলে আমারও চলে যেত, তাপসী। কিন্তু তুমি যে যুক্তি দেখিয়ে আমাকে খাওয়ালে আমি সেই যুক্তি তোমার ওপর প্রয়োগ করছি।

তাপসী বলল—কিন্তু আমার যে রান্নাঘরে একা একা বসে খেতে ভয় করবে !

—আমার জন্তে যখন একা একা রাত জেগে অপেক্ষা করছিলে কই তখন ত ভয় লাগেনি ? বাউল হাসিমুখে তাকাল ওর দিকে। বলল—বুঝেছি। চল, আমি তোমাকে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্চিগে। না খেয়ে থাকতে দিতে আমি পারব না।

তাপসী সঙ্কুচিত হয়ে বলল—আবার আপনি কষ্ট করে উঠে যাবেন !

বাউল জোর করে ওকে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে গেল।

তাপসী খেতে খেতে বলল—আচ্ছা, আপনিও ত পুরুষ, সুধীরও পুরুষ, আবার বাঁশরীও পুরুষ, কিন্তু কত তফাৎ একজনের থেকে আর একজনের ? বলুন ত কেন এমন হয় ?

তাপসীর জিজ্ঞাসা শুনে বাউল হাসল। বলল—এ প্রশ্ন আমাকে না করাই ভাল ছিল ; কারণ প্রশ্নের উত্তরে হয়তো আর একটা প্রশ্নই তোমাকে শুধাব। আচ্ছা, কেন এত তফাৎ বলতো—তাপসীতে শ্যামায়, শ্যামাতে আর রমায়। সবাই ত মেয়ে, কারও মধ্যেই তো elementary difference নেই। তবু আপন বৈশিষ্ট্যে সাবাই আপন। তাপসী আপনার চারিধারে তৈরী করেছে হেঁয়ালির দুর্লঙ্ঘ পাহাড়। সে ভালবাসে কিন্তু আমল দেয় না, সে সংসার করে কিন্তু করে না। সে একজনের অবলম্বন চায় কিন্তু বিবাহের সম্পর্কও মেনে নিতে পারে না। শ্যামা অতি সাধারণ। সবটাই তার স্পষ্ট। তাই তার বৈশিষ্ট্যও নেই। রমার বৈশিষ্ট্য আছে, হৃদয় বুদ্ধি আছে, মমতা আছে—নেই ঐশ্বর্য, নেই সম্পদ, একান্ত নিঃস্ব, মন নিষ্প্রাণ। তার বাইরেটা যত জেগে ভিতরটা তত ঘুমিয়ে।—এতটা বলে বাউল থামল।

তাপসী মুখ তুলে বাউলের দিকে তাকিয়ে ছিল। এবার প্রশ্ন করল—শ্যামাই বা কে আর রমাই বা কে ?

—শ্যামা বাঁশরীর বোন। আর রমা হ'ল একজন উদ্বাস্তু কন্যা। দুজনকেই আমার বড্ড ভাল লেগেছে—তোমারও খুব ভাল লাগবে নিশ্চয়ই।

তাপসী হাসি মুখে বলল—আপনার ভাল লাগতে পারে, কিন্তু আমার ভাল লাগবে কেন ? আমার ত শুনেই বড় হিংসে হচ্চে ?

—কেন ?

—মনে হচ্চে আমার সতীন। তাদের কখনও ভাল দেখতে পারি !

—তুমিই পারবে তাপসী, আর কেউ পারবে না। যদি সত্যই তারা তোমার সতীন হ'ত, তবুও তুমি তাদের বুকের থেকে স্বেচ্ছায় নামাতে না।

তাপসী কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল—আচ্ছা, রমার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবেন ?

বাউল হাসল। তাপসী স্বচ্ছ চোখ দুটি তুলে ওর দিকে তাকাল—হাসছেন যে !

—তোমার কথা শুনে। পরিচয় দেওয়া আর পরিচয় নেওয়াই যার স্বধর্ম তার পরিচয় করিয়ে দেবে একজন সামাজিক সৌজন্যচ্যুত বুনো বাউল !

—হাঁ। তাপসী দৃঢ়কণ্ঠে বলে চলল—তারা যতটুকু পরিচয় করিয়ে দেয় তার মধ্যে গলদ থাকে না। খাঁটির থেকেও খাঁটি। কিন্তু সৌজন্যের মধ্যে সামাজিকতার মধ্যে যে পরিচিতি তার মধ্যে হৃদয়ের কোন স্পর্শ নেই, দায়িত্ব বোধ নেই। সে রকম পরিচয় দেওয়া নেওয়ার ওপর আমার কোন লোভ নেই।

বাউল আর কিছুই বলল না। নিরবে শুধু এই ভাবতে লাগল যে, খেয়ালি তাপসী শুধু কি খেয়ালেরই দাস, না যা কিছু সত্য তাই এমনি দুজ্ঞেয়, এমনি জটিল, এমনি অমীমাংসিত !

পরদিন সকাল বেলায় একটি ভিখিরী খঞ্জনী বাজিয়ে গান গাইছিল তাপসীদের দরজার সামনে :

যাসনে রাধে কদম তলায় ডাকুক যত বাঁশী
সবাই বলে শুনিস নাকি, বাঁশী ও নয় গলার ফাঁসি
বাঁশী শুনে যে গেছে রাই লজ্জা সরম করেছে ছাই
ভাতার পুত তার চুলোয় গেছে, কালা ছাড়া নাই।

একপাল ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়েছিল ভিড় করে। তারা ওরই গান শুনছিল। তাপসীও কপাটে হাত রেখে মন দিয়ে গানটা শুনছিল। গানের কি অর্থ, কি ভাব, সেদিকে যেমন আর কারও লক্ষ্য ছিল না, তারও ছিল না। গানটা শেষ হতেই একটি লম্বাপানা সুন্দরী মেয়ে ভিখিরীটিকে বলল—আর একটা গাও না, ভাই, শুনি।

লোকটি বলল—এবার তোমাদের ঘরে যখন গাইব তখন শুনবে।

মেয়েটির সঙ্গে একটি পাঁচ-ছ বছরের ছেলে ছিল। সে বলল—আমাগো ঘরে গাবা?

মেয়েটি সস্নেহে ছেলেটিকে ধমকে উঠল—দূর বোকা, আমরা পয়সা পামু কই?

তাপসী মেয়েটিকে দেখে পর্যন্ত কিসের সন্ধানে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। এবার নিঃসংকোচে ডেকে উঠল—রমা, শোন।

মেয়েটি বিস্ময়ে এগিয়ে এল—আপনে আমার নাম জানলেন ক্যামন কইরা?

তাপসী মৃদু হেসে বলল—তোমার চেহারাই তোমার নাম বলেছে, ভাই। এ কি তোমার ভাই?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে জানাল—হ।

—তোমরা কোথায় থাক?

মেয়েটি নিঃসংকোচে বলল—আমরা রিফিউজী। বিলের ওইধারে আমাগো কলোনী। এহানডা বড় খারাপ।

তাপসী হেসে বলল—কেন, কি দোষ এখানের, ভাই?

পাশ থেকে একটি ছেলে বিদ্রূপ করে উঠল—ওরা কাঙ্গাল যে তাই—

তাপসী কট্‌মট্‌ করে ওর দিকে তাকাতেই সে দৌড়ে সেখান থেকে পালাল।

ভিখিরী এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। এবার সে তাগাদা দিল—আমাকে কিছু দাও, মা। অন্ধ বাড়ি যেতে হবে ত।

তাপসী তাড়াতাড়ি আঁচলের খুঁট থেকে একটা আনি বের করে ওর হাতে দিল। ভিখিরীটি চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়ের ভিড়ও কমে গেল।

রমার ভাই ওর দিদিকে তাড়া দিল—ও ছোড়দি, চল্‌ না রে?

তাপসী ছেলেটিকে বলল—কেন, নাই বা গেলে? কি করতে যাবে?

ওর কথা শুনে মেয়েটি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করল। বলল—গান শুনমু যে—

—গান শুনবে? যদি আমি গান শুনাই?

—আপনে গান জানেন? পুলকিত হয়ে উঠল মেয়েটি। আনন্দে ভাইকে জড়িয়ে ধরল—তবে রে বোকা, মিছামিছি অর পিছেপিছে ঘুরমু ক্যান্, দিদি যে গান শুনাইবেন।

ছেলেটি বড বড় চোখ মেলে তাকাল। বলল—কই দিদি?

—এই ত দিদি। তাপসীকে দেখিয়ে মেয়েটি হাসল।

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল—যা, মিথ্যা কথা। আমি দিদির কাছে যাব।

—ছিঃ, কইতে নাই। গান শুনবি না। মেয়েটি ছেলেটির হাত ধরে টানল—চল্‌, গান শুনবি চল্‌।

তাপসী যেতে যেতে শুধাল—তোমার দিদি আছেন নাকি?

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—ছিল। মারা গেছে। এখানে আসার এক বছর আগে—ঠিক এক বছরই হইল। সে নাই। আমাগো ছাইড়া পালাইয়েছে। টপ্‌টপ্‌ করে ক'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

তাপসী আগে আগে চলছিল। সে ওর চোখের জল লক্ষ্য করেনি। প্রশ্ন করল—কি হয়েছিল?

মেয়েটি এতক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। বলল—অনাহারে। বাবার

চাকরী গেল। খাইতে না পাইয়া সে একদিন এহানের মায়া কাটাইয়া চইলা গেল।

—তোমার বাবা কোথায় চাকরী করতেন?

মেয়েটি শান্ত কণ্ঠে সুরু করল বলতে।

অনেকদিন আগে, প্রায় ত্রিশ বছর আগে বাবা মাষ্টারী নিয়ে এখানে চলে আসেন। তারপর বড় মা মারা গেলেন। বাবা দেশে ফিরে গিয়ে মাকে বিয়ে করলেন। কিন্তু মাকে সঙ্গে নিয়ে আবার এদেশে ফিরে এলেন। এখানে এসে আবার মাষ্টারী নিলেন ফরিদপুরের এক আধা সন্ন্যাসীর ইস্কুলে।

সেই সন্ন্যাসী যৌবনে এক বৃদ্ধ জামিদারের তরুণী ভার্যা এবং গয়না ও নগদে এক লক্ষ টাকা নিয়ে এদেশে পালিয়ে এসে ব্যবসা সুরু করেন। পরে সেই তরুণী এক কন্যা রেখে মারা গেলে তিনি গেরুয়া পরলেন—নাম নিলেন সাধু। তাঁরই ইস্কুলে বাবা হলেন তৃতীয় শিক্ষক। সেখানে মাষ্টারী করতে করতেই বাবা বুড়িয়ে গেলেন। এদিকে '৪৭ সালের স্বাধীনতায় বাংলা ভাগ হয়ে দেশে ফিরে যাবার পথ বন্ধ হয়ে গেল। সাধুবাবার কর্তৃত্বে আঘাত লাগায় তিনি ইস্কুল তুলে দিলেন। তবে বাবার জন্যে খানিকটা রেখে। বাবার চাকরী যখন এমনি করে শিকেয় উঠল তখন একজন রাজনৈতিক নেতার ডাকে সেখানের শেষ বাঁধনটুকু কেটে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার আশায় এক নূতন ইস্কুলে তিনি এলেন। একদিন বাবার সঙ্গে মা, বড় দুই বোন, এই ভাই আর কোলের একটা বোন, এই কজন মিলে মহানন্দে বাবার নূতন কর্মক্ষেত্রে এসে পৌছোল। একমাস বেশ কাটল। ঘর পেলেন বেতনও পেলেন। কিন্তু দুমাস পরেই ভাগ্য পরিবর্তন হ'ল। ভাগ্য গেল উল্টে। বেতন বন্ধ হ'ল। ঘরের মালিক এসে বাড়ি থেকে তুলে দিলেন। খাওয়া থাকা একটা মস্ত বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিল। বাবার মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠল। তিনি কতৃপক্ষকে দুকথা শুনিয়ে দিলেন। বললেন—আমার শেষ আশ্রয়টুকু ঘুচিয়ে আমার মতো অসহায়কে অনাহারে মেরে ফেলবার জন্যে কেন টেনে আনলেন?

কিন্তু তবুও বাবার বেতন বাকি পড়ল—একমাস—দুমাস—তিন মাস।

একে সামান্ত বেতন তায় বাকি, উপবাস পড়তে লাগল। যদি কেউ দান করত, যদি কেউ ধার দিত তবেই সেদিন হাঁড়ি চড়ত। দিদি না খেতে পেয়ে অসুখে পড়ল। এদিকে কর্তৃপক্ষ বাবার কাছে মূল সার্টিফিকেট চেয়ে বসল। কিন্তু বাবার তখন সে সব কোথায়!

চাকরীর জন্তে যে এর নূতন করে প্রয়োজন হবে তাই বা কে ভেবেছিল। সেই অজুহাতে বাবার চাকরী গেল। কিছুদিন পরে দিদিও মারা গেল। তারপর বহুকষ্টে সরকারী সাহায্য নিয়ে রিফিউজী হয়ে এখানে একবছর এসেছে। কিন্তু এখানেও মানুষের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পায় না।

রমা বেশ গুছিয়ে সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনাটা বলল।

ছেলেটি মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিল। বলল—ও ছোড্‌দি, গান কই বললো?

তাপসী হেসে বলল—গান শুনবে, এই যে গাই। হারমোনিয়ামটা বের করে সে গান ধরল:

মুক্ত কর মা মুক্তকেশী
ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।
কালের হাতে সঁপে দিয়ে মা, ভুলেছ কি রাজমহিষী
তারা কত দিন কাটাবে আমার
এ দুরন্ত কালের ফাঁসি—
প্রসাদ বলে কি ফল হবে·········

গানটা শেষ করে তাপসী ছেলেটিকে শুধাল—কেমন লাগল?

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল—না, আর একটা—

—আর একটা, আচ্ছা শোন। তাপসী আবার গান ধরল—

আর কাজ কি আমার কাশী
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়াগঙ্গা বারাণসী
হৃদকমলে ধ্যান করলে আনন্দ সাগরে ভাসি
ওরে, কাশীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশিরাশি—

অনেকক্ষণ ধরে গানটা গেয়ে তাপসী যখন থামল তখন তাপসীর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরছে।

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে বলল—বড় কষ্ট হইল আপনার। পাখা করমু? রমা তাড়াতাড়ি পাখাটা তুলে নিল।

তাপসী ওর হাত থেকে পাখাটা কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল—থাক ভাই, পাখা করে তোমাকে গানের দাম দিতে হবে না। একটু বস, চা খেয়ে যাবে।

—চা খামু? চায়ের নাম শুনে ছেলেটি সতৃষ্ণ নয়নে তাকাল ওর দিকে।

তাপসী সস্নেহে ছেলেটির মাথায় হাত রেখে বলল—এই যে ভাই, চা করে আনি। একটু বস। ছবি দেখবে ততক্ষণ?

একটা ছবির বই ওর কোলে ফেলে দিয়ে তাপসী বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছুটো রেকাবে কিছু খাবার আর চা নিয়ে এল। রমার সংকোচ হচ্ছিল কিন্তু ছেলেটি পরম আনন্দে খেতে লাগল।

তাপসী মেয়েটিকে বলল—তুমি খাও, রমা।

—এই যে খাই। বলে সেও সলজ্জভাবে খেতে লাগল।

ছেলেটি গবগব করে খেয়ে ফেলতেই তাপসী সস্নেহে শুধাল—তুমি আর নেবে, ভাই?

ছেলেটি মাথা নেড়ে জানাল—না। তারপর মনোযোগ সহকারে ছুহাতে কাপটিকে ধরে চা খেতে লাগল।

তাপসী একদৃষ্টে ছেলেটির দিকে তাকিয়েছিল—সুন্দর গায়ের রঙ, গোলগোল হাত পা, সুন্দর মুখের কাট, বড় বড় টানা টানা চোখ। মিষ্টি হাসি। সপ্রতিভ দৃষ্টি। বিশেষ করে চাহনিটাই বড্ড ভাল লাগল তাপসীর। এমনি একটি নিজের ছেলে যদি ওরও থাকত। কত আদর করত তাকে, সেও ডাকত মা বলে—ছুটে এসে জড়িয়ে ধরত। ভাবতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তাপসীর। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ছেলেদের খেলা শেষ হবে। সবাই ছুটবে আপন আপন মায়ের কাছে।

রমা উঠে দাঁড়াল—তাহলে আজ আসি, তাপসীদি!

তাপসী তন্দ্রাচ্ছন্নের মতো বলে উঠল—আচ্ছা এস।

তাপসী চুপ করে বসে ছিল। ঘরের ভিতরটাও যে অন্ধকার হচ্চে সেদিকে খেয়াল ছিল না ওর। মাতৃত্বের নেশায় যেন ওকে পেয়ে বসেছে। কল্পনায় ওর ছেলের অস্তিত্ব গড়ে উঠল ওর চোখের সামনে। ওর স্বামীরই ছেলে।

তাপসী ভাবতে লাগল—কেন, এমন কি হতে পারত না! যেদিন সেই মামার ঘরে যে সিঁথির উপর একফোঁটা সিঁদুর দিয়ে অধিকারের একটা ফতোয়া দিয়ে চলে গেছে সে কি একটা গভীর আলিঙ্গন দিয়ে যেতে পারত না। ভগবান কি তারই একটা সন্তান ওর কোলে দিতে পারত না! তার স্বামীর ছেলে। তাকে নিয়ে সে বাস করত, তার মুখ দেখে তার স্বামীর মুখকে মনে করত, তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে চোখে এঁকে দিত সহস্র চুম্বন। রাত্রে গভীর স্নেহে কোলেব কাছে টেনে নিয়ে বাহুর বন্ধনে ঘিরে রেখে ঘুমুত পরম শান্তিতে। তার পায়ে দিত নূপুর, কোমরে দিত ঘোষাগোটা।···রাত্রি হয়েছে। এতক্ষণ সে ছুটে আসত পায়ের নূপুর বাজিয়ে, কোলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ত—মা, গল্প বল। অভিমান করে বলত— আমি চলে যাব। তোমার কাছে থাকব না—

গোলাপ হয়ে ফুটবো কাঁটার মাঝে
চাঁপা হয়ে ফুটবো চাঁপা গাছে।

তাপসীর মুদ্রিত নয়নে স্পষ্ট হয়ে উঠল অভিমানী সন্তানের ছলছল আঁখি। সে বুকে জড়িয়ে ধরল মাতৃত্বের আবেগে। চম্‌কে উঠল তাপসী। দেখল, কোল খালি, বুকের উপর বদ্ধ হয়ে আছে ওরই হাত দুটো। জলে চোখ দুটো ভেসে গেছে। দারুণ অভিমান হ'ল ভগবানের উপর।

অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল—ভগবান, কি এত অপরাধ করেছি? কেন তুমি আমার কোলে একটা সন্তান দাও নি। যদি নাই দিলে, কেন তবে বুকে মাতৃত্বের আগুন ধরিয়ে দিলে। নিভিয়ে দাও প্রভু—নিভিয়ে দাও। না হলে—

—তাপসী। আবছা অন্ধকার ঘরটায় এসে দাঁড়াল সুধীর। বলল—তুমি সন্ধ্যেবেলায় এই অন্ধকার ঘরটায় চুপচাপ বসে আছ?

তাপসী চোখের জল মুছে নিয়ে বার কয়েক কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল—কেন বলত?

—কেন আবার কি? ভাল লাগছে? এই শুধাচ্ছিলাম।

তাপসী বলল—ভালই যদি না লাগবে তাহলে এখানে বসেই বা থাকব কেন? খারাপটাকে আর কে জোর করে মানিয়ে চলে বল?

—কেন তোমার গুরু। যার কাছে তুমি তোমার আত্মকেন্দ্রিক মনকে নিবেদন করে বলেছিলে—প্রেমের গুরু দাও গো প্রেমের দীক্ষা।

তাপসী ম্লান হেসে বলল—তার মতোই বা হতে পারলাম কই? ভোগের বাসনা চারিদিকে শিখায়িত হয়ে উঠেছে। ইন্ধন নেই, তাই নিজের বুকটাই জ্বলে যাচ্ছে, সুধীরদা। মনে হচ্চে—কি মনে হচ্চে কে জানে? সত্যিই বড় অবলা মেয়ে মানুষ। শক্তি কই?

সুধীর ওর বাষ্পাচ্ছন্ন কথা শুনে শুধাল—হঠাৎ তোমার কি হ'ল?

—কিছুই হয়নি। আমার কি কোনদিন কিছু হয়েছে যে আজ হবে? আচ্ছা সুধীরদা, নারীকে কেন শক্তি বলে?

সুধীর ওর বেদনাপূর্ণ কথা শুনে ব্যাকুল হয়ে উঠল। গাঢ়স্বরে বলল—সত্যই নারী শক্তি। নারী শক্তি না জোগালে পুরুষের দ্বারা কোন কাজই হ'ত না। কিন্তু শক্তি যদি প্রকাশের পথ না পায় তাহলে সে শক্তি পঙ্গু, কোন ক্রিয়াই নাই তার। তাই শক্তি মাত্রেই প্রকাশের পথ খোঁজে। তার একটা অবলম্বন না হলে চলে না। আকাশ না হলে বিদ্যুৎ চমকে না, দাহ্যবস্তু না হলে আগুন জ্বলে না। ইথার না হলে বাতাস বয় না! সবাই খোঁজে আপন আপন অবলম্বন। লতা জড়িয়ে ধরতে চায় বৃক্ষকে, বৃক্ষ ডালপালা মেলে খোঁজে এক ফোঁটা আলোর সন্ধান, কল্পনা খুঁজে একটুকরো ঘটনা আর নারী খোঁজে পুরুষ।

সুধীর থামতেই তাপসী বলল—তোমার সব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছকে ফেলা।

সুধীর হেসে বলল—কি রকম?

—যখন নারী চায় পুরুষ আর পুরুষ চায় নারী তখন বিবাহের একান্ত প্রয়োজন। বিয়ে কর। সত্য কিনা বল?

—বিয়ে সমাজের মঙ্গল, নারীর মঙ্গল, পুরুষের মঙ্গল—এ আমি জোর গলাতেই বলব তাপসী।

—বিয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তুমি নিতান্ত নিম্ন গলাতে বললেও আমি কোন প্রতিবাদ করতাম না। কিন্তু বিয়ে যে আমারও করা উচিত সেটাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারি না।

—মানতে তুমি বাধ্য। তোমার বিয়ে না করার মুখে যুক্তি দেখাও, দেখবে তোমার যুক্তি এত দুর্বল যে তোমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল প্রতিপন্ন হয়ে যাবে।

সুধীরের কথা শুনে তাপসী হেসে বলল—জেরার মুখে, যুক্তির ধোপে আমার মত না টিকতেও পারে, সত্যই অগ্রাহ্য হতে পারে; কিন্তু তাতেই সত্যটা মিথ্যা হয়ে যায় না। আদালতে উকিল-মোক্তারে অনেক মিথ্যাকে জয়যুক্ত করে, অনেক সত্যকে হারিয়ে দেয়, কিন্তু তাতেই মিথ্যা কখনও সত্য হয় না, সত্যও কখনও মিথ্যা হয় না। তাহলে তারা উকিল মোক্তারই হ'ত না—হ'ত সত্যদ্রষ্টা ঋষি। তর্কের খাতিরে প্রয়োজনের খাতিরে তারা সত্যকে মিথ্যা করলেও মনে মনে তারাও সত্যকে সত্য বলেই স্বীকার করে।

সুধীর এর কোন উত্তরই খুঁজে পেল না। কিছুক্ষণ পরে বলে উঠল—আচ্ছা, তোমার ইচ্ছাটা কি বলত, তাপসী?

—ইচ্ছা? ইচ্ছা যা করে তাই কি হয়? আমি যা ইচ্ছা করছি তার উল্টোটাই হচ্চে।

—তাহলে তুমি ভাবছ বিয়ে করবে না। কিন্তু বিয়ে করতেই হবে।

তাপসী সহাস্যে বলল—যাও ওকালতি পড়গে। পসার ভালই জমবে।

সুধীর হেসে বলল—কিন্তু তুমিই যে আমার প্রথম মামলা। এটাতেই যদি হেরে যাই তাহলে—

তাপসী হাসতে হাসতে বলল—প্রথমেই এত জটিল কেস হাতে নেওয়া উচিত হয়নি। ছোট খাট কেস করে আগে কৌশলী বুদ্ধিটা পাকাতে হ'ত।

সুধীর বলল—কিন্তু প্রথমে এত মোটা ফি নূতন উকিলের পক্ষে লোভের নয় কি? তাই না শেষে লোভে পড়ে আসতে হ'ল।

—এখন পাঁকে পঁচে মর। যেমন লোভ করে এসেছিলে তেমনি মামলায় হার।

—কিন্তু তুমি কথায় কথায় মূল প্রশ্নকে এড়িয়ে যাচ্চ, তাপসী।

—তুমিই বার বার আমার মূল নীতিকে এড়িয়ে যাচ্চ।

সুধীর জোর করে বলল—তুমি এখনও ও পথ ত্যাগ কর, তাপসী। আমার শেষ অনুরোধ তোমার কাছে। তুমি বিয়ে কর।

—তুমি বিয়ে কর, সুধীরদা।

—তোমার যদি আমাকে ইচ্ছে হয়ে থাকে তাহলে না হয় তাই কর। যা ইচ্ছে।

—যা ইচ্ছে তাই করব বলেইত আজ বিয়ে করতে পারিনি। আর তোমাকে বিয়ে করতে বলছি আমাকে নয়—রমাকে।

—রমা আবার কে?

—বড় ভাল মেয়ে, এক দুঃখী পরিবারের অনূঢ়া কন্যা। আমার একান্ত অনুরোধ মেয়েটিকে তুমি সুখী কর, সুধীরদা। সুধীরের হাত দুটো জড়িয়ে ধরল—বল, আমার কথা রাখবে?

সুধীর ওর হাত দুটো ছাড়িয়ে নিতে পারল না। ওর ব্যাকুল চোখ দুটোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল গভীর ভাবে, তারপর বলল—আমি কথা দিচ্চি, তাপসী।

তাপসী ওর হাত দুটো ছেড়ে দিল। পরম তৃপ্তির সঙ্গে বলে উঠল—তুমি আমাকে বাঁচালে, সুধীরদা। জনম দুখিনী মেয়েটিকে যেন ভুল না, ঠাঁই দিও, আর কি বলব।

সুধীর গাঢ়স্বরে বলল—তুমি এত ব্যস্ত হচ্চ কেন? দেখবে, তোমার সুধীরদা মাথায় টোপর দিয়ে পালকি চড়ে রমাদের দরজায় এসে দাঁড়াবে। গলায় মালা দিয়ে জনম দুঃখিনী সীতাকে পালকি চড়িয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু তুমিও আমার অনুরোধটা রাখলেই ভাল করতে।

তাপসী কিছুক্ষণ কি চিন্তা করল। তারপর বলল—তোমার অনুরোধটাও রাখব, কিছুদিন আমাকে সময় দাও, সুধীরদা। যদি সম্ভব হ'ত আজই আমি তোমার আদেশ মাথা পেতে নিতাম।

সুধীর হঠাৎ প্রশ্ন করল—তাপসী তোমাকে প্রশ্ন করছি কিছু মনে কর না। তোমার মধ্যে কোন রহস্য জড়ান আছে কি?

তাপসী এক মুহূর্ত কি ভাবল, তারপর দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল—আছে। কিন্তু সে রহস্য এখন জানতে চেয়ো না, বা রহস্যের কথা কারো কাছে প্রকাশ কর না। একদিন রামায়ণের জনম দুঃখিনী সীতার কাহিনীর মতো আমিও জগতকে শোনাব—সীতার দুঃখের কথা শোন। যতদিন না আমার নিজের মুখে পরিচয় দেওয়ার দিন আসবে ততদিন ধৈর্য ধর।

পরদিন সকালে তাপসী যখন শয্যা ত্যাগ করে বাইরে এল, দেখল সুধীর বাড়ি যাবার জন্তে প্রস্তুত। বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা সব ঠিকঠাক।

তাপসী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—একি সুধীরদা, তুমি চলছ নাকি? কই, কাল ত একথা বললে না।

সুধীর বলল—কি এমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে বলতেই হবে? তা ছাড়া প্রয়োজনই যখন ফুরাল তখন আর কেন?

—কেন তোমার উদ্দেশ্য কি এটাই ছিল? আমি কি তোমার কেউ নই?

সুধীর ম্লান হেসে বলল—যা ছিলে তা থাকবেও, কিন্তু তার জোরে থাকবার ঠাঁই গাড়া যায় না। যেদিন তোমার মন আবার স্বাভাবিক হবে, যেদিন অন্তরটা আগের মত হাল্কা করে হাল্কাভাবে মিশতে পারবে, সেদিন আবার আসব। সেদিন হয়তো নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখব না।

তাপসীর চোখদুটো ছলছল্ করে উঠল। বলল—তুমি হয়তো ভাববে তাপসী নীচ, কিন্তু আমার মনটাই যেন আমার হয়। তোমার কোন আদর-যত্নও করতে পারলাম না, সঙ্গে একদিন বেড়াতেও গেলাম না। এমন কি যাকে ঘটা করে নিয়ে এলাম তারও খোঁজ রাখতে পারিনি। কোথায় যে সে এই দুদিন গেছে তাও খোঁজ রাখিনি।

—বড় ভাল কাজ করনি, মা। হুঁকা হাতে ওর বাবা এসে দাঁড়ালেন। সংসারে যার যা ধর্ম তাই তাকে মেনে চলতে হয়। সৃষ্টি ধর্ম, আদি ধর্ম, সনাতন ধর্ম। সর্বযুগে, সর্বকালে, সমগ্র জাতিতেই সৃষ্টির ধর্ম পরম ধর্ম, চরম ধর্ম।

তাপসী মাথা নত করে বলল—বাবা?

—বাবা নয়, যা বলছি তা আমার নিজের কথা নয়, শাস্ত্রের কথা। শাস্ত্রকে বাদ দিলে সমাজ থাকে না; সমাজকে রক্ষা না করলে মানুষ রক্ষা পায় না।

—মানুষ যদি রক্ষা পাবার না হয়, প্রকৃতির তাই খেয়াল হয়, তাহলে সমাজ, আইন, ধর্ম কোন কিছু তাকে রক্ষা করতে পারে না। সৃষ্টিই ছিল আদিম সমাজের ধর্ম। বস্তুজগতে প্রাণীজগতে সমাজ, ধর্ম, প্রবৃত্তি, মিত্রতা সব কিছুরই নিয়ন্ত্রণ করে সৃষ্টির সাধনা। তবুও প্রাণীতত্ত্বের ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে কত প্রাণী স্পেসিস হিসাবে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

—পশু গেছে বলে কি মানুষও নিঃশেষ হয়ে যাবে! তাহলে মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়?

—মানবতায় ত্যাগে সংযমে। কথাটা জোর করে বলে ফেলেই তাপসী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। তাপসীর বাবা যেন ওর কথার আঘাতে পঙ্গু হয়ে গেলেন। স্থিরভাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুধীর মাথা নুইয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—আমি আসি মেসোমশাই।

নিদ্রোত্থিতের মত তিনি বলে উঠলেন—তুমি সত্যই যাচ্ছ?

—কি আর করব বলুন?

—হাঁ তা বটে। কি আর করবে? তাপসীর মাথায় কি যে পোকা ঢুকল, ও যেন বেঁকে বসেছে। ওর মাও ত তেমন কাজের নয়, মেয়েকে যে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একটা মতে আনবে—

সর্বজয়া এদিকেই আসছিলেন, কর্তার মুখের কথাটা কানে যেতেই রেগে উঠলেন:—মায়ের মিছিমিছি দোষ দিচ্ছ কেন, বাপটাই কিছু নয়। তুমিও ত মেয়ে মানুষের মত কত উপদেশ দিলে, কিছু ফল হ'ল?

—মাকে মা হতে হয়, মায়ের দোষেই মেয়ে বেবয়রা হয়।

সর্বজয়া উঁচু গলায় উত্তর দিলেন—বাপকে বাপ হতে হয়। আমি বাপ হলে ও আমার কাছে না বলতে পারত! জোর করে—

সর্বজয়ার কথা শুনে সুধীর চমকে উঠল।

—না-না ওরকম করবেন না। কর্তব্যটাই সবচেয়ে বড় নয়, মাসিমা। ও যে কেন বিয়ে করতে চাইছে না তার কারণটা কি জানবার চেষ্টা করেছেন? হয়ত ও এমন একজনকে হৃদয় দিয়ে বসেছে যে এখন ওর নাগালের বাইরে। হয়ত সন্ধানেরও বাইরে। তাই তারই প্রতীক্ষায় সে আর কাউকে গ্রহণ করতে পারছে না। ওকে আর এ নিয়ে জেদ করবেন না।

সর্বজয়া ফিস্ ফিস্ করে বললেন—তা বাবা তুমি সে ছেলেটির খোঁজ নিলে না কেন? সর্বস্ব খুইয়ে না হয় তার হাতেই মেয়েকে সঁপে দিতাম। দরকার হলে হাতে ধরতেও ছাড়ব না।

সুধীর হাসল। বলল—তাপসী সে কথা জানালে ত! তবে এটুকু নিশ্চয়ই বুঝেছি যে সে শুধু নাগালের বাইরে নয় সন্ধানেরও বাইরে।

সর্বজয়া আর কিছুই বললেন না। তাপসীর বাবাও সেখান থেকে চলে গেলেন।

সুধীর আর একবার সর্বজয়ার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল—আসি

মাসিমা। যাবার বেলায় আমি অনুরোধ করছি, তাপসীকে শান্তিতে থাকতে দিন!

সর্বজয়া কিছুই বললেন না। সুধীর আস্তে আস্তে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

[১১]

বিকাল বেলায় তাপসী উপলব্ধি করল সে একা। আজ সুধীর নেই, বাউল আজ কদিন ফেরে নি! সে ত বনের ময়ূর। যেখানে মেঘ ডাকে জল পড়ে সেখানেই পেখম তুলে নাচ ধরে। ঘরের কথা, ফেরবার কথা মনে থাকে না। তার মনেই বা থাকবে কি করে, কিইবা তার আকর্ষণ! সে একদিন অবহেলে সমাজ ছেড়েছে, বন্ধু ছেড়েছে, আবার যাকে আশ্রয় ক'রে, কেন্দ্র ক'রে সব ছেড়েছিল সেই বন্য নিরবিচ্ছন্ন শান্তিময় নির্লিপ্ত দিন গুজরণের মোহও কেটে গেল একদিন। আবার কেন, কিসের মোহে সে কোথায় উড়ে গেল কে জানে!

তাপসী ভাবে, সে আসবে না। গতিশীল মেঘের মত একবার পাহাড়ের মাথায় একবার আকাশের নিচে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। কি তাতে শান্তি, কি তাতে চঞ্চলতা, তা সেই জানে। কিন্তু তাপসীর নিজের? সে বড় একা। কেউ তার নাই। মায়ের মন তার মনের আকাশে পৌঁছে না, বাপের মনত ঝোড়ো হাওয়া। যদি একটা কেউ নিজের মনের মত থাকত যাকে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করত, প্রাণ দিয়ে ভালবাসত! কিন্তু কই, কারো উপরত তার সে জোর নেই। কথায় আছে, পেটের বাছা বাড়ির গাছা। যদি ওর একটা পেটের ছেলে থাকত, সে তাকে মা বলে ডাকত···—ভাবতে বুকের ভিতর থেকে আনন্দের ঢেউ এল তাপসীর। তার নিজের ছেলে, পেটের ছেলে! তাপসী স্পষ্ট উপলব্ধি করল, যৌবন তার শেষ হয়ে গেছে। মাতৃত্বের ব্যাকুলতায় তার হৃদয় উচ্ছ্বসিত। ছেলের কথা, মা হওয়ার কথা চিন্তা করতে মাথা উত্তপ্ত হয়ে উঠল তাপসীর। খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঠুকে ঠুকে মাথায় দিল, তারপর বাইরে বেরিয়ে পড়ল।

রিফিউজী কলোনী। সোনাপুর গ্রামের পশ্চিমে, বিলের ধারে পতিত ডাঙ্গাটার উপর গড়ে উঠেছে রিফিউজী কলোনী। ত্রিশ-চল্লিশ ঘর উদ্বাস্তু এসে এখানে মাটির ঘর তুলেছে। যদিও এরা নিজেরাই নিজেদের পরিকল্পনায় ঘর তৈরী করেছে তবুও এদের ঘরগুলো বেশ সাজানো। একটা শ্রী ফুটে উঠেছে। মাটির ঘরের সামনে একটুকরো করে বাগান। কঞ্চি দিয়ে তৈরী গেট। গেটের মাথায় অপরাজিতার লতা কঞ্চির উপর পাকে পাকে জড়িয়ে উঠেছে। বাগানের মাঝে নানা রঙের মরশুমী ফুল। বড় বড় লিলি, পপি আর সূর্যমুখী ফুল।

কলোনী ঢুকতেই যে বাড়িটা সেটা সতীশের। ওকে এখানের সবাই বলে সতীশ বাঙাল। ওর বাগানে ফুলের গাছ নেই, রয়েছে চালকুমড়ো আর উচ্ছে। বাড়িতে খাবার জন্য নয়, বিক্রির জন্যে। মাথায় ধামা চাপিয়ে সে গ্রামে গ্রামে তরকারি বেচে বেড়ায়। দূরহাটে শনি আর বুধবারে তরকারি কিনে আনে আর সেই জিনিস চড়া দামে বিক্রি করে গৃহস্থের কাছে। যেদিন বাড়িতে অনেক তরকারি জমে ওঠে সেদিন আর হাটে যায় না, সেই বিক্রি করে। তবে দাম সেই চড়াই থাকে। বলে, হাটে কেনা জিনিস। অনেকে জিনিস কেনে আবার অনেকে কেনেও না। টিপ্পনিও কাটে, বলে, সতীশের দরে এঁটে উঠবো না।

দৈবাৎ যদি হাটুরেরা বিক্রি করতে আসে, সেদিন আর সতীশের বিক্রি হয় না। হাটুরে হেঁকে যায়, পাঁচ আনা সের বেগুন, কিন্তু সতীশের বেগুন আট আনার এক পয়সাও কমে না। তাই সতীশকে কম্‌পিটিশনেও নামতে হয় না। এমনি করেই সতীশ দিন চালায়। দুটি ছেলে আর স্ত্রী নিয়ে তার সংসার। নিজে কানা মানুষ, বিদেশ বিভুঁই, সরকারী সাহায্য এখন নেই তবুও তাকে উপোস দিতে হয় না।

তারপরই উমেশ নাপিতের বাড়ি। লোকটি একা, জাতিতে নমঃশূদ্র। পূর্ববঙ্গে চুল কোনদিন কাটত না। এখানে নাপিতের অভাব আর আদর দেখে একটা খুর আর একটা কাঁচি কিনে নাপিতের কাজ আরম্ভ করে। নাপিতের অভাব হলেও প্রথম প্রথম ওর কাছে কেউ চুল দাড়ি কামাত না। কিন্তু খুর-ভাড়া নিয়ে রোজ দুয়ারে দুয়ারে খোঁজ নিত, কেউ চুলদাড়ি কামাবে কিনা। বলত, চুলদাড়ি কেটে জনম গেল ঢাকা জেলায়, কত অপিসারের চুলদাড়ি ফেললাম, আজ কিনা এখানের লোক বলে—উমেশ চুল কাটতে জানে না!

পূর্ববঙ্গে কতটা হাত পাকিয়েছিল তা সেই জানে; কিন্তু বিনা রক্ত-পাতে চুলদাড়ি কেলার কায়দাটা সে সত্যই আরম্ভ করল এখানের কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্তদের কামিয়ে।

এখানে সে বেশ দুপয়সা কামায়। পেটও চলে হাতও পাকে। লোকে বলে, এদেশের মেয়ে পেলে নাকি সে বিয়ে করবে। টাকাও খরচ করবে তার জন্যে।

আর একজন উল্লেখযোগ্য লোক আছে কলোনীতে—রমণী। লোকটি বৃদ্ধ। কি করে যে দিন চলে সেই জানে। কখনও ধার করে, কখনও বা খানিকটা তামাক নিয়ে আসে বিক্রি করতে। তবুও লোকটি ভুলবার মত নয়। সে প্রায়ই সোনাপুরে আসে। লোকে দেখলেই জিজ্ঞাসা করে—কর্তা খবর কি?

রমণী হাত নেড়ে বলে—আর খবর কি কন, আপনাগো দ্যাশে এ্যাসে এ্যামন হাল হইল। কি সুখেই না ছ্যালাম। বিল ভর্তি মাছ, জ্যাল ফেইলা যখন খুশি ম্যাছ ধরতাম। এ দ্যাশের মতন মাঠে হালফাল দিয়া চাষ করতে হইব ক্যান। ধাইন ফ্যাইলা দিলেই থপা থপা শুধুই ধাইন। আপনাগো দ্যাশে ম্যাছ নাই, চাষ ক্যারলে তবে না ধাইন!

কেউ বলে—কর্তা এদেশের মন্দ কইছ ক্যান?

রমণী ম্লান হেসে বলে—মন্দ কইছি না বাবা, বড় ভিকিরির দ্যাশ। রমণী কোনদিন ট্রেণে চেকারদের সঙ্গে ঝগড়া বাধায়।—টিকিট কাটিনি বাবু।

—টিকিট কাটনি কেন, পয়সা দাও।

—আমরা রিফিউজী, পয়সা কোথায় পাব?

—পয়সা নেই তবে পরের ষ্টেশনে নেমে বাকি রাস্তাটুকু হেঁটে যাবে। নাহলে টেনে নামিয়ে দেব. এই বলে চেকার অন্য কামরায় চলে গেল। রমণী যাত্রীদের লক্ষ্য করে বলল—দ্যাখলেন মশায়! পয়সা না হলে নামিয়ে দ্যাবে কইছে। আমাগো দ্যাশে এমন নয়।

একজন বলে উঠল—তোমাগো দ্যাশে কি ভাড়া লাগে না?

রমণী মাথা নেড়ে বলল—লাগে বাবা, কিন্তু আমার লাগে না।

বলত, কর্তা হাতটা একবার দ্যাখা দেও।

—কর্তা হাত দেখতে জান নাকি? দেখত আমার হাতটা।

রমণী অনেক্ষণ ধরে হাতটা দেখে বলল—সময়তো ভাল দেখচি না কর্তার। কিছুদিন ভোগ আছে। পিছনে শত্তুর আছে।

অনেকে ভিড় করল। রমণী বলল—সব সময় হাত দেখিনা। গুরুর নিষেধ।

জ্যোতিষি বলে অনেকেই চেনে রমণীকে। রমণীও অনেকের হাত দেখেছে কিন্তু কারও সময় ভাল দেখেনি—পিছনে শত্রু আছে।...

রমণীর বাড়িতে আছে বুড়ি স্ত্রী। তবে তার বাড়িটাও সুন্দর তারও বাড়ির গেটে অপরাজিতার লতা আঙিনায় সূর্যমুখী ফুলের বন।

তারই পাশে প্রাক্তন শিক্ষক হরমোহনের বাড়ি। কোন পার্থক্য নেই অন্য সব বাড়ি থেকে। এরও বাড়ির সামনে গেট,—গেটের মাথায় লতা,—আঙিনায় ধুতরা ফুলের গাছ।

আঙিনায় মাষ্টারের ছেলেমেয়েরা খেলছিল। ছোট ছেলেটি চুপিচুপি প্রজা-পতির পিছু পিছু হাত বাড়াচ্ছিল। রমা ছেলে কোলে নিয়ে ছড়া কাটছিল।—ফেলে আসা জীবনের বৈকালের স্মৃতি—

ইছামতির তীরে—
সূর্য মামা পাটে বসেছে
সাগর পারে কোথায় চলেছে
আনবে কাহার খোঁজ—?
ময়ূরপঙ্খী নাও চড়ে আসবে ফিরে
মোদের খোকন রাজকন্যা ধরে—
দিবে লাল টুক্‌টুক্ সাড়ি—
রাগবে যখন বলবে, বৌ তোর সঙ্গে আড়ি।

রমা তাকে আদর করছিল—চুমু খাচ্ছিল আর ছড়া কাটছিল—

দিবে লাল টুক্‌টুক্ সাড়ি
রাগবে যখন বলবে, বৌ তোর সঙ্গে আড়ি

তাপসী যে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল তা লক্ষ্য করেনি রমা। সে বার বার সুরে সুরে আবৃত্তি করছিল। তাপসী খানিক চুপ করে থেকে ডেকে উঠল—রমা, তুমি যে আমার সঙ্গে আড়ি দিয়ে দিচ্ছ দেখছি!

রমা পিছন ফিরে চমকে উঠল—তাপসীদি কখন আইলেন?

—অনেকক্ষণ। তোমার ছড়াটা শুনতে শুনতে প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছি।

—কই কয়েন দেখি? রমা বড় বড় চোখ মেলে কৌতুকে তাকাল ওর দিকে।

তাপসী হেসে বলল—শুনবে? গানের সুরে ধরল—

সূর্যমামা পাটে বসেছে—

পাল তুলে সাদা নৌকাগুলো

সাগর পারে কোথায় চলেছে—

এতটা গেয়ে তাপসী থামল—আর মুখস্থ করতে পারি নি।

রমা বলল—বড় সুন্দর লাগল ত আপনার গলায়।

ছেলেটি প্রজাপতি ধরা ছেড়ে দিয়ে বলল—আবার গাও।

তাপসী ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—তুমি প্রজাপতি ধরছিলে কেন? তোমাকে আর গান শোনাব না।

ছেলেটি মাথা নেড়ে বলল—না—না—বল—বল।

তাপসী ওর অনুরোধ শুনে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল। তারপর ছেলেটিকে বলল—চল, তোমার মায়ের কাছে, আলাপ করিগে।

রমা ছেলেটিকে কোলে নিয়ে এগিয়ে গেল—চলুন।

একটা ইজিচেয়ারে বসে মনমোহনবাবু একখানা বই পড়ছিলেন। মাথায় পাকা চুল—সুন্দর সুস্থ দেহ। মুখেচোখে বার্দ্ধক্য ও বেদনা ক্লিষ্টতা।

রমা বলল—বাবা, সেই তাপসীদি এসেছেন, পরিচয় করতে।

মনমোহনবাবু তাপসীকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন—আসুন। যা রমা, তোর মাকে ডেকে দে।

অনেকদিন এদেশে থাকলেও কথার মধ্যে এখনও পূর্ববঙ্গের টান যায় নি। সেদিকে বরঞ্চ ছেলেমেয়েগুলো অনেকটা সংস্কারমুক্ত। তাপসী নমস্কার জানিয়ে একটা মাদুরের উপর বসল। বলল—রমার মুখে আপনার সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছি।—আপনার দেশ কোথায়?

তাপসীর প্রশ্নে মনমোহনবাবু খাড়া হয়ে বসলেন। বললেন—আমার আদি বাড়ি বরিশাল জেলায়—খাস বরিশালে। অশ্বিনীবাবুর ছাত্র। আমি যে ইস্কুলে পড়ি সেটা তিনিই স্টার্ট করেন। তিনি মহাপুরুষ লোক ছিলেন। তাঁর কাছেই আমার শিক্ষা। আমার বয়স কম নয়—৬৮ বছর পেরুল।

মনমোহনবাবুর বয়সের লঘুতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল

না। তাই কোন তর্কই উঠল না। রমার মা এককাপ চা এনে দিলেন তাপসীকে।

তাপসী সংকোচে কাপটা মনমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিল। —আপনি খান, আমি খেয়ে এসেছি।

প্রস্তাবে তিনিও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—আমি এই মাত্র খেলাম। গরীবের বাড়ি যখন এলেন তখন দয়া করে খেলে আনন্দিতই হ'ব।

লজ্জিত তাপসী রমার মায়ের দিকে তাকাল। এবার ওঁর মুখখানা স্পষ্ট হয়ে উঠল। মেয়েটির বয়স বেশি নয়। বড় জোর ত্রিশ বত্রিশ। বিস্মিত ভাবে তাকাল ওর দিকে। মনমোহনবাবু বিস্মিতভাবে তাপসীকে তাকাতে দেখে হেসে বললেন—কি ভাবছেন ? উনি আমার স্ত্রী—দ্বিতীয়পক্ষের।

লজ্জায় তাপসী কিছু বলতে পারল না। ঢক্ ঢক্ করে চাটা খেয়ে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল। এবার আসি, সন্ধ্যা হয়ে আসছে—এই বলে হন্ হন্ করে একেবারে গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল।

রমাও পিছু পিছু এল। বলল—এখুনই চল্লেন ?

তাপসীর এত তাড়া ছিল না ফেরবার। বরঞ্চ বাড়ির নির্জনতার ভয়েই সে পালিয়ে এসেছে। তাই সে শুধাল—চল না, ওধারে একটু বেড়িয়ে আসিগে।

রমা সানন্দে বলে উঠল—চলুন না তাই।

ওরা দুজনে বিলটার শেষে একটা উঁচু লাল মাটির স্তূপের উপর বসল। লাল মাটিটার চূড়াটায় একটা নিমের গাছ। নিচে কেয়া ফুলের বন, ওধারে বিলের কালো জল। যেন একটা তুলি-আঁকা ছবি।

ক্রমে অন্ধকার হয়ে আসছে। তাপসী নীল আকাশের দিকে তাকাল। কয়েকটা তারা জলজ্বল করছে আকাশে। চাঁদ এখনও ওঠে নি।···কি তিথি কে জানে ?···হয়তো চাঁদই উঠবে না এখন। বিলে যেকটি বক চরছিল একে একে তারা উড়ে গেল। বেলা হ'ল শেষ।···পশ্চিমের আকাশে রক্তচ্ছটা আর নেই।

রমা বলল—এবার চলুন···সন্ধ্যা হয় যে।

তাপসী হেসে বলল—কেন ভয় হচ্ছে বুঝি ? ভয় পাওয়া—এই ভীরুতাকে রমা মেনে নিতে পারল না। মাথা নেড়ে বলল—কক্ষণ না।

—তবে একটু থাক।···এই কেয়াফুলগুলো ফুটছে—কি সুন্দর গন্ধ পাচ্ছ না !

রমা আস্তে আস্তে বলল—পাচ্ছি।

তাপসী ওর অমনোযোগিতাকে লক্ষ্য করে শুধাল—মা কি বকবেন?

রমা বিস্মিতভাবে তাকাল—কেন বকবেন?

—তবে মুখে কথা ফুটছে না কেন?

রমা তাপসীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল—একটা গান শুনান না তাপসীদি।

—গান! হাসল তাপসী।—আচ্ছা শোন।

তাপসী দিবাশেষের অস্পষ্ট অন্ধকারে গান ধরল :

নব নব রূপে এস প্রাণে
এস গন্ধে এস সমীরণে—

গান শেষ হতেই কে প্রশংসা করে উঠল—বাঃ চমৎকার সুন্দর—

তাপসী চমকে উঠল—কে?

রমা ভয় পাওয়ার মতো উঠে দাঁড়াল—চলুন রাত হচ্ছে, এখান থেকে পালাই।

লোকটি কেয়া ঝোঁপের থেকে টর্চের আলো ফেলল রমার মুখের উপর।
—তুমি গলার স্বরটা চিনতে পারছ না রমা?

রমা রাগে লজ্জায় চেঁচিয়ে উঠল—চিনেছি—চিনেছি। তুমি চোর—তুমি লম্পট—নারীর অমূল্য সম্পদ তোমার পণ্য বস্তু।...এখনো তোমায় বলছি, আমার পেছু ছাড়।

লোকটি টর্চের আলো ফেলে ফেলে এগিয়ে এল। একবার তাপসীর মুখের উপর, একবার রমার মুখের উপর টর্চের আলো ফেলে বলল—বাঃ দুটিই চমৎকার—two swans in the garden of cupid...তোমরা আমারই প্রতীক্ষায় না অন্য কেউ আছে বরণীয়?

তাপসী এতক্ষণ রাগে ফুলছিল, বলল—দেখছি পেটে লেখাপড়া কিছু আছে, অথচ...

তাপসীর অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই লোকটি বলে উঠল—কিছু নয়, বিলক্ষণ।...অথচ ভালবাসতে পারছ না এইত?—চেষ্টা করতে হবে। Love is conventional habit—যতই culture করবে ততই Loveএর intensity-extensity বেড়ে যাবে। তখন দেখবে ভালবাসতে পারবে। এখন যদি ভালবাসতে না পার ক্ষতি কি! try—মানে, চেষ্টা কর—

তাপসী রেগে জবাব দিল—আবগারী দোকানে গেলেই পারতেন—Love যদি conventional habit আপনার কাছে?

লোকটি হেসে বলল—তাতে তৃপ্তি কই? ধরাবাঁধার মধ্যে তৃপ্তি নেই। যারা আবগারী দোকানের আওতায় থাকে তারা নেশা করলেও মৃত, যারা হোটেল রেস্তোরায় smuggling করে, লুকিয়ে নেশা করে, তারাই জীবন্ত নেশাখোর।···তাদের নেশা সত্যিকারের প্রসারিত হয়ে ওঠে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রেম—কত বিরাট! কেননা, He cultivated love into conventional habit—তিনি ষোড়শ গোপিণী পরিব্যাপ্ত হয়ে নেশায় এমন মশগুল হয়েছিলেন যে রুক্মীণি-সত্যভামার দল চোখের জল নাকের জলে!

তাপসী যাবার জন্যে উদ্যত হয়ে বলল—আপনার কাছে এখানে প্রেমের কাহিনী শুনতে আসিনি।

লোকটা পকেট থেকে একটা মদের বোতল বের করে খানিকটা চমকে নিয়ে বলল—তবে বোধ হয় প্রেমের কাহিনী রচনা করতে এসেছ?

তাপসী মাতালের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ভেবে রমার হাত ধরে বলল—চল বাড়ি ফিরে যাই।

লোকটি হাত মেলে দাঁড়াল—যেতে নাহি দেব।···তবে তুমি যদি যাবে যাও; কিন্তু রমাকে রেখে যাও। ও আমার অনেক পয়সা খেয়েছে। আজ যখন পেয়েছি একাকিনী অশোক কাননে···তখন ছিপে গেঁথে তুলব।

তাপসী তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল রমার দিকে—সত্যি?

রমা কেঁদে ফেলল—আমাকে নিতে বাধ্য করেছিল, কিন্তু সেজন্যে যে একদিন সত্যই আমার দেহের উপর হাত বাড়াবে পশুর মতো···

তাপসী ধমকে উঠল—তুমি পয়সা নিয়েছিলে কেন?

—বড় অভাব আমাদের। সবইত জানেন। তাছাড়া আমি কোনদিনই হাত পাতিনি। রমা লজ্জায় ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠল। কেঁদে ওর হাত দুটো ধরে বলল—আমাকে বাঁচাও তাপসীদি।

তাপসী কি ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বলল—তুমি যখন কোন অপরাধই করনি, মনে যখন পাপ নেই, তখন ভয় পাও কেন? সুধীরদা হলে বলত:

মরা ইন্দুরেও শিকার করে
তবেত বিড়াল মুখেতে পুরে।

—কিন্তু আমার খেলবার সময় নেই। টলতে টলতে লোকটি এসে রমার হাত দুটো চেপে ধরল—

Sweet heart ! let us beneath the

Blacky sky

Open a blacky life of filthy man

Let us lie.

তাপসী হিংস্র বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। একবার দুজনে সমগ্র শক্তি দিয়ে ঠেলে দিল লোকটিকে পিছনের দিকে। তারপর সেখান থেকে ছুটে নেমে কেয়া বনের মাঝে সরু পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে দৌড়োল। দূর থেকে তারা শুনতে পাচ্ছিল···লোকটি মাটির উপর গড়াতে গড়াতে চীৎকার করে বলে চলেছে—

In a dreadful night

I met an awful mate......

[১২]

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল তখন বেলা অনেকটা। চোখদুটো জ্বলছে। ঘুমের আমেজ তখনও কাটেনি। গত রাতে ঘুম হয়নি—ঘুম যেন আসতেই চাচ্ছিল না চোখে।

কত রাত পর্যন্ত জেগেছিল সে। পড়ে পড়ে ভাবছিল রমার কথা, সুধীরের কথা, বাঁশরীর কথা আর বাউলের কথা। আর একজনের কথাও সে ভাবছিল। ভাবনার মূলে, অনিদ্রার গোড়ায় হ'ল সেই। কিন্তু তাপসী তার নাম জানে না। কে সে? তার মধ্যে সুধীরের সংযত ভোগলিপ্সা নেই, বাঁশরীর নির্লিপ্ত প্রেম নেই, বাউলের আত্মবঞ্চনা নেই।

তার কি আছে আর কি নেই তা সে জানে না। তাপসী তাকে যতটুকু জেনেছে তাতে তাকে Blacksheep ছাড়া আর কিছু বলতে পারবে না। বাউল এসময় থাকলে তাকে শুধাত, এরকম পুরুষকে কোন্ ক্যাটিগোরিতে ফেলা চলে? সে কোথায় চলে গেছে এক ফোঁটা জানিয়েও যায় নি। তাপসীর চোখে জল আসে। সে কি তাকে ভালবাসে না?

তাই কি সে মনে করেছে? কিন্তু জগদীশ্বরও জানেন। তবে কি ভালবাসার মূল্য নেই। সে নিবেদন কি তবে ভগবানের কাছে পৌঁছে না। তার ভালবাসা কি বাউলের কাছেও পৌঁছে নি। তাকে সে বিয়ে করতে পারবে না বলে কি ভুল বুঝেছে? কিন্তু কেন সে বিয়ে করতে অক্ষম তাও আর তার অজানা নেই···।

ঝাপসা হয়ে উঠল তাপসীর চোখ দুটো। কিসের একটা শিহরণে চোখ দুটো আপনিই বুজে এল। দেখল, সম্মুখে নদী। ধু-ধু করছে বালি। তীরে তীরে আম আর পলাশের গাছ। লেজ দুলিয়ে মাঠে চরছে নানা রঙের গাভী। দূর পথে জল নিয়ে চলেছে গ্রামের বধূ।

বালুর উপর হেঁটে হেঁটে চলেছে বাউল।···শুভ্র বেশ···শুভ্র উত্তরীয়। নীচে ধু-ধু করছে বালি—পায়ে পায়ে জ্বলে উঠছে একটু একটু আগুন। তবুও ক্লান্তি নাই, গ্লানি নেই বাউলের। প্রতি পাদক্ষেপে এগিয়ে যায়—আরও আগে। ক্রমে নদী শেষ হ'ল কালো পাহাড়ের গায়ে—তারই মাথায় একটা লাল সূর্য···ডুবছে আস্তে আস্তে অনন্ত কালোর নিচে। তারই ছটায় বাউলের কালো কেশকে রাঙিয়ে তুলল। বাউল তার হাতের একতারাটা তুলে ধরল—তারপর টুং টুং করে একটা ঘা দিল। সুমধুর নিনাদ। গান ধরল বাউল ঃ—

সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার
তুমি হবে চিরসাথী
লও লও হে ক্রোড়পতি
অসীমের পথে জ্বালিয়ে জ্যোতির ধ্রুব তারকা।

হঠাৎ গান থেমে গেল। সূর্য ডুবে গেল। দেখল, বাউলের কাছ থেকে একটু দূরেই কারা পড়ে রয়েছে এক একটা উঁচু পাহাড়ের নিচে। তাপসী তাদের চিনল—দ্রৌপদী, নকুল, ভীম এরা সব। আর একটু এগিয়ে দেখল···কে যেন আগে আগে চলেছে। তাপসী ডাকল—দাঁড়াও পথিক—দাঁড়াও। কিন্তু সে সাড়া দিল না। তাপসী ব্যর্থ হয়ে নিচে ছুটে এল—ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাউল গান গাইছিল। কিন্তু বাউলকেও আর খুঁজে পেল না। দেখল, সেখানে আগুনের লাল আঁখর দিয়ে লেখা রইছে—ম-হা-প্র-স্থা-ন।

মহাপ্রস্থান!—চমকে উঠল তাপসী। উচ্চারণ করতে করতেই আগুনের মতো লাল আঁখর থেকে ঠিকরে পড়ল আগুনের শিখা। চোখ দুটো জলে উঠল···হাত দুটো দিয়ে তাপ বাঁচাতে চোখ দুটো চেপে ধরল।

তাপসীর ঘুম ভেঙে গেল। দেখল, জানালার ফাঁক দিয়ে খানিকটা রোদ চোখে এসে পড়েছে—তারই তেজ।···বেশ বেলা হয়ে গেছে। তবে কি সে স্বপ্ন দেখছিল?···একি স্বপ্ন? মহাপ্রস্থান?—কার মহাপ্রস্থান? স্বপ্নটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।—হাঁ, মহাপ্রস্থান—···বাউলেরই মহাপ্রস্থান···যেন তারই মৃত্যুর অস্পষ্ট ইংগিত।

বুকটা কেঁপে উঠল তাপসীর—স্বপ্ন?—স্বপ্ন?—স্বপ্নই যেন হয়—যদি একান্তই সত্যের আসনে বসতে চায় তাহলে যেন তারই মৃত্যু হয়।···বাউল··· তার যেন কিছু না হয়। মুহূর্তে দুর্ভাবনায় মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তুলল।··· তাই মিথ্যা স্বপ্নের প্রভাব থেকে মুক্তির আশায় হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে গান ধরল।—স্বপ্নশ্রুত রবীন্দ্রসংগীতটাই গলা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঝর্ ঝর্ করে—

সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার···

গানটা যখন থামল তখন নিজেই চমকে উঠল।—কোন ভাব জগৎ থেকে বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ল যেন। দুচোখের জলে দুই গণ্ড ভেঁসে গেছে···চোখ মেললেও দৃষ্টি অবরুদ্ধ। তাপসী সাড়ীর খুঁট দিয়ে ভাল করে মুছে নিল চোখের জলটা। তারপর ভাল করে চোখ মুখ ধুয়ে যখন রান্না ঘরের দিকে এগুল, দেখল, গতরাত্রির সেই অতিথি দাওয়ায় বসে ওর বাবার সঙ্গে গল্প করছে।

তাপসী সোজা রান্না ঘরে এসে দাঁড়াল—মা আমাকে যে বড় জাগাওনি?

মা হেসে বললেন—কেন বেলা হয়ে গেছে বলে বলছিস?

—হাঁ।

মা সস্নেহে বললেন—তুইত রোজই সকাল সকাল উঠিস মা। ভাবলাম যদি তোর শরীর খারাপ হয়ে থাকে। এমনিত তুই বেলা করিসনা কোনদিন। শরীর ভাল ত?

মা তাড়াতাড়ি তাপসীর গায়ে হাত রাখলেন। তাপসী হাসল। বলল—মা। শরীর ভালই। চা দাও।

—দাঁড়া, এইত চা করছি। তাপসীর মা একটি কাপে দুধ আর চিনি দিয়ে একমনে গুলতে লাগলেন।

তাপসী হাসি মুখে ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মা কাপে চা ঢালতে ঢালতে শুধাল—হাসছিস যে?

—আমিত ভাবছিলাম আমাকে ভুলেই গেছ নিশ্চয়। না হলে এত বেলা পর্যন্ত খোঁজ নেই।

সর্বজয়া তাপসীর দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বললেন—আশীর্বাদ করি তোর ছেলে মেয়ে হোক, তখন বুঝতে পারবি ছেলেমেয়েকে মা কেমন ভুলতে পারে।

এই বলে দুকাপ চা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে ঘরে ঢুকতেই তাপসী প্রশ্ন করল—ও লোকটি কে মা?

মা বিস্মিতভাবে তাকালেন—তুই চিনিস না ওকে? তোর নাম করছিল!

তাপসী বলল—ওকে দেখেছি বটে, তবে পরিচয় হয়নি। কে?

—ওর বাবা একজন বড অফিসার ছিলেন। ওদের এখানেই বাড়ি কিন্তু ওরা এখন আর এখানে বাস করে না। রিফিউজী কলোনীর ওধারে পুরোন একখানা বাড়ি। বড় ভাল ছেলে। যা না আলাপ করগে।

তাপসী গম্ভীর ভাবে বলল—তোমার কাছেত সবাই ভাল ছেলে মা।

মা এর উত্তর দেওয়ার আগেই অতিথি রান্না ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল।—তাপসী দেবী আপনার সঙ্গে আলাপ করব বলেই এসেছিলাম কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আপনার কণ্ঠে যে আলাপ শুনলাম তাতে আমি অভিভূত—মানে charmed—

তাপসী নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল। অতিথি ম্লান হেসে বলল—আর কি সম্ভব হবে না?

—সম্ভব! তাপসী ওর মুখের দিকে তাকাল।—নিশ্চয়ই। যদি আপনার ভাল লাগে···আসুন আমার রুমেই বসবেন।

তাপসী হারমোনিয়ামটা হাতে নিয়ে শুধাল—কি গান শুনাব বলুন?

—বরাত দিয়ে গান শুনবার ইচ্ছা থাকলে আপনাকে অনর্থক কষ্ট দিতাম না। আপনার যা ভাল লাগে।

—আচ্ছা তবে শুনুন। তাপসী গান ধরল :

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে
জানিনা তোর বিভাব রতন আছে কিনা রাণীর মতন
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।

তাপসী গান থামিয়ে হাসি মুখে তাকাল—কেমন লাগল গানটা? কি বলে যে ডাকি আপনাকে, ছাই নামটাও জানা নাই।

অতিথি হাসি মুখে বলল—কেন, যে নামটা জেনেছেন তাই বলেই ডাকুন।

তাপসী বিস্মিতভাবে তাকাল ওর দিকে—কই জানলাম! কোন নামটা?

—কেন ব্ল্যাকশীপ—Mr. Blacksheep!

তাপসী হো হো করে হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল—তাই বলেইত জেনেছিলাম। সেজন্য আপনার অন্য নামকরণ করার প্রয়োজন মনে করিনি। কিন্তু এখন যেন মতটা কতকটা পাল্‌টে গেল।

অতিথি হঠাৎ অসংলগ্নভাবে প্রশ্ন করে উঠল—আপনার ভয় করছে না?

তাপসী বিস্মিতভাবে তাকায়—ভয়? ভয় কেন করবে?

—এই যে আমি রয়েছি।···মানে একটা ব্ল্যাকশীপ এর কাছে···আপনি নারী—?

তাপসী দৃঢ়ভাবে বলল—সেই জন্মেইত ভয় নেই। নারী মানুষকে ভয় করবে, sheepকে কেন ভয় করবে? তারাও মানুষের অনুগ্রহার্থী। তাদের সমপর্যায়ে টেনে নিজেকে ছোট করব কেন বলুন?

—তবে সে রাত্রে এমন করে পালিয়ে এলেন কেন?

—হিংস্র পশুকে যেমন ঘৃণায় আশঙ্কায় এরিয়ে চলে।

—কিন্তু আজ?

—আজ Black হলেও Sheep মানুষের করুণার পাত্র।

অতিথি হাসল—কিন্তু কোনটা যে আমার সত্যকার রূপ তাত আপনার জানা নেই তাপসীদেবী। তবে বিশ্বেস করুন গত রাত্রের অনিমেষ আজ নেই। আজ সে যা, তাই তার সত্যকারের পরিচয়। কাল যাকে দেখেছিলেন সে ছিল আমার সৃষ্ট নাটকের ভুমিকায় একজন নায়ক।—Now the play is over—but the Scene or its art is even.

তাপসী হাসল।

জীবনটাইত নাটক। নাটকের মধ্যে কোথাও যদি নাটক হয়ে থাকে সেও নাটক।—তার একটা সত্যি হলে অপরটা মিথ্যা হতে পারে না। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীতে বেঁচে থাকা আমাদের কখনও মিথ্যা হতে পারে না। মানুষের প্রতিটি মুহূর্তই সত্য। গতরাত্রে অভিনয়ের ছলেও যা করেছেন আজ চরিত্রে, সংযমে, জ্ঞানে, মহানুভবতায়, সকল দিক দিয়েই যদি ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চান তবুও গত রজনীর সেই Blacksheep'ও সত্যি আবার আজকের White swan'ও সত্যি।

—কালকের জন্যে ঘৃণা আর আজকের জন্যে প্রীতি, এই দুটোইত এক সঙ্গে আপনার ব্যবহারে সত্যি হতে পারে না।—মানদণ্ডে ওজন হলে দুটো সমান সমান হয়ে শূন্য কিম্বা এর একটা ভারী হয়ে উঠবে এবং আপনার ব্যবহারও তেমনি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই জানতে চাইছি কালকের জ্ঞানটা লঘু করছেন কিনা?

—লঘু? আজ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ আজ দুটোতে কাটাকাটি করে ফল দাঁড়িয়ে হয়তো শূন্যই। এরপর যে কোনটা দানা বাঁধবে সে দায়িত্ব আপনারই—

অতিথি ম্লান হেসে বলল—ভুল করছেন তাপসীদেবী। গত কালেরটা ছিল—an experiment on love, and I was playing in the role of a lover···

তাপসী হেসে বলল—ওসব রোলটোল বুঝিনা, বড় চমৎকার play করেছেন—যেন সত্যই; কিন্তু এইটাই কি Lover এর definition হ'ল?

—কেন কোন ব্যতিক্রম দেখলেন নাকি?

—ব্যতিক্রম যখন করলেনই আপনি। যৌনতা প্রেমিকের অন্তরেও থাকে সত্য কিন্তু প্রেম যত প্রসারিত হয় ততই দৈহিক কামনা নষ্ট হয়।···মন যত বাড়বে দেহ তত কমবে···

—না, তা হয় না তাপসীদেবী। মন আর দেহ দুটো ধর্ম নয়। তাহলে দেহেই মনের আশ্রয় হ'ত না। তাছাড়া মনের অনেক কামনা আছে যা দৈহিক কামনার সঙ্গে সমান তালে কাজ করে যায়। মন ছাড়া দেহ একপাও কাজ করতে পারে না। আবার মন দেহ ছাড়া মিথ্যা। মনের অসৎ প্রবৃত্তি যত প্রবল দেহে তারই চমকে পাশবিকতা তত জাগ্রত। মন যখন জানিয়ে দেয় যৌবন এল,···শিহরণে শিহরণে যৌবন

ফুটে উঠে সারা দেহে। মন যখন বোঝে যৌবন সে হারিয়েছে,—কেশ পলিত হয়ে উঠে,—ইন্দ্রিয় শিথিল হয়ে যায়। মন যখন নারীকে চায় দেহ তখন উন্মাদ হয়ে উঠে।—আবার সৎ প্রবৃত্তির বেলাতেও ঠিক একই। মন যত দরদী, যত স্নেহশীল, করুণাময়, ভক্তিময় ও সৌন্দর্য অভিলাষী হয়ে উঠে, দেহ থেকে ভোগের প্রবৃত্তি তত দূরে চলে যায়। ইন্দ্রিয় স্পর্শে, ঘ্রাণে, শিহরণে কেবল সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে চায়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে উপলব্ধি করবার এক নূতন ইন্দ্রিয় জন্ম নেয়। তখন ফুল ছিঁড়ে ঘ্রাণ নেওয়ার আর প্রয়োজন থাকে না। দূর থেকেই সৌন্দর্য উপলব্ধি করে। নারী তখন আর তার দৃষ্টিতে দেহপুত্তলী নয়, —তখন—নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ নারী—কিন্তু সে মন ত দেহকে বাদ দিয়ে নয়? মন যত সুন্দর হয়ে উঠবে দেহও তত সুন্দর হয়ে উঠবে। —এতটা বলে অনিমেষ থামল।

তাপসী হেসে বলল—তবুও আমার সন্দেহ মিটল না। আমি বলছি নর নারীর প্রেমের কথা।

অনিমেষ আবার আরম্ভ করল—প্রেম? প্রেমের জন্ম আকর্ষণ থেকে। তাই আকর্ষণই হ'ল মূল প্রেম। আদিম যুগে মানুষের জগৎ ছিল পশু সমাজেরই মতো। শুধু দৈহিক আকর্ষণেই তারা মিলত এবং তারই প্রয়োজনে তাকেই কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে শুধু পরস্পরের আকর্ষণ।

তাপসী প্রশ্ন করল—কিন্তু একনিষ্ঠ অবিচলিত অনুরাগ বড়, না দেহের প্রতি দেহের আকর্ষণ বড়? আর কোনটাই বা যথার্থ প্রেম?

—সেটা মানুষের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে তাপসী দেবী। যার আকর্ষণ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত তার কাছে দেহের আকর্ষণ বড় কিন্তু যার মন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে থেকেও ভাবপ্রবণতায় বহিঃর্মুখী তার মন দেহাতীত প্রেমকেই ভাল মনে করবে। এর মধ্যে কোনটা আবার সত্যিকারের প্রেম তা বলা শক্ত। আমার মতে দুটোই প্রেম। যদি একটা ছোলার দানাকে দুভাগ করে—অঙ্কুর আর দানাদুটো আলাদা করে শুধাও কোনটা বীজ তাহলে তার উত্তর দেওয়া যেমন শক্ত এর উত্তর দেওয়াও তেমনি শক্ত। শুধু দেহের আকর্ষণে বেঁচে থাকতে পারে না আবার দেহের আকর্ষণ না থাকলে একনিষ্ঠ অনুরাগ জন্মাতেই পারে না। ইন্দ্রিয়ই ইন্দ্রিয়ের বাইরে পথ দেখিয়ে দেয়, তাপসী দেবী।

তাপসী চিন্তিতভাবে বলল—তাহলে আমাদের সমাজে নরনারীর যে ভালবাসা সেটা কোন ধরণের?

—সংসারে এদুটোর একটাও না। বারাঙ্গনার মিউজিয়ামে যেমন জীয়ান আছে দেহের আদিম আকর্ষণ তেমনি একনিষ্ঠ প্রেম অনুরাগ মহাকাব্যে আর কোন কোন সাহিত্যিকের উপন্যাসে। যেমন দেবদাস উপন্যাসে। প্রেমের degree আছে। সব নরনারীরই জ্ঞানটা এক নয়। তবে বাস্তব জগতে একনিষ্ঠ প্রেম বলতে বুঝব পার্বতী-দেবদাসের প্রেম। কিন্তু ঐ দেহকে অবলম্বন করেই প্রেম যখন ইন্দ্রিয়ের বাইরে যেতে চায় তখন প্রেমিক প্রেমকে সমগ্র মানুষের মধ্যে প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করতে পারে। তখন ত্যাগের মধ্যেই ভোগের স্পৃহা জন্মে। যেমন পথনির্দেশে হেমনলিনী আর গুণীনের প্রেম। সেই প্রেম বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে বৃন্দাবনের মনে। তার মৃত সন্তানকে সে খুঁজে পেয়েছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে।

অনিমেষ চুপ করল।

তাপসী কিছুই বলতে পারল না। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। জানালায় তাপসী অদূরে মাঠের সবুজ ক্ষেতের দিকে তাকাল—বড় সুন্দর ঐ স্বচ্ছ নীলিমা। তাপসীর মনে হ'ল গাছের প্রতিটি ডাল সবুজ পাতায় পাতায় ছেয়ে রয়েছে। সে আর চোখ ফেরাতে পারল না।

অনিমেষ অনেকক্ষণ পরে ডাকল—তাপসী দেবী?

তাপসী চমকে উঠল।

এতক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে বলল—ওহো! আমি ঐ দূরে যেখানে গম আর ছোলার চারায় সবুজ হয়ে উঠেছে সেদিকেই তাকিয়ে ছিলাম সর্বত্রই যেন বিশ্বপ্রেমিকের হাতের পরশ।

অনিমেষ হাসল—তাইত রূপের পূজা। অরূপকে চোখে দেখা যায় না বলে সহজে realise করাও যায় না। আর অসুন্দরের মাঝেও তাঁকে কল্পনা করা শক্ত। তাই যেখানটা শ্রীহীন সেখানে কই এত সহজে তাঁকে অনুভব করা যায় না। তার জন্তে চাই সাধনা। তবে আরম্ভ করতে হবে প্রেম দিয়ে নয়—ভক্তি দিয়ে।

তাপসী প্রশ্ন করল—প্রেম আর ভক্তির মধ্যে পার্থক্য কি?

—পার্থক্য? হাসল অনিমেষ। পার্থক্য মনের। আকর্ষণ থেকে জাগে প্রেম আর ভয় থেকে ভক্তি—না তা ঠিক নয়, তবে যেখানে একজনকে

তাবা যায় Superior, অর্থাৎ মনের inferiority complex থেকে। সূর্যকে-মেঘকে ভয় করতো আদিম মানুষ, কিন্তু যখন মানুষ জানল তারা মানুষের কত মঙ্গলকারী অথচ তারা মানুষের থেকে অনেক শক্তিমান তখন তারা তাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে না পেরে ভক্তি করতে শিখেছে। মানুষ যাকেই নিজের থেকে বেশী গুণবান ও বলশালী মনে করে তাকেই সে ভক্তি করতে পারে—তাই ভক্তি করাটাই সহজ পন্থা। তাই মানুষ যেখানে ভগবানকে প্রেম দিয়ে আপনার করতে পারে না সেখানে ভক্তি দিয়ে আরম্ভ করে। যেদিন সেই ভক্তি প্রেমের দরজায় পৌছে সেদিনই সেই অপরূপ বিশ্বপ্রেমিকের রূপে ধরা দেন।

তাপসী অন্যমনস্কের মতো বলে উঠল—আচ্ছা একটা জিনিস আমাকে বুঝিয়ে দেবেন ?

অনিমেষ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল—বলুন ?

—কোন মেয়ে বা পুরুষ অনেককে ভালবাসতে পারে ?

—এ প্রশ্ন আমাকে না করলেই ভাল হ'ত ? কারণ আমি প্রেমতাত্ত্বিক নই। তবে আমি আমার মতামতটা বলছি—একজন মেয়ে বা পুরুষ অনেককে ভালবাসতে পারে, কিন্তু পরিমাণটা আর ধারাটা এক হয় না। অবশ্য সাধারণ নরনারীর ক্ষেত্রে। যাদের মনে এক অভিন্ন প্রেম জন্ম নেয় তাদের মনে আর প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

—তাহলে পার্থক্য থাকবেই ? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল তাপসী।

অনিমেষ বলল—হাঁ থাকবেই। যদি পাঁচজনকে ভালবাসেন, আলাদা-ভাবে, যদিও পার্থক্য বোঝা শক্ত হয় তবুও একজনই থাকে হৃদয়-আসনের ঠিক মাঝখানে। হেসে বলল—অবশ্য Sometimes old one is replaced by new one.

তাপসী কিন্তু রহস্যে যোগ দিতে পারল না।

—সেটাই কি উচিত না, সে সুস্থ মনের পরিচয় ?

অনিমেষ তাড়াতাড়ি বলল—তা নিশ্চয়ই নয় তাপসী দেবী। একজনকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতে না পারলে কোনদিনই সে মন বিশ্বপ্রেমের দরজায় পৌছতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের উপরে তার আসন হয় না। ক্রমেই সে মন অসুস্থ হতে হতে—ব্যাং কেঁচো, শেষে হলেন বেঙাচি। শেষে আদিমযুগে ফিরে যায়। হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মে নারীর দেবতা স্বামী যারা

গেলে তার স্মৃতিই তার সকল হৃদয় মন জুড়ে থাকবে। যদি কোন মন যদি কোন হৃদয় ব্যর্থ হয় সে-মনে সে-হৃদয়ে অরূপ দেবতার ঠাঁই নেই।

তাপসী কান পেতে বড় বড় চোখ মেলে কথাগুলো শুনছিল। অনিমেষের কথা শেষ হতেই চমকে উঠল। এক ফোঁটা ম্লান হাসি হেসে বলল—বসুন, অনেকক্ত বকলেন এবার একটু চা করি।

—না তাপসী দেবী। অনিমেষ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বেশী চা খাওয়ার অভ্যাস নেই। যদি সম্ভব হয় গরীবের কুটিরে একবার যাবেন। জানেন ত আমার বাড়িটা ঐ—। তাপসী ঘাড় নেড়ে জানাল—যাব। অনিমেষ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিকালবেলায় তাপসী অনিমেষের বাড়ির উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়াল। একটা দুর্নিবার আকর্ষণ যেন টানছে। কিন্তু কেন? অনিমেষের কথাগুলো কি ওর মনে দোলা দিয়েছে? হয়তো তাই। কেমন যেন একটা প্রভাব আছে ওর কথার মধ্যে।

তাপসী কাপড়ের আঁচলাটা কাঁধে ফেলতে ফেলতে রান্না ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। ওর মা চা করছিলেন, তাপসী এসে দাঁড়াতে প্রশ্ন করলেন—কোথাও বেরুবি নাকি?

—হাঁ মা, একবার অনিমেষবাবুর বাড়ি যাব ভাবছি।

ওর মার মুখে কেমন যেন একটা হাসির তড়িৎ খেলে গেল। বললেন—তাই যা, ঘরে একা বসে থেকে কি করবি? চা হয়ে গেছে, খেয়ে যা।

—দাও তাই।

চা খেতে খেতে তাপসী ওর মাকে শুধাল—ভদ্রলোক কি করেন মা?

—এখনও কিছু করেনি কিন্তু করতে কতদিন? বাংলায় এম, এ। ও নাকি বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে রিসার্চ করছে।

—ও তাই!

মা'এর আর কিছু বলার অপেক্ষা না করেই তাপসী বেরিয়ে গেল।

পুরাতন একতলা বাড়ি। বাইরেটা নোনা ধরে গেছে। কোথাও কোথাও গর্ত হয়ে গেছে। প্রবেশ দরজা পর্যন্ত উই-এ খেয়ে শতছিন্ন

করে ফেলেছে। কেউ এতে বাস করে বলে মনে হয় না। কাটলে কাটলে দুএকটা অশ্বত্থগাছ—কয়েকটা বেশ বড় হয়ে গেছে। বাড়িটায় ঢুকতে কেমন ভয় ভয় করতে লাগল তাপসীর। ভাবল—ফিরে যায়। কিন্তু কার যেন ইংগিতে ঢুকে পড়ল। বাইরেটা যে পরিমাণে খারাপ মনে হচ্ছিল ভিতরে সে ঐক্য নেই। সামনের আঙিনা বেশ পরিষ্কার··· গোলাপের কলম আর চন্দ্রমল্লিকার চারায় বেশ সবুজ হয়ে আছে। এখনও ফুল আসতে দেরী আছে। একটা ছোট ছেলে গাছের গোড়ায় জল ঢালছিল। তাপসীকে দেখে ছেলেটি মাথা তুলল—কে?

তাপসী হাসি মুখে বলল—তুমি আমাকে চিনবে না ভাই। বাবু বাড়ি আছেন?

ছেলেটি বিস্মিতভাবে ওর দিকে তাকিয়ে বলল— আছেন।

—বিকেলে বেড়াতে বের হন না?

—না।

—কোথায় তিনি?

ছেলেটি একটি রুমের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ইংগিতে দেখিয়ে দিল।

তাপসী সোজা ভিতরে এসে দাঁড়াল। দেখল, ওপাশের জানালার ধারে বসে অনিমেষ লিখছে। পাশে গাদা গাদা বই ছড়ান। শোবার পালঙ্কের ওপর একগাদা পুঁথি। ওধারের কোণটায় কতকগুলো কাগজ পোড়ান হয়েছে—তারই ছাই সারা ঘরটায় ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার ছায়ায় অল্প অল্প কালো হয়ে উঠেছে ঘরের ভিতরটা। যা আলো তা ঐ জানালার পথে। তাও অনিমেষ আটকে রেখেছে। তাপসী যে এঘরে এসেছে তা সে বুঝতে পারেনি, তাই একমনে লিখে চলেছিল। তাপসী একবার ভাবল —ফিরে যায়। এ সময় থাকলে হয়তো ওর কাজের ক্ষতিই হবে; কিন্তু সত্যই ফেরা আর সম্ভব হ'ল না। ডাকল—অনিমেষ বাবু।

অনিমেষ ঘাড় ফিরে তাকাল। রুক্ষ চুলের গোছা। বড় বড় শুষ্ক চোখ— কেমন যেন অন্য মানুষ।

তাপসী সংকুচিত হয়ে বলল—অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম বোধ হয়?

—তাপসী দেবী! অনিমেষ তাপসীর দিকে তাকাল, বলল—বিরক্ত?

বিরক্ত করতে নয়, বিরক্ত যখন জমে উঠেছিল একটু একটু করে তখন প্রেরণা দিতে ক্লান্তি নাশতে আপনি এসে দাঁড়ালেন। সত্যি বলতে কি Miss Chatterje, I cannot imagine that you will come to the devil's den.

তাপসী অপ্রতিভ হয়ে উঠল, বলল—মাপ করবেন, Mr. Ganguli—আমার ভুল হয়েছিল। আপনার ঘরটার মতো আপনিও পরিচয়ে কুৎসিৎ, কিন্তু ভিতরে devine...

—ভুল করছেন তাপসী দেবী। আপনার এই বিশ্বাসের যোগ্য আমি নই। একটু চা খাবেন? দাঁড়ান একটু। ব্যস্ত হয়ে উঠল অনিমেষ। দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকল—এক কাপ চা করে নিয়ে আয়, বয়।...তারপর আবার নিজের জায়গায় এসে বসল।

তাপসী ওর মাথার দিকে তাকিয়ে বলল—আজ কি স্নান করেননি।

অনিমেষ সংকুচিত হয়ে উঠল, বলল—না আজ আর খেয়াল হয়নি।

—লিখছিলেন বুঝি? খাওয়া হয়েছে ত?

অনিমেষ একবার পালঙ্কের নিচে তাকিয়ে দেখল—এই যা, ভুলে গেছি!

তাপসী হেসে বলল—কি ভুলে গেছেন, খেতে?

—হাঁ। ভাতটা দেখছি ঢাকা দেওয়াই রয়েছে।

—বেশ হয়েছে! তাপসী খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল—খাবারটা দেখে বুঝি খেয়াল হল? পেটের নোটিশ বোর্ডটা কি আর কাজে লাগছে না আপনার?

—কই লাগছে? মানে, লিখছিলাম কিনা। আর বয়টাও আস্ত গাধা। সে বলবে না পর্যন্ত। বয় চা নিয়ে ঘরে ঢুকল।

তাপসী ধমকের সুরে বলল—হ্যাঁরে, খাবারটা যে দিয়ে গেছিস, বলে যাসনি কেন?

বয় প্রতিবাদের সুরে বলল—সে কি? আমি নিজে দুবার স'বকে বলে গেছি—

অনিমেষ ধমক দিয়ে উঠল—তুই যে পিঁপড়ের মতো বলে যাবি কে শুনতে পাবে?

—জোরে বললেও যে বকেন!

—সে আমি বুঝেছি, কিন্তু এক কাপ চা কার জন্যে আনলি?

বয় উত্তর দেওয়ার আগেই অনিমেষ বলল—আপনার জন্তেই—

—আর আপনি? সারাদিনত উপোস আছেন···

—যদি অনুমতি করেন তাহলে প্রতিদিনের নিয়ম মতে এক গ্লাস সোমরস।

—সোমরস! এই খালি পেটে? তাপসী বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

অনিমেষ হাসি মুখে তাকাল—পেটটা ভর্তিই আছে। সাহিত্য রসে উদর পূর্ণ।

তাপসী নিরবে মাথা নত করল। অনিমেষ বয়কে আদেশ করল। —এক বোতল নিয়ে আয় Stupid...

তাপসী মাথা তুলে দৃঢ়স্বরে বলল—না, তা হয় না। চাটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল—বরঞ্চ এখন এটাই খান, আমি আপনার খাবার জোগাড় করছি।

অনিমেষ হাসল, যেন বিদ্রূপের হাসি। বলল—মিথ্যাই আপনি কথা বাড়াচ্ছেন তাপসী দেবী। মদ আমাকে ডাকছে, ডাকছে আমাকে আমার তমসাচ্ছন্ন প্রকৃতি, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ পরশ।

উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই খানিকটা মদ গলায় ঢেলে নিল। তাপসী আস্তে আস্তে দাঁড়াল।

—আমি যাই।

অনিমেষ হাসল—ভয় লাগছে?

—হাঁ, তাই।

—যান Miss Chatterjee, আপনার এখানে না আসাই বোধ হয় ভাল ছিল। আপনি যান। এই বলে আরও খানিকটা মদ গলায় ঢেলে নিল।

তাপসী দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক'দিন পর্যন্ত তাপসীর কেমন করে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল তার কোন হিসাব ছিল না। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন—কোন্ ফাঁকের আনাগোনায় যে সাতটা দিন কাটল তার খেয়াল ছিল না ওর।

চিন্তায় সে যেন সব ভুলেছিল, আবার সব কিছুই ওর চিন্তার মধ্যেই ছিল—সুধীর ছিল, অনিমেষ ছিল, বাউল ছিল। যদিও তারা দূরে—কোথায় কে জানে, কিন্তু তবুও তারা চোখের তারায়।

তার চিন্তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কল্পনার তুলিকায় প্রতিফলিত চিত্রপট।—সুধীর ত্যাগী না ভোগী?…প্রেম তার আদর্শ না জীবন?…অনিমেষ মুক্ত না বদ্ধ? …প্রেমকে কি চিনেছে সে?…বাউল?...দূর বনপথে পাহাড়ের কোলে কোলে ঝরণায় পা ডুবিয়ে নীল আকাশের ছায়ায় ছায়ায় সে কোথায় চলেছে? মুখে না আছে বেদনা না আছে উদ্বেগ। কিন্তু অনিমেষ? …তার মুখে চোখে ফুটে উঠেছে কামনার ব্যর্থতা—বেদনার শুভ্রতা। সুধীরের মুখখানা আশার আলোয় উজ্জ্বল। ব্যর্থতা ওকে স্পর্শ করতে পারেনি।…এমনি খণ্ড খণ্ড কল্পনা, এলোমেলো চিন্তা। তাপসীর কেমন যেন ভাল লাগে চিন্তা করতে—কল্পনায় চিত্রিত করতে।

তাপসীর মা বললেন—ঘরটায় বসে বসে কি ভাবছিস দিনরাত?

তাপসী হেসে বলল—বিষয় ঠিক করে ভাবা যায় না মা। ভাবাই কি ভাববে তার পথ দেখিয়ে দেয়। যদি একবার ভাবতে অভ্যেস কর, দেখবে, এ পথে কোন বাধা নেই, যত খুশি এগিয়ে যাও।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন—যত সব পাগলামি তোর। বসে বসে ভাবার কি আবার অভ্যাস করবি?…তাতে লাভ?—কেন অনিমেষের কাছেও ত গিয়ে বসতে পারিস। দুটো পড়ার কথাও ত আলোচনা করতে পারিস।

তাপসী হেসে বলল—তাত পারতাম এবং জ্ঞানও বাড়ত নিঃসন্দেহে কিন্তু আপাতত আমার ভাবনায় ভাবটা নষ্ট করে দিলে ত? আজ সারাদিনের মুডটা নষ্ট করে দিলে!

ওর মা অপ্রসন্ন মুখে সেখান থেকে চলে গেলেন।

তাপসী আবার ভাবতে লাগল। আনন্দ যেন দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। সেদিনও যখন সে সুধীরদের বাড়ি গিয়েছিল তখন তার মনে কত আনন্দ। সে আনন্দ আর নেই। সে চঞ্চলতাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিসের পরশে? সে বাউলেরই পরশে। যতই সে তার কাছে এসেছে ততই জমাট হয়ে গেছে তার উজ্জ্বল আনন্দ, তার উন্মাদ গতিভঙ্গি। আনন্দ তার হৃদয়ে জমাট বেঁধে ফসিল হয়ে গেছে।

আজ শুধু মনে পড়ে, তার আনন্দ ছিল—সে নাচত, সে গাইত, সে হাসতে হাসতে নিজেই কুটিকুটি হয়ে যেত। তারপর সেই বসন্তের এক স্বপ্নালু মধু যামিনীতে সে এল। অশান্ত যৌবন যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকে দেখল তাকে বরণ করে নিল। গৈরিক বস্ত্রাবৃত সন্ধ্যাকে উষা জানাল গভীর আলিঙ্গন। তাইত যৌবনের সব উত্তাপ শেষ হয়ে গেল, শেষ হ'ল দিবসের চঞ্চলতা।

জন্ম নিল রাত্রির ঘন অন্ধকারময় জীবন। নিজের জীবনটা হাতড়ে মরছে, তবু এক ফোঁটাও পাচ্ছে না সেই হারিয়ে যাওয়া আলো। সব ঢাকা পড়ে গেছে। যে এনেছে এই রাত্রিকে ডেকে তার জীবনে সে নেই। সে সেই সাধককেও ঠাঁই দিতে পারে নি!···কোথায় সেই হীন প্রবাহ? ···কোথায় তার একতারা?···কই, সে সুর ত আর বাজে না?···তাপসী কান পেতে সেই একতারার সুর শুনতে চেষ্টা করে নি একদিন, যা এই গ্রামে যেখানে সুধীরদের বাড়ি সেখানে বেজেছিল এই পৃথিবীরই বুকে! কই না, সুর ত বাজে না? পৃথিবীর শব্দ তরঙ্গে তাপসী কান পাতে,—হাঁ—এবার যেন অস্পষ্ট, দূরে বহুদূরে বাজছে। হয়তো সুধীরের সেই পড়ার ঘরে, না হলে নদীর তীরে সবুজ মাঠের উপর তালপাতার কুটিরে যেখানে একদিন বাউল একান্ত নির্জনে, পরম বিস্ময়ে সে তার একতারা বাজাত ঝন্‌ঝন্ করে। তেমনি সুরে আবার বাজছে। বহুদূর থেকে এসে তার কানে পৌঁছে। ক্রমে যেন একটু স্পষ্ট—আরও—আরও নিকটে। কানের চারিদিকে সেই সুর বেজে উঠল। মনে হল সে যেন আসছে—আরও কাছে—আরও কাছে। জোরে জোরে বেজে উঠল—এবার যেন ঘরের কাছেই। তবে কি সে এল?

তাপসী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল—তুমি এলে?

—হাঁ তাপসী। বাউল দরজায় ঢুকতে ঢুকতে বলল—কিন্তু তোমার চোখে জল কেন?

তাপসী চোখের জল মুছতে মুছতে বলল—আপনি একতারা বাজাচ্ছিলেন ?

—কই না তো ? বিস্মিতভাবে তাকাল বাউল—কে বললে ? আমি ত এইমাত্র আসছি।

ম্লান হেসে তাপসী ওর মুখের দিকে তাকাল—কিন্তু আমি যে শুনলাম ?

—কি শুনলে ?

—যেন বহুদূর থেকে আপনি আপনার একতারাটা বাজাচ্ছেন। তারপর যেন আমার কাছেই আসছেন, শেষে ঝন্‌ঝন্‌ করে আমার কানের কাছে আমার এই ঘরে বেজে উঠল।

ম্লান হেসে বাউল বলল—সে আমার নয় তাপসী। তবে বীণা বেজেছে সত্যি।

—সে তবে কার ? সজল চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

বাউল হেসে বলল—সে তাঁরই, যাঁর বাঁশীর সুর শুনেছিল শ্রীমতী রাধা, বৃন্দা, চন্দ্রাবলী আর সব গোপিণীরা। আজ তুমি তারই তারের ঝঙ্কার শুনেছ।

অবিশ্বাসের সুরে তাপসী বলল—যান, মিথ্যে কথা।

বাউল উদাসভাবে বলল—কি তবে সত্যি, তাই বল ?

—সে আপনিই।

—না তাপসী, সে তিনিই, যিনি অবিরাম মানুষের কানেকানে প্রাণে প্রাণে সেই চিরন্তন সুরের ঢেউ তুলে চলেছেন। তিনি যে প্রেমের গুরু—তিনি যে সুরের গুরু।

—কিন্তু আমি ত তাঁর কথা ভাবিনি, ভেবেছি আপনারই কথা। আপনার সেই একতারাটির কথা।

—তাঁকে আলাদা করে ভাবতে হয় না তাপসী। তাঁকে আলাদা ভাবে realise'ও করতে হয় না। তিনি আমার মধ্যে, তোমার মধ্যে, সকলের মধ্যেই ত রয়েছেন। তাই তাঁকে ধূপধুনা দিয়ে জাগাতে হয় না। একান্তভাবে একটা গাছের কাছেও নিজেকে নিবেদন করলে সে গাছেও তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি যে প্রেমময়। প্রেম যখন সন্দেহের অতীত, দেহের সুখ পার্থিব সুখ কুল মান যশও তাকে সংকীর্ণ করে তুলতে পারে না। পার্থিব মোহের উর্দ্ধে পৌছোলে প্রেমে সঞ্জীবনী শক্তি জন্ম নেয়। প্রাণের দেবতা

প্রেমের দেবতা আপনিই দেখা দেয়। তবে চোখে নয়, সকল ইন্দ্রিয়কে অভিভূত করে, অবচেতনভাবে, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। আর সেই পরমাত্মার বিকাশ ঘটেছে তার প্রাণপ্রিয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণে। প্রেম যত নিষ্প্রাণ তত বহিঃমুখী। যত সংকীর্ণ তত আত্মকেন্দ্রিক। শ্রীরাধা প্রেমে পাগলিনী—দেহ সেখানে তুচ্ছ, সুখ সেখানে ব্যর্থ, আত্ম তখন বিক্ষিপ্ত। শ্রীকৃষ্ণেই তাই তার প্রেমের দেবতা মূর্ত হল। তাঁর বাঁশীতে সে শুনতে পেল সেই পরমপুরুষ ভগবানের চিরন্তন সুর। তখন মান যশ কিছুই তাকে আটকাতে পারল না। কিন্তু বিনিময়ে পেল সে শুধু শতবর্ষব্যাপী বিরহ।

শুনতে শুনতে তাপসীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। বলল—আর আমি?

বাউল তাপসীর দিকে না তাকিয়েই বলে চলল—আর তুমি? তুমিও আজ শুনেছ সেই পরমপুরুষেরই বাঁশীর সুর। তোমার প্রেমও ছড়িয়ে আছে সকল মানুষেই। তাই তুমি নিজের সুখের জন্যে ব্যস্ত নও। তোমার প্রেমের গভীরতায় আমার একতারায় বয়ে এনেছে প্রেমের মন্দাকিনী। সে সুর পাগল করবে তোমাকে। তুমি শুনবে তাঁর বাঁশীর সুর। কিন্তু সে শুধু তোমাকে দূরেই ঠেলে রাখবে। তাপসী আলেয়ার আলোর মতো। সে তোমাকে কাছে টানবে, কিন্তু সে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচবে না। মিলনের আগ্রহে মৃগতৃষ্ণিকার পিছু ছুটবে, কিন্তু সে সুধা পান করা যাবে না। বিরহ শুধু অমর হয়ে থাকবে তোমার প্রেমে··· প্রেমের জগতে।

তাপসী আর্দ্র চোখদুটি মেলে তাকাল।

সে প্রেমে কি আর কেউ থাকবে না?

—সবাই থাকবে, তাপসী। সেদিন আমরা বিশেষ রূপ নিয়ে ইন্দ্রিয়ের কাছে দাঁড়াতে পারব না। তোমার প্রেমে আমরাও গলব। তোমার সে দৃষ্টির কাছে আমরাও ভেঙে চুরমার হয়ে যাব। সেদিন তোমার চোখে সুধীর বাঁশরী বাউল কাউকে চেনা যাবে না। তোমার প্রেমের ধারায় আমরা এক একটি নুড়ির মতো তোমার শীতল স্রোতস্বিনীর নিচে ঝক্‌ঝক্‌ করব।

তাপসী বাউলের কথা শুনে ম্লান হাসল, বিশ্বাস কি অবিশ্বাস সেই জানে। বলল—আর আপনি?

—সেদিন আমার আর প্রয়োজন হবে না।

—কিন্তু আজ যে প্রয়োজন হচ্ছে ?

বাউল হেসে বলল—সে তোমার বিশ্বপ্রেমকে জাগাতে।

তাপসী হেসে বললে—কেন আপনি ছাড়া কি আর পরশমাণিক ছিল না ?

—কই আর ছিল বল! না হলে এ হেন অভাগার মরচে ধরা একতারাটায় সেই সর্বনাশা সুর শুনতে যাবে কেন বল ?—আমি ছাড়া কি আর লোক ছিল না ? তাঁরা হয়তো আর একটু উঁচু ধরণের পরশমাণিক, কিন্তু তাতে ছোঁয়ালে নিজে নিজে সোনা হয়তো হতে, কিন্তু তাতে হৃদয়ের প্রেম গলে প্রেমের মন্দাকিনী হয়তো বইতো না।

শুনে তাপসীর বুক থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। বলল—তা হয়তো হ'ত না। কথাটা বলতে গলাটা কেঁপে উঠল।

বাউল আর কিছুই বলল না। তাপসীও বলল না। নিরবে বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে ছিল—অর্থহীন দৃষ্টি।

বাউল তাপসীর ভাববিহ্বল মুখখানার দিকে তাকাল। বহুদূরে কোথায় যেন ওর দৃষ্টি চলে গেছে। চিন্তা, উদ্বেগ, জ্ঞান, অজ্ঞান কোনও চিহ্ন যেন ও মুখে নেই। এক অখণ্ড নির্লিপ্ত ভাব পরম একাগ্রতা ভাববিহ্বল তন্ময়তা মুখের প্রতিটি রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে। বড় বড় সুন্দর চোখদুটো, পলকহীন যেন তুলিকায় চিত্রিত। এই ধ্যানমগ্না তাপসীকে ডাকতে পারল না বাউল। হৃদয়ের রূপ অন্তরের ঐশ্বর্য তাপসীকে করেছে নয়নে পরম বিস্ময়। বাউল অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওর মুখের দিকে।

তাপসী নিজের দীর্ঘনিঃশ্বাসে নিজে চমকে উঠল। মুখে ফুটে উঠল স্বাভাবিক রূপ। অধরে মৃদু হাসি টেনে বলল—দেখলেন, সব ভুলে গেছি!

তাপসীর বাকিটা বলা হ'ল না।

বাউল হঠাৎ চীৎকার করে উঠল—আহা-আ— !!

তাপসী বিস্মিতভাবে তাকাল—কি হল ?

বাউল মুখে একফোঁটা হাসি টেনে বলল—

ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার

—এ মহাশ্মশানে ভগ্নপরাণে কি গান মাগো গাহিব আর—তাপসী কবিতার বাকিটা বলে হাসল—হঠাৎ তারটা ছিঁড়ে গেল কেন বলুন ত ?

বাউল এর উত্তর না দিয়ে বলল—তাপসী তুমি বড় সুন্দর!

তাপসী হেসে বলল—তাহলে পাত্রী পছন্দ ত? এবার তাহলে একটু মধুরেণ সমাপয়েৎ করি। কিন্তু মধুত নেই—মধু অভাবে গুড়ং দত্তাৎ। নাকি?

বাউল হাসল না। মৃদুভাবে বলল—তাই দাও। কিন্তু তাপসী—

তাপসী চা তৈরী করতে বাইরে যাচ্ছিল, নিজের নাম শুনে ফিরল। —কি বলছেন?

বাউল বিব্রত হয়ে উঠল—হাঁ, কি যেন বলছিলাম!

তাপসী হাসল। বলল—বলুন তাই।

—এই বলছিলাম কি, তুমি যেমন আমার একতারায় সুর শুনেছিলে পরমপুরুষের বাঁশীর সুর, আমিও আর একটু আগে তোমার মুখে পরম প্রকৃতির সৌন্দর্যের ঐশ্বর্যকে যেন স্পষ্ট দেখলাম। বলতে বলতে বাউলের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল।

তাপসী হেসে বলল—আর আমার চোখে প্রত্যয় হ'ল যে ঘুরে ঘুরে শরীরের উপর অত্যাচার করে আপনার Nervous breakdown হয়েছে। আর চা খেয়ে কাজ নেই, একটু দুধ খেয়ে নিন। তারপর স্নান করে সকাল সকাল চারটি ভাত খেয়ে নেবেন।

তাপসীর শেষের কথায় একটা কর্তৃত্বের আদেশই যেন ফুটে উঠল। বলল—একটু বসুন, আমি চট্ করে দুধটা নিয়ে আসছি। এমন করে শরীরটা মাটি করবার অধিকার আপনার নেই।

এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করে তাপসী বেরিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পরে একটা বড় বাটিতে এক বাটি গরম দুধ আর এক ফেনা কলা নিয়ে তাপসী ফিরে এল।

—নিন, খেয়ে নিন।

বাউল উদাসভাবে বলল—আবার ওসব কেন? ওসব নিয়ে যাও। বরঞ্চ একটু চা আন গে।

—আগে এটুকু খেয়ে নিন, চা না হয় করে আনছি।

—না তাপসী, খাবার আর ইচ্ছে নেই আমার।

—কেন খেতে ইচ্ছে যাচ্চে না শুনি? খাননি ত কিছুই।

—তবুও কেন খেতে ইচ্ছে হচ্চে না!

—বুঝেছি। তাপসী মুখ টিপে হাসল।—অভিমান করে যে অভিমানকে

ঠেকাতে চায়, নিজেকে আঘাত দিয়ে যে অন্তকে আঘাত দিতে চায়, এত সেই আপনিই না আর কেউ? ভয় নেই, পছন্দ ত করলেনই এবার কনের হাতের একটু মিষ্টি মুখ করে নিন এখন—

—তোমাকে পছন্দ করাই সার, তাপসী। তুমি যে পাওয়ার অতীত তা আমি জানি। রূপে, গন্ধে, সৌরভে শ্রেষ্ঠ হলেও মানুষের নাগালের বহু উর্দ্ধেই তুমি রয়ে গেছ।

—তবে কি আপনি আর কাউকে দেখে রেখেছেন?

—তার প্রয়োজন হয়নি, তাপসী। আর হবেও না বোধ হয়। ক্ষুধাটাই শুধু নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি একেবারে, মাঝে মাঝে এক আধবার মাথা তোলে। তবে চেষ্টা করব। আমার জীবনের আওতায় টেনে এনে কাউকে কষ্ট দিইনি, আর আজও এমন ইচ্ছা নয় যে কেউ আমার জন্যে কষ্ট পায়। সুখ ত কাউকে কোনদিন দিতে পারিনি। শুধু দুঃখই দিয়েছি; আর ইচ্ছা হয় না আমার জন্যে কেউ দুঃখ পায়। আমার দুঃখ আমারই থাক। চিতাবহ্নির মতো আমাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিক—আমার এই পৃথিবীর মেয়াদ কমিয়ে দিক।—বলতে বলতে বেদনায় কথাগুলো জড়িয়ে এল, চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

—আপনি নারীর থেকেও দুর্বল। সস্নেহে তাপসী বলল—আপনিই একান্তভাবে তাপসীকে ভালবাসেন না, তাপসীও মনে প্রাণে আপনারই। যদি একান্তই বিয়ে না করাই হয়ে ওঠে তাহলেও মন আপনারই পুজো করবে। অভিমানে আপনি দূরে সরে গেলেও আমি যেতে দেব না।

বাউল আর কিছুই বলল না। নিরুত্তরে তাপসীর হাত থেকে দুধের বাটিটা তুলে নিয়ে একচুমুকে পান করে নামিয়ে দিল।

—ঠাণ্ডা হয়ে গেছল।

তাপসী কলাটা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল—ফেরৎ দিলেন না কেন? তাতিয়ে আনতাম। কলাগুলো ছাড়িয়ে বাউলের হাতে দিল—নিন খেয়ে নিন।

বাউল একটা একটা করে ছাড়ান কলাগুলো মুখে পুরে নিল।

তাপসী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধাল—দুধটা ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছল, চা একটু করবো কি?

—না আর থাকগে।

—থাকগে কেন ?

—না, আজ আর প্রয়োজন হবে না। আসল যখন পেয়েছি তখন সুদের নেশায় কেন মরি ?···আজ বড় ভাল লাগছে, তাপসী।

তাপসী আর একটা ছাড়ান কলা মুখে পুরে দিয়ে শুধাল—কেন ?

—মনে হচ্চে আজ যেন আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। এতদিন যেন আমি ছিলাম না। আজ হঠাৎ তোমার স্নেহে. তোমার প্রেমে তোমার স্বীকৃতিতে বেঁচে উঠেছি। তোমার হাতের ছাড়ান কলা তোমারই হাত দিয়ে আমার মুখে উঠেছে। বড় ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, আজ আমি আছি তুমি আছ সকলের মধ্যে, সেই আমি যেন মৃত।

আবেগে বাউল তাপসীর হাতদুটো চেপে ধরল—তাপসী ?

তাপসী মৃদু হাসল। বলল—আমাদের দেহদুটো ভুলে গিয়েও আমরা বেঁচে থাকতে পারি ? এই বলে তাপসী উঠে দাঁড়াল—যাই আপনার জন্তে খাবার জোগাড় করিগে। কদিন ত উপবাসেই কাটিয়ে দিয়েছেন, আজ আবার কেন ?

বাউল ব্যগ্রভাবে বলে উঠল—রাগ করলে না ত ? সত্যই প্রেমের মধ্যে দেহের এ হাতছানি কেন ? তুমি ক্ষমা কর তাপসী।

তাপসী ধমকের দৃষ্টিতে একবার তাকাল বাউলের দিকে। বলল—এ দেহও আপনারই এ কথাটি যেন ভুলবেন না। তাপসী সজল চোখে আর একবার তাকাল বাউলের দিকে, তারপর বেরিয়ে গেল।

দুপুরে বাউল যখন খেতে বসল তাপসী হাত পাখা নিয়ে বসল।

—বড্ড গরম, বাতাস করে দি একটু।

বাউল খেতে খেতে বলল—সেটা শুধু তুমিই প্রমাণ করে দিলে।

—তার অর্থ ? তাপসী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

—অর্থ প্রাঞ্জল। খেতে বসে পাখা খাওয়ার সৌভাগ্য আমার কোনদিনই হয়নি, সেজন্ত সেটা অনুভব করবারও আমার কথা নয়।

—সেটা আপনার সহিষ্ণুতা, না হলে মশায়ের গায়ে ঘাম ঝরতে সুরু করেছিল।

বাউল হেসে বলল—হাঁ, আর একটু হলে বিগলিত হয়ে জল-ফেলা নালি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তোমাদের পিছনের ডোবায় গিয়ে পড়তাম আর কি !

—কিন্তু ভাবে বিগলিত হয়ে এতদিন কার ডোবায় আটকা পড়েছিলেন বলতে পারেন? হঠাৎ তাপসীর কণ্ঠস্বর একটু রূঢ় হয়ে উঠল—আজ থেকে কিন্তু আমার সঙ্গে ছাড়া বেরোন বন্ধ।

—হঠাৎ এমন জোরাল নোটিশ? কৌতুকে ওর দিকে তাকাল বাউল।

—তা বটে বাবা। তাপসীর মা রান্নাঘরে ভাত বাড়তে বাড়তে বলে উঠলেন—তুমি বেরুলেত আর ফিরবার নাম থাকে না বাবা। কোথায় যে ঘুরে বেড়াও তা তুমিই জান; কিন্তু তাপসীকে একা সময় কাটাতে হয়—

বাউল চুপচাপ খেয়ে চলল। কিছুই বলল না। তাপসী প্রশ্ন করল—কোথায় এতদিন ছিলেন?

বাউল একমনে খাচ্ছিল। মাথাতুলে শুধাল—কি বলছিলে?

তাপসী হেসে বলল—শুনতে পেলেন না বুঝি? কোথায় গেছলেন? বাঁশরীর সঙ্গে বসে বাঁশী বাজাচ্ছিলেন বুঝি?

বাউল মাথা নত করেই জবাব দিল—বাঁশরী আজকাল আর বাঁশী বাজাচ্ছে না। কুরুক্ষেত্র বাধাবার মতলবে আছে।

—আর আপনি কি সেই War marketএ হাড় চালান দেওয়ার মতলবে ফিরছেন?

—আজ্ঞে না। আমি রথে চেপে পার্থের আসন জোড়া করে বসার মতলবে আছি।

তাপসী হেসে বলল—তবে অনুমান মিথ্যা নহে মোর
বংশী বাদন সহ মিলিছে বাউল।

—বংশীবাদন বাজাচ্ছে বাঁশী, আর বাউল বাজাচ্ছে তার একতারা, আর তার সুমিষ্ট সুর শ্রীমতী তাপসী ঘরে বসে শুনছে। এই বলে বাউল তাপসীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।—গবি কবির মিল হবে কেন, তাই তোমার কবিতাটা পাছে অসুরের কবলে সুরহারা ছন্দহীন হয়ে পড়ে তাই বাকিটুকু আমি গদ্যময় করে তুললাম—

তাপসী হেসে বলল—বেশত করলেন। আর কিছু নেবেন?…ভাতগুলো যে পড়েই রইল। দাঁড়ান একটু দুধ এনে দিই।

বাউল বিব্রত হয়ে উঠল। বলল—থাক তাপসী, আর খেতে পারব না।

তাপসীর মা একবাটি দুধ এনে দিয়ে বলল—দুধ দিয়ে চারটি খেয়ে নাও বাবা, কদিন ত খাওয়াই হয়নি তোমার।

—আর খেতে পারব না, মা। অনেক খাওয়া হয়ে গেছে। তাপসীর মা আপত্তি অগ্রাহ্য করে দুধটা নামিয়ে রেখে রান্নাঘরে চলে গেলেন।

বাউল তাপসীর দিকে তাকিয়ে বলল—আর খেতে পারব না তাপসী। এরপর খাওয়ালে খাওয়ানর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমার উপর অত্যাচারই করা হবে বোধ হয়।

তাপসী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল। বাউল বলল—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ?

—তবে দুধটুকু খেয়ে নিন। বাউল দুধটুকু চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তাপসী রহস্য করে বলল—গন্ধময় লোকের আহার বিষয়ে পন্থের প্রভাবই বেশী দেখছি।

বাউল কিছুই বলল না। তাপসীর হাত থেকে পানটা নিয়ে আপনার নির্দিষ্ট কক্ষে এসে দাঁড়াল। পরিষ্কার বিছানা বিছান রয়েছে। সর্বত্র একটা সৌন্দর্য, আরাম আর শ্রী। বিছানায় বসে বাউল কেমন যেন একটা আরাম বোধ করল, কেমন যেন সুস্থতা, একটা তৃপ্তির ভাব।

কদিন ঘুরে ঘুরেই কেটে গেছে, এমন আরাম করে বসতেই পায়নি। আর এমন একান্ত আপনার বলে কোন আশ্রয়কে গ্রহণ করতেও পারেনি।··· বাঁশরী তাকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়েছে, রাত্রি জাগিয়েছে, একজন অকর্মণ্যকে কর্মের ব্রতে দীক্ষিত করেছে। কিন্তু যখন সে কাজে কাজে ঘুরে ফিরেছে বাঁশরীর সঙ্গে তখন সে আবার আরামের অভাবই বোঝে নি। আরাম বলে যে একটা বস্তু আছে, তৃপ্তি বলে যে একটা ভাব আছে সে তাপসীর এই আশ্রমে আসবার আগে কল্পনাও করে নি, অভাব বোধও করে নি।

বাউলের মনে পড়ে, এই সাতদিনে সে কত কাজই করেছে। একটা আত্মতৃপ্তি সারা জীবনের কৈফিয়ৎ। এম,এ পাস করেছে কিন্তু তার ফলে কারও ত কল্যাণ হয়নি ?···বাউল হয়ে নির্জন প্রান্তরে কতদিনই ত একতারার সুরের আলাপ করেছে, আর মনকে ত্যাগের মধ্যে চলতে শিখিয়েছে। কই তাতেও তো কারো কল্যাণ হয়নি ? তাই ওপথে বৈচিত্র্য নেই। ও পথ তাকে ছাড়তে হয়েছে। কিন্তু বাঁশরী যে পথের সন্ধান দিয়েছে সে পথে কত বৈচিত্র্য কত আনন্দ কত বেদনা কত দুঃখ—কত ক্লান্তি কত মাধুর্য কত মমতা কত ত্যাগ!—সমগ্র জগৎ জুড়ে আপনার স্বার্থ আপনার অস্তিত্ব আপনার সমাজ। কিন্তু যার শাখায় এত সব তার মূলে উপনিষদ নেই, সাংখ্য

নেই, দর্শন নেই—আছে একখানি হোমিওপ্যাথি বই, একবাক্স ঔষধ, আর প্রাণের পরশ। তাই সেও প্রাণের ছোঁয়া পেয়েছে প্রাণের সন্ধান পেয়েছে আবার প্রাণে বাঁচতেও শিখেছে। ছিলিমগাঁ কতদূর এখান থেকে?···এখানের মানুষের সঙ্গে ওখানের মানুষের দেখাশুনাও হয় না, চক্ষুলজ্জাও নেই, প্রীতিও নেই, ঋণজ্ঞাও নেই।

বাউল সেদিন বেড়াতে গিয়ে শুনল, বাঁশরী ছিলিমগাঁ যাচ্চে।—ঔষধের বাক্স, বই আর জিনিসপত্র নিয়ে তৈরী। তাকে দেখে হেসে বলল—বাউল এলে! কিন্তু আমি যে ছিলিমগাঁ যাচ্ছি।

বাউল বলল—আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

বাঁশরী হেসে বলল—সে কি এখানে! অনেক দূর। আবার কদিন না ফেরা হয়।

বাউল বলল—তাহলে এখানে তোমার রোগীরা হাঁপিয়ে মরবে। ঔষধ, বই সবই ত নিয়ে যাচ্চ, ব্যাপার কি? আত্মীয় বাড়ি?

বাঁশরী হাসি মুখে বলল—না ভাই। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল। উদাস ভাবে বলল—আত্মীয় বাড়িই বটে। রোগীরা চিকিৎসকের আত্মীয়ই। একটু হেসে আবার বলল—হয়তো কিছুদিন দেরী হয়ে যাবে সেখানে। এদের বড় কষ্ট হবে। যদি তুমি ওষুধ দিতে জানতে তাহলে তোমাকে এখানের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারতাম। ছলছল করে উঠল তার চোখ।

বাউল আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল—সেখানে কি দেরী হবার সম্ভাবনা?

বাঁশরী শান্তভাবে বলল—দেরী বৈকী ভাই, ওখানে Epidemic doseএ কলেরা হচ্ছে। কাজেই···।

বাউল ভীতভাবে বলল—কলেরা হচ্ছে? তুমি যাবে?

—কেন যাবনা ভাই? তা না হলে চিকিৎসা শাস্ত্রটাই মিথ্যে—

বাউল কি ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল—আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

বাঁশরী হাসল। বলল—কেন? তোমার মতলবটা হঠাৎ পালটে গেল?

বাউল গম্ভীর ভাবে বলল—আমার মতলব কবে আর স্থির ছিল বাঁশরী? আমার মতলব পাল্টাতে পাল্টাতেই এখানে এনে ফেলেছে। আজ যদি হঠাৎ আর একটুকু পাল্টে যায় তাহলে দোষ কি?

—তা হয় না। তবে মিছেমিছি গিয়ে কি করবে?

—ঔষধ দিতে না পারি সেবা ত করতে পারব! তোমার কাছে থেকে

ঔষধ দেওয়াটাও ত শিখতে পারব যাতে ভবিষ্যতে তোমার সাহায্য করতে পারি।

বাঁশরী হাসিমুখে বলল—তবে চল। কিন্তু তাপসীর অনুমতির বোধ হয় প্রয়োজন ছিল।

—জানাবার হয়তো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অনুমতির দরকার হবে না—আর দিতও না। তোমার মায়ের অনুমোদন সাপেক্ষ হলে তুমিও অনুমতি পেতে না তাঁর কাছে।

—তবে চল।

সেখানের অভিজ্ঞতাটুকুই তার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। জীবনের নূতন অধ্যায়। যেখানে পাশের বাড়ির লোকে খোঁজ নেয় না, হাতুড়ে ডাক্তার ভয়ে আসে না—বহুদূরের পাশকরা ডাক্তার আনবার সুযোগ থাকে না বা সামর্থ্যে কুলোয় না, সেখানে যখন একদিন বাঁশরী আর বাউল অযাচিতভাবে ঔষধের বাক্স হাতে নিয়ে দাঁড়াল তখন ওরা পরম বিস্ময়ে তাকাল ওদের দিকে। হয়ত ভাবল, এরা পাগল না দেবতা! তারপর শুরু হ'ল রোগের সঙ্গে যুদ্ধ।

বাঁশরীকে এক কাপ জলে এক ফোঁটা ঔষধ দিতে দেখে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের গৃহিনী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন,—না বাপু তুমি ডাক্তার মিক্‌চার আনগে। একবাটি জলে এক ফোঁটা জলের মতো ওষুধ, ওতে কখন এতবড় রোগ ভাল হয়?

সত্যই ভাল হয় না। প্রথম caseটাই fatal হয়ে গেল। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। কার জন্যে কখন পরপারের ডাক আসে! ডাক্তারদের কাছে ডাক যায়, তারা বাড়ি থেকে ঔষধ দেয়; কিন্তু কাজ হয় না। মৃত্যু সংখ্যা—১—২—৩—রোগী অনেক ঘরেই। মানুষের চোখে মুখে মৃত্যুর আতঙ্ক।

বাউল বলল—তোমার ছোট শিশির এক ফোঁটা ঔষধ বাঁচাতে পারবে?

—তোমারও কি সন্দেহ হচ্চে?

—না। তবে প্রথম রোগীইত তোমার মরল!

—কিন্তু মিক্‌চার খেয়েও তো আগে দুটো মরেছে—এখন দুটো মরল।

বাউল হেসে বলল—তাহলে বল যারা মরবে না তারাই বাঁচবে।

—হয়তো তাই। কিন্তু যারা বাঁচবে না তারা হয়তো এদের মতো এক ফোঁটা ঔষধকে বিশ্বাসও করবে না, খাবেও না।

—কিন্তু যে খেল সেও ত গেল ?

—সে তাদের বিশ্বাস নেই বলে। বিশ্বাস না করলে সর্বশক্তিমানই শক্তিহীন হয়। আর সামান্য একফোঁটা ঔষধের কি শক্তি যে অবিশ্বাসের উপর মাথা তুলবে ?

—সে বিশ্বাস যদি এদের না থাকে ?

—তাহলেও কাজ করবে। অবিশ্বাস না থাকলেই হ'ল। তাছাড়া আমারও ত একটা বিশ্বাস আছে, ইচ্ছা আছে, তারও ত একটা প্রভাব আছে।

বাউল হেসে বলল—তখন তোমার বিশ্বাসটা কোথায় ছিল ?

—সন্দেহের দোলায়, ঔষধ Selectionটা ঠিক হচ্ছে কিনা !

—তাহলে বল, বিশ্বাসই বড়।

—হাঁ, আমি তাই মনে করি।

—বিশ্বাস থাকলে জল দিয়ে আরোগ্য করা যায় ?

—নিশ্চয়ই যায়। কিন্তু জলে ত আর আমাদের মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে না, যদি কোনদিন রোগী ও চিকিৎসকের উভয়েরই বিশ্বাস জন্মে সেদিন রোগ আরোগ্যও হবে। Hydropathic চিকিৎসা ত তাই-ই।

কিন্তু বেশী অগ্রাহ্য করতে পারে না ওরা। বিশ্বাসেই হোক আর অবিশ্বাসেই হোক আবার ওর ডাক এল। যার ঘরে রোগ ঢোকে সে ঘরে কেউ যায় না। ঘরের লোকই ভয় করে, আশঙ্কা করে, অভিভূত হয়ে পড়ে। রোগীর যত্ন হয় না।

বাঁশরী এক ফোঁটা ঔষধ খাইয়ে দিয়ে বলল—বাউল এবার তোমার কাজ কর। এদের উপর ভরসা করলে ঔষধে গুণ ধরবে না।

তারপর নিজেই সমস্ত পরিষ্কার করে পরিষ্কার বিছানায় শুইয়ে ১৫ মিঃ অন্তর দুদাগ ঔষধ খাইয়ে দিল। রোগী তন্দ্রাভিভূত হয়ে উঠল।

বাঁশরী বলল—ওকে ১৫ মিঃ অন্তর ঔষধ দেবে। ঘুমিয়ে গেলে জাগিও না। বাহ্য করলে পরিষ্কার করবে। আর একটা কথা, এবাড়ির কেউ যেন কঠোর স্বাস্থ্যনীতির একটিও লঙ্ঘন না করে, খালি পেটে না থাকে আর রোগীকে ডেকে না জাগিয়ে দেয়।

বাউল শুধাল—কি দিলে?

বাঁশরী হেসে বলল—কেন, শিখবে? ভাল। তাহলে আমার অনেক সাহায্য হবে। Aconite Nap IX দিলাম। প্রথম কেসটায় Campher দিয়ে ভুল করেছিলাম। সাধারণতঃ এক এক বছর এক বিশেষ ধরণের কলেরা হয়। এবারের লক্ষণ Aconiteএর। হঠাৎ হচ্চে এবং দেখতে দেখতে বেড়ে যাচ্ছে। নাড়ি দ্রুত। তাছাড়া আরও লক্ষণ আছে, পরে বলব।

তারপর গেল অন্ত ঘরে। সেখানেও সেই একই নিয়ম। ঔষধ দেওয়া, বাড়িতে সাহস দেওয়া, রোগীর সেবা করা।

চারটা দিন এমনি ব্যস্ততার মধ্যেই কেটে গেল। খাবার পর্যন্ত সময় ছিল না বাঁশরীর। রাত্রি জেগে কাটাত, কিন্তু কোন ক্লান্তি ছিল না মনে। যেন যন্ত্রের মত কাজ। শেষে রোগ ভাল হ'ল। প্রায় পঞ্চাশ জন রোগী সেরে উঠল।

কিন্তু আরও একটি রোগীকে বাঁচান গেল না। একটি ৩০।৩১ বছরের মেয়েকে। কত আগ্রহ তার বাঁচবার। কচি সংসার। ছোট মেয়েটি সজল চোখে বার বার এসে দাঁড়ায়—মা কখন ভাল হবি?

রোগ শয্যায় পড়ে পড়েও সে মেয়েকে সান্ত্বনা দেয়—এই যে মা ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলেন—এই এক্ষুণি ভাল হ'য়ে যাব।

মেয়েটিকে সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। সময় গড়িয়ে চলে, কিন্তু রোগের উপশম হয় না। যন্ত্রণায় চীৎকার করে মেয়েটি। বাঁশরী চিন্তিত হয়ে ওঠে। বাউল দু'হাতে সব পরিষ্কার করে। চোখে নিদ্রা নেই পেটে অন্ন নেই। ছোট মেয়েটি আবার নাকি সুরে অভিযোগ জানায় ওর মার কাছে—মা তুই ভাল হবি না?

ওর মা সত্যই ভাল হ ল না। শেষ রাত্রে গেল মারা।

কান্নার রোল উঠল ঘরে। যখন দেহটা তুলে নিয়ে শ্মশানে চলল ছোট মেয়েটা কেঁদে পড়ল পায়ে—ওগো আমার মাকে নিয়ে যেও না গো—

বাঁশরীর পায়ে পড়ল—ডাক্তারবাবু গো আমার মাকে ভাল করে দাও গো—

বাঁশরীর চোখ ছলছল করে উঠল। দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। মেয়েটিকে তুলে নিয়ে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরল, বলল—কেঁদনা মা, তোমাকে খেলবার জন্তে এই শিশিটা দিলাম।

মেয়েটি ছুঁড়ে ফেলে দিল—না, আমার মাকে ভাল করে দাও।

বাঁশরী নিজেকে সামান্ত সামলে নিয়ে বলল—তোমার মাকে বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। ভাল হয়ে আবার আসবে।...কাঁদছ কেন?

খানিকটা হয়তো বিশ্বাস করে, খানিকটা হয়তো নিরুপায় হয়েই সে চুপ করল।

কিন্তু গ্রাম আরোগ্য হ'ল।

বাঁশরী ওদের কাছে জানাল—এবার ফিরে যাব।

তারা সভয়ে বলল—আবার যদি হয়?

বাঁশরী উপদেশের সুরে বলল—এখনও জল ফুটিয়ে খাবে আর এই ঔষধটা দিয়ে যাচ্ছি যদি একান্তই কলেরা হয় ১৫ মিঃ অন্তর এককৌটা জলের সঙ্গে খাওয়াবে এবং দরকার হলে আমার কাছে লোক পাঠাবে। আমি আবার আসব। প্রসন্ন মুখে ওরা ছেড়ে দিল।

বাউল বাঁশরীকে শুধিয়েছিল, তোমার শেষের রোগীটা মরল কেন? বিশ্বাস তো উভয় পক্ষের যথেষ্ট ছিল।

বাঁশরী বলেছিল—কিন্তু আমার বিশ্বাসে গলদ ছিল, ভুল ছিল, ত্রুটি ছিল। আমার সে বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে এখন। এক এক বছর একটা বিশেষ ধরণের কলেরা হলেও যে স্বতন্ত্র Typeএর এক আধটা হতে পারে সে জ্ঞান আমার ছিল না। এ মেয়েটির রোগের Courseটা ছিল অন্ত Typeএর। সামান্ত পেটের পীড়ার থেকে সূত্রপাত হয়ে আস্তে আস্তে কলেরার form নিয়েছিল। সময়ে যদি Padophilanine দিতাম তাহলে মনে হয় সুফলই হ'ত।

বাউল আর কিছু বলে নি।

এমনি অনেক কথাই মনে পড়ে বাউলের। বাঁশরীর সত্যকারের রূপ সে দেখেছে। কি সুন্দর ওর রূপ। বাঁশরীর কথা ভাবতে ভাবতে আর একজনের কথা মনে পড়ে যার রূপ প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য তার হয়নি—সেই দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের কথা। এমনি একজনকে দেখবার মতো সুযোগ না হলে হৃদয়ে যে কি তা ধারণা করা যায় না। শ্রদ্ধা হয় বাঁশরীর উপর। শ্রদ্ধা হয় জীবনের উপর।...বাঁচবার ইচ্ছা হয়। ভগবান যদি

বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে সে বাঁশরীরীরই পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। প্রাণকে সে অনুভব করবে—এমনি এলোমেলো অনেক চিন্তাই বাউলের মাথায় আসে। সত্যই সে শ্রীকৃষ্ণ—সে সারথি। বাঁশী সে ছেড়েছে। তবে কুরুক্ষেত্রে নয়, কর্মক্ষেত্রে সে এসে দাঁড়িয়েছে। আর ক্লীব বাউল।—সে পার্থ। সে মানুষের দুঃখ, বেদনা, রোগ, জরা দেখে ভয় পেয়েছিল—সমাজ থেকে দূরে এক পর্ণ কুটিরে বসে একতারায় সুর দিয়েছিল। কিন্তু এমন সময় বেজে উঠল শঙ্খ।

ছিলিমপুর গ্রামের গীতা পাঠ করে বাঁশরী—Revealed the greatest philosophy of Karmayoga—philosophy of this age of sufferring.

উত্তেজনায় ধড়মড় করে বাউল উঠে বসল বিছানায়। কর্মের ডাক সে শুনছে। আরামের শয্যা আর তার ভাল লাগছে না। বিছানায় বসে বসে কি ভাবল। তারপর জানালার কাছে উঠে এসে দাঁড়াল। কপাট দুটো ফাঁক করে তাকাল দূরের মাঠের দিকে। দেখল, কোথাও এক ফোঁটা আলো নেই। দিনের আলো শেষ হয়ে গেছে। একটি কালো ছায়া পৃথিবীতে অস্পষ্টভাবে নেমে আসছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বাউলের চোখ দুটো বেয়ে জল এল। কিন্তু বাউলের খেয়াল ছিল না।—সে একই ভাবে তাকিয়ে ছিল।

[১৪]

সেদিন বিকাল বেলায় তাপসী চা নিয়ে বাউলের রুমে ঢুকল। বাউল হাত বাড়িয়ে চাটা নিল, তারপর তাপসীর দিকে তাকিয়ে হাসল।

তাপসী প্রশ্ন করল—হাসছেন যে বড় ?

আর কতদিন তোমার নজরবন্দী হয়ে থাকব—আজ তিন দিন হ'ল।

তাপসী হেসে বলল—বেড়াতে যাবার তো নিষেধ নেই। ইচ্ছে করলে বেড়াতে যেতে পারেন। অবশ্য আমার সঙ্গে।

বাউল বলল—কি করে জানব বল। গলায় দড়ি দেখেই নিরীহ পোষ মানাটির মতো খুঁটোর উপর মাথা রেখে ভাবছি আমি বন্দী। খেয়াল হয়নি দড়িটা লম্বা, দড়াবাঁধ আছে—চরলেও চরতে পারি আশেপাশে।

তাপসী একবার তাকাল বাউলের দিকে। তারপর বলল—কি করি বলুন? এই বাঁধনটুকু না দেখালে যে একদিন হাতের নাগালের বাইরে চলে যাবেন। হয়তো আর দেখাই হবে না।

আর্দ্র হয়ে উঠল গলার স্বর। একটু থেমে আবার বলল—চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি।

বাউল শুধাল—কোথায় যাবে?

তাপসী হেসে বলল—আর যেখানেই যাই বাঁশরীর কাছে যাব না।

বাউল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল—কেন?

—ওকেই ত ভয়। আর ওর ভয়েই ত আপানাকে নজরবন্দী করে রেখেছি। ওই ত দমকা ঝোড়ো হাওয়ার মত আপনাকে দূরে টেনে নিয়ে যায়।

বাউল বিষণ্ণ মুখে বলল—কিন্তু আমাকে যেতেই হবে তাপসী। তার সঙ্গে একবার দেখা করা চাই।

—কেন?

—তুমি কি আমাকে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে বল না?

—আপনার কি তাই ধারণা? যদি ওর সঙ্গে দেখা না করলে মৃত্যু মনে করেন তাহলে বাধা দেব না। আপনি যান, আমার ভাগ্যে যা হয় হবে।

—রাগ করলে তাপসী? কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নিয়েই ত যাব।

তাপসী অপ্রসন্ন মুখে বলল—না আমি যাব না। আপনি একাই যান। যে বাঁধন আপনার জীবনকে বাঁচাতে পারে না সে বাঁধনে আমি আপনাকে বাঁধতে চাই না। আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম। এই বলে তাপসী আর উত্তরের অপেক্ষা না করে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

বাউল ডাকল—তাপসী?

কিন্তু সে সাড়া দিল না।

অনেকক্ষণ কেটে গেল কিন্তু তাপসী ফিরল না। বাউল সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে বসে ঘামতে লাগল। তবুও তাপসী আর একবার এল না। কিন্তু বাউলকে যে যেতেই হবে। এই তিন দিনে জগতে কি ঘটেছে কে

জানে ?...বাঁশরী এখন কোথায় ? হয়তো আবার কোথাও ডাক আসতে পারে! ছিলিমপুরের অবস্থা কেমন কে জানে ? কে জানে সেখান থেকে খবর এল নাকি ?—চিন্তা করতে করতে মনটা ছটফট করে উঠল...না আর অপেক্ষা করা যায় না। বাউল উঠে দাঁড়াল। এখনই ফিরে আসবে—হয়তো তাপসী জানতেই পারবে না যে সে বেরিয়েছিল। আর জানতেই বা পারল ? সে ত অনুমতি দিয়েছে। তবু যেন একবার দেখা হ'লে ভাল হ'ত—আর একবার অনুরোধ করতো সংগে যাবার জন্তে। কয়েকবার ইতস্তত: করল বাউল ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেরুতেই হ'ল।

যখন বাঁশরীর বাড়ি পৌঁছল বাঁশরী তখন জিনিসপত্র গোছাচ্ছে, সামনে দাঁড়িয়ে কালো মত একজন লোক।

বাউল ঘরে ঢুকেই বিস্ময়ে বলে উঠল—আবার কোথায় যাচ্চ বাঁশরী ? ছিলিমপুর থেকে কি কোন খবর পেয়েছ ?

বাঁশরী একবার বাড়ির ভিতরের দিকে তাকাল, তারপর মোটটা লোকটার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বলল—না খবর কিছু পাই নি, তবে মনে হয় ভালই। কেন তুমি খবর পেলে কি ?

না।—একটু থেমে বাউল আবার প্রশ্ন করল—কিন্তু তুমি কোথায় চলেছ বাঁশরী ?

এবার সেই লোকটি বলল—আমাদের গেরামে যাচ্চেন। ওখানে ব্যামো হচ্চে।

—ব্যামো ? বিস্মিতভাবে তাকাল বাউল বাঁশরীর দিকে।

বাঁশরী ম্লান হেসে বলল—হাঁ বন্ধু, ওখানে কলেরা হচ্চে।

—কবে থেকে আরম্ভ হয়েছে ?

—আজ ভোরেই।—এরা আমাকে চেনে। এদের গ্রাম বেণীপুর নয়, ঘণ্টা তিনচার-এর রাস্তা।

—কিন্তু আমাকে খবর না দিয়ে তুমি একাই চলেছ ?

বাঁশরী হেসে বলল—বন্দীকে খবর দিয়ে ফল কি বল ? আজ তিন দিন তোমার দেখা নেই। বুঝলাম, রাই তোমাকে চাবিবদ্ধ করে রেখেছে নিশ্চয়ই। আর রাখবেইত, মা এখানে থাকলে কি আমাকেই যেতে দিত ভাবছ ?

—কিন্তু তবুও ত তুমি যাচ্চ। তেমনি আমিও যাব।

—কিন্তু তুমি যে—বিস্মিতভাবে তাকাল বাঁশরী—না তা হয় না বন্ধু! রাই তাহ'লে আর রক্ষে রাখবে না।

—ওসব ছাড় বন্ধু, আমিও যাব। তুমি অনুমতি না দিলেও আমি তোমার পিছুপিছু যাব।

বাঁশরী ক্ষুণ্ণ মনে বলল—এবার না গেলেই ভাল ছিল। এখানে যেমন শুনছি খুব সম্ভব Asiatic কলেরা। তাছাড়া তাপসীও আঘাত পাবে মনে। কেন যেন তোমাকে নিতে সাহস হচ্ছে না আমার বন্ধু।

—মৃত্যু যদি থাকে তাহলে এখানেও সে এগিয়ে আসবে। আর Asiaticএর ভয় দেখিও না—তুমি নিজে যার ভয় কর না তার মিথ্যা ভয় আমাকে দেখিও না। আমি যাবই—

লোকটি তাড়া দিল—বাবু চলুন তাড়াতাড়ি—

—হাঁ চল। দরজায় তালা লাগিয়ে বাঁশরী বেরিয়ে পড়ল।—এবার চল। চল যাত্রা করা যাক। মিথ্যে রাত বাড়িয়ে লাভ নেই। রোগীদের মুখে ঔষধ পড়বে না।

—চলুন। মাথায় মোট নিয়ে আগে আগে পথ দেখিয়ে লোকটি চলল—এরা দুজনে তাকে অনুসরণ ক'রে মেঠো পথ ধরে এগিয়ে চলল।

আঁকাবাঁকা পথ—হেথায় সেথায় ঝোঁপঝাড়। দু একটা শিয়াল শিয়াকুলের ঝোঁপে বসে কুল খাচ্চে। একফোঁটা চাঁদের সামান্য আলো। ঝিরঝিরে বাতাস। বেশ সুন্দর লাগে ওর পরশখানি। বাঁশরী দ্রুতপদে পা ফেলে, কিন্তু বাউল ওর সঙ্গে চলতে পারে না। বাতাসের পরশ, চাঁদের আলো, আকাশের নীলিমা ক্ষণেক বসে নিমন্ত্রণ জানায়। তবু বসা হয় না।

একটা গ্রামে পৌঁছে বাউল শুধাল—এটা কি গ্রাম?

—দোলাপুর। একবার দাঁড়িয়ে লোকটি এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলে। আবার চলতে শুরু করল।

বাঁশরী হেসে বলল—আর ভয় নেই—ঐ সামনের মাঠটা পেরালেই গ্রাম।

বাউল কিছুই বলল না। তখনও দোলাপুর গ্রামের পথ শেষ হয় নি। চওড়া ঘেসো পথ। চলে চলে মাঝখানটায় ঘাস উঠে গেছে।

যেতে যেতে বাউল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল গ্রামটাকে ভাল করে।—দুপাশে মাটির ঘর। রাস্তার সামনে বৈঠকখানা। ওর সঙ্গে বাঁশের খুটি দিয়ে একটা করে চালা নামান হয়েছে। কারও বাইরেটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা।

কারও দরজায় গিরিমাটির রঙ দিয়ে মেয়েলি হাতের আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা রয়েছে—জয়তু জননী যে।

একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্লানমুখে।

হয়তো মেয়েটি তার স্বামীরই অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে—হয়ত নির্জন ঘরে তার মন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। তার স্বামী হয়তো—নিকটেই কোথাও তাস খেলছে, তাই বিরহিনী স্বামীসঙ্গ অভিলাষিণী তারই অপেক্ষা করছে।

এ বাড়ির বাইরের দিকে কোন ঘর নেই। তবে অনেকেরই বাইরের দিকে বৈঠকখানা রয়েছে। কোনটা ফাঁকা, বাতি জ্বলেনি এখনও —কোথায় কোন বুড়ো বসে বসে আপন মনে তামাকটানছে। আবার আবার কোথাও বসে ছোকরারা তাস খেলছে। কানে ভেসে আসছে তাদের Beat—2 heart—3 spades— ······বাউল মনে মনে হাসল—পাশের গ্রামে মানুষ মরছে কলেরায়, আর এ গ্রামের ছোকরারা নির্বিকারে তাস খেলছে।

তারা সেখানে এগিয়ে চলল দ্রুত গতিতে।

গ্রামের শেষে দাওয়ায় বসে গুটি কয়েক বুড়ো রামায়ণ পাঠ করছিল ও শুনছিল। গ্রামের পথে তিনজনকে যেতে দেখে তারা হাঁকলো—কে? কোথায়?—কোন হায়—?

তাদের সঙ্গের লোকটিই জবাব দিল—আমি শ্রীকৃষ্ণপুরের কেশব গো, মুখুজ্জে মশাই।

—কেশব? মুখুজ্জে মশায় কৌতুকে এগিয়ে এলেন।—ওখানে শুনছি মাহামারী হচ্চে?

লোকটি মাথায় মোট নিয়ে এগিয়ে গেল। বলল—আজ্ঞে হাঁ।

—কবে থেকে হয়েছে বাপু?

—আজই। দুফুর নাগাদ দুটো মারা গেছে।

বৃদ্ধ আঁৎকে উঠলেন—অ্যাঁ বল কিহে? সাংঘাতিক কথা যে? তারপর কোথা গেছলে—ডাক্তার আনতে? ওঁরা কি ডাক্তার?

—হাঁ ডাক্তার আনতেই গেছলাম। ইনারা দুজনেই ডাক্তার।

বৃদ্ধ এবার বাঁশরীর কাছে এগিয়ে গেলেন—কাছেই ত মহামারী হচ্চে এখন, আমাদের কি উপায় হবে বলেন ডাক্তারবাবু? এমন কোন ওষুধ নাই আপনার কাছে—

—সে রকম ওষুধ কোন ডাক্তারের কাছেই নেই, তবে সেনিটারীতে খবর দিয়ে কলেরার ইন্‌জেক্‌সন নিলেই অনেকটা নিরাপদ।

অন্য একজন বৃদ্ধ বলে উঠলেন—তাতেও কিছু হয় না বাবা। তাছাড়া সে ব্যবস্থাও এত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়। খবর পাঠাব—তারা আসবে সেও তিনচার দিন। উপস্থিত কি উপায় হয় তাই বলুন।

বাঁশরী হেসে বলল—উপায় আর কি বলুন! এসব রোগ খাবারের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সম্ভব মত ঢাকা দেওয়া টাটকা খাবার খাবেন আর খাবার জলটা ফুটিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা করে খাবেন। তা হলেই ভয় বেশী থাকবে না—তাছাড়া পাশের গ্রামেই থাকচি।

—ওখানের লোকে কি এই কদিনের জন্য আপনাকে নিয়ে যাচ্চে?

—নিয়ে যাচ্চেন সত্যিই তবে কিছু আমি নিই না—ঔষধ বিনা পয়সাতেই দিই।

—মুখুজ্জে মশায় হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—চায়ের ইচ্ছা হয়? বসুন জল_চা খেয়ে যাবেন।—একটু বিশ্রাম করে—

অন্য একটি বৃদ্ধ তার কথার সমর্থন করে বলে উঠল—তা বইকি, তিন চার ক্রোশ হেঁটে আসছেন। ধূমপানের ইচ্ছা আছে? ওরে কে আছিস রে—

বাঁশরী ম্লান হেসে বলল—ব্যস্ত হবেন না আপনারা, আমি বসব না। যাই, আর দেরী করব না, এক ফোঁটা ঔষধ এখনও কারো পেটে পড়ে নি। অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছে—কে জানে! বাঁশরী ব্যস্ত হয়ে ফিরল।

অন্য একজন বৃদ্ধ বাঁশরীর হাতটা ধরে টানল—আরে দাঁড়ান না মশায়। আপনার এত ব্যস্ত হবার কি আছে! শাস্ত্রেই আছে, রোগীর ঘরে খাওয়াখায়ী ওঝার ঘরে কি। চলুন চাটা খেয়ে যাবেন।

—তা হয় না, আমি চলি। আমি সে-ওঝা নই, তাহলে বিনা পয়সায় এই রাত্রে ছুটে আসতাম না। মাপ করবেন, ফেরবার সময় দেখা হবে।

আবার চলতে শুরু করল। দেলাপুর পেরিয়েই বড় মাঠ। লোকটি বলল—এই মাঠের পরই আমাদের গ্রাম। মাঠ পেরোতেই তারা একটা শ্মশানে পৌছল। এইটাই গ্রামের শ্মশান, এখানে সেখানে ছাই পড়ে রয়েছে। একটু দূরে চোখ পড়তেই লোকটি চমকে উঠল—ওখানে কাকে পুড়াচ্চে?—ভয়ে ভয়ে বলল—বোধ হয় আবার কেউ মরেছে।

বাঁশরী কিছুই বলল না। আশঙ্কায় ওর পাছুটোর গতি যেন কমে এল। বাউল অন্যমনস্কের মতো দুচোখ মেলে একবার ভাল করে দেখে নিল। চিতাটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। গুটি কয়েক লোক মাথা গুঁজে বসে রয়েছে। বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে শ্মশান ;—ওধারে গুটি কয়েক খেজুর গাছ জটলা করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, মরুস্থানের মতো। একটা পুকুরও আছে। বোধ হয় ঐ পুকুর থেকেই জল নিয়ে চিতায় জল ঢালে—নিভিয়ে দেয়—

ক্রমে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেল দৃশ্যটা একটা দীঘির উঁচু পাড়ের আড়ালে। আর এক নূতন চিত্রপট :

দীঘির নিচে তৃণাবৃত পথ। সেইটিই গ্রামের প্রবেশ পথ। গ্রামের মুখে মস্তবড় বটগাছ। লম্বা লম্বা ঝুরি নেমেছে গাছটার চারিধারে। প্রকৃতির হাতের তৈরী সুন্দর একটি ঘর যেন। ভিতরে আলো জ্বলছে। গান ভেসে আসছে গুনগুন সুরে—বোধ হয় তারের যন্ত্রও বাজছে গানের সঙ্গে সঙ্গে—

কাজ কি মা সামান্য ধনে—
ও কে কাঁদছে গো তোর ধন বিহনে
সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোনে

লোকটি সেখানে দাঁড়িয়ে ডাকল—বাবাঠাকুর ?

—কে রে কেশব ? গেরুয়া রঙের একটি আলখাল্লা পরে, পায় খড়ম দিয়ে খটখট্ করে বটবৃক্ষের কুঞ্জ থেকে বাবাঠাকুর বেরিয়ে এলেন।

—তুই কি এই ফিরছিস কেশব ? ডাক্তারবাবু এলেন ?

লোকটি ইংগিতে বাঁশরীকে দেখিয়ে দিয়ে বলল—ঐ যে এসেছেন গো ? এখন গ্রামের অবস্থা কেমন ? আশঙ্কায় গলা কেঁপে উঠল লোকটার।

ভয়ে ভয়ে বলল—শ্মশানে যে দেখলাম—

বাবাঠাকুর হেসে উঠলেন—ও পাড়ার বীন্দীবুড়ি। ও ত মরতই, না হয় মহামারীতে গেল। চল আমিও যাই, ওঁদের থাওয়া থাকার ব্যবস্থা করতে হবে ত।

গ্রামে খোঁজ নিয়ে ওরা জানল রোগী এখনও চারিটি। বাঁশরী প্রত্যেককে প্রয়োজন মতো ঔষধ ব্যবস্থা করে, সেবা যত্নের নিয়ম কানুন নির্দেশ দিয়ে রাস্তায় এসে যখন দাঁড়াল রাত তখন একটা। বাঁশরী ও বাউল সেবা করবার

জন্যে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু তাদের লোকের প্রয়োজন না থাকায় ওদের কষ্ট দিতে রাজি হয় নি।

বাবাঠাকুর প্রশ্ন করলেন—কেমন দেখলেন?

বাঁশরী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল—একটি চিকিৎসার বাইরে—সেই আপনার বুড়িটি হয়তো আর এক ঘণ্টা।

বাবাঠাকুর একটু চুপ থেকে বললেন—তাহলে চলুন, আর রাত কেন? আপনাদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করিগে।

বাঁশরী হেসে বলল—কোথায় তার ব্যবস্থা করবেন? চলুন, তার থেকে ওখানেই যাই।

বাবাঠাকুর আপত্তি করলেন—তা হয়না বাবা, ওখানে একজনেরই ভাল করে শোবার মতো ঠাঁই নেই। তাহলে রাতটা জেগেই হয়তো কাটাতে হবে, খাবারও হয়তো খুব অসুবিধে হবে।

বাউল বলে উঠল—কোন অসুবিধা হবে না আমাদের। চলুন আপনার সঙ্গে বসে বরঞ্চ একটু সঙ্গীত আলোচনা করা যাবে।

বাবাঠাকুর ম্লানমুখে বললেন—সে অন্যদিন হবে। গ্রাম ভাল হলে একদিন গ্রামের সবাই মিলে আনন্দ করব।

ওদের কোন আপত্তিই টিকল না। অগত্যা ওদের বাবাজীকে অনুসরণ করে কোন এক গৃহস্থের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াতে হ'ল। ঘরের দরজা তখন বন্ধ হয়ে গেছে—কোন সাড়া শব্দ নেই।

বাবাঠাকুর দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলেন—ও চক্রবর্তী মশায়—ও—

বাউল বাধা দিয়ে বলল—আর কেন ভদ্রলোককে এত রাত্রে কষ্ট দেবেন! ছোট ছোট ছেলেপুলে নিয়ে হয়ত ঘুমুচ্ছেন সারা দিনের দুশ্চিন্তার পর।

বাবাঠাকুর হেসে বললেন—ভদ্রলোক হলে কি উঠতে সাহস হ'ত? খাঁটি অভদ্রলোক, দেখবেন না মজাটা—

বাঁশরী সভয়ে বলল—তাহলে অনর্থক বেজে ফেলবেন কেন?

—বেজে নয়।—বাবাঠাকুর আবার জোরে জোরে ধাক্কা দিলেন—ও চক্রবর্তী মশায়? চক্রবর্তী মশায়?

খুট করে দরজা খুলে দাঁড়ালেন একটি ত্রিশ বছরের যুবক। দাঁত মুখ খিঁচে বললেন,—মশায়—ও মশায়—কেন এত রাত্তে এত চীৎকার কেন শুনি?

—দুজন ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁরা এখানে থাকবেন।

ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠলেন—এটা কি পান্থনিবাস? আর এত রাত্তে যারা গৃহস্থকে বিরক্ত করতে আসে তারা আবার ভদ্র কিসের? অভদ্র, ঘোরতর অভদ্র—বেরিয়ে যান আপনারা—

বাবাঠাকুরের হাত ধরে বাউল টানল—চলুন আপনার কুঞ্জবনেই। ওখানেই রাতটা কাটাব। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—আসুন বিনা রক্তপাতেই কেটে পড়ি।

বাবাঠাকুর ইংগিতে বাউলকে থামতে বলে বলল—কপাটা খুলে ফেলুন, মিছিমিছি রাত করছেন কেন?

চক্রবর্তী মশায় ঠোঁট উল্টে বললেন—ওঃ কি আমার নবাবপুত্তুর সব! কপাটা বন্ধ করে দেব না?

—আর আমি খুলে দেব না? পিছন থেকে একটি সুন্দরী মেয়ে এসে দাঁড়াল! বলল—আসুন আপনারা।

বাবাঠাকুর ওদের সঙ্গে করে ঘরে ঢুকল। মেঝেয় একটা খাট পাতা। এছাড়া কোন আসবাব নেই ঘরটাতে। মেয়েটি ঘরটি দেখিয়ে বলল—এ ঘরটায় থাকতে কোন অসুবিধা হবে না তো? খাটটা ঝেড়ে ফেলে বলল, —বসুন আমি চা করে আনছি!

বাবাঠাকুর হেসে চলে গেলেন—সকালে আবার দেখা হবে।

চক্রবর্তী মশায় তখনও দাঁড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু বাঁশরী বা বাউল কারও সাহস হয়নি ওর মুখের দিকে তাকাতে।

অপ্রসন্ন মুখেই তিনি প্রশ্ন করলেন—আপনারা কি পেশাদারী?

বাউল বলল—আজ্ঞে না। আতিথ্য গ্রহণ করে আপনার অন্তরে আঘাত দেওয়ার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত।

ভদ্রলোক বললেন—দুঃখ প্রকাশ করে সৌজন্য দেখান বোধ হয় আপনাদের সভ্যতার সবচেয়ে বড় Art—তাই না? বিদ্রূপ করে হাসলেন —এখানে কি অবলম্বনে আসা? না আমার ঘাড় ভাঙতেই?

বাউল কিছুই বলল না। সহ্য করার অভ্যাস ওর আছে। বাঁশরী বলল—কারো ঘাড় ভাঙব এ ইচ্ছে ছিল না। এসেছিলাম চিকিৎসা করতে। খবর বোধ হয় রাখেন না এখানে মহামারী হচ্ছে?

—ও আর এমন কি একটা খবর যার জন্যে এত আগ্রহ থাকবে? শত্তঃ

আরি ভবেৎ বৈদ্য সহস্রমারি চিকিৎসক—কটি মেরেছেন? চিকিৎসক হতে আর কত বিলম্ব মহাশয়ের?

বাউলই এর উত্তর দিল—অনেক। আর ওর দ্বারা হয়তো সম্ভবও হবে না কোনদিন।

কথা আরও হয়ত বাড়তো কিন্তু চক্রবর্তী গিন্নী এসে পড়ায় প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল।

মেয়েটি বলল—নিন, চাটা খেয়ে নিন। একে একে তিনজনকেই চা ছেঁকে দিল। তারপর ভদ্রলোককে বলল—এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ, ভিতরে চল।

—ভিতরে গিয়ে কি তোমার শ্রাদ্ধের লুচি ভেজে খাওয়াবো এঁদের?

মেয়েটি হেসে বলল—তা বেঁচে থাকতেই নিজের শ্রাদ্ধের লুচি ভেজে ওঁদের খাইয়ে যাই। মরলেও কত করবে তুমি!

ভদ্রলোকটি চটে উঠলেন—জ্যান্ত থেকে রোজ রোজ সবাইকে পিণ্ডি খাওয়াবে ভাবছো? এই যে মহামারী এসেছে, নির্ঘাৎ তোমাকে নেবে।

এরপর আলোচনা কত তিক্ততর হ'ত বলা যায় না, কিন্তু এ আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। আবার ডাক এল—চক্রবর্তী মশায়।

—কোন আদমী রে?

—আমি সনাতন গো। রায় বুড়ো যে এগুলো, একবার যে শ্মশানে যেতে হচ্ছে।

চক্রবর্তী মশায় দরজা খুললেন—মারা গেল বুড়ো! চল।

কাঁধে গামছা ফেলে যাবার জন্য দাঁড়াল। পিছন থেকে ওঁর স্ত্রী হাত ধরে টানল—তোমার যে কাল জ্বর হয়েছিল।

—বেশ হয়েছিল। জ্বর আমার বন্ধু, সে মানুষের চেয়ে বড়। সে তোমার অতিথি নয় যে দক্ষিণা পেলেই বিদায় নেবে।

মেয়েটি বড় বড় চোখ মেলে ওর মুখের দিকে তাকাল—তবুও তুমি যাবে?

—যাব না? দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন—তোমাকে পড়তে হবে না, সেটা শিক্ষা করতে হবে না?

ঘরের ভিতরে ওদের অস্পষ্ট আলোচনা বাঁশরী শুনল—বাউল শুনল। কিন্তু সনাতনের কানে পৌঁছল না। সে তখনও বাইরে দাঁড়িয়েছিল। ডাকল—কই গো খুড়ো?

—এই যে ভাইপো! চক্রবর্তী মশায় একলাই বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

বাউল খিলটা দিয়ে এসে আবার বসল।

—লোকটা strange! পাগল নাকি?

বাঁশরী হেসে বলল—এত তাড়াতাড়ি কারও সম্বন্ধে মতামত দিও না বাউল।

—কিন্তু তুজনা অজানার কাছে স্ত্রীকে এই রাত্রে ঘরে একা ফেলে চলে গেল?

—কি করলে ভাল হ'ত? না গেলে?

—তাই ভাল হ'ত না কি?

—কেন, নারীর চোখের কোণে অশ্রু জমেছে বলে? বাঁশরী হাসল—সব সময় মনের কোমলতা যা সমর্থন করে তাই ঠিক নয়।

এমনি আলোচনা হচ্ছিল ওদের। মেয়েটি ঘরে ঢুকল—খেতে দেওয়া হয়েছে। ওরা উঠে দাঁড়াল।—চলুন।

রান্না ঘরের সংলগ্ন খড়ের দাওয়ায় তুখানি আসন পেতে দেওয়া হয়েছে। ওরা গিয়ে বসতেই তুখানি থালায় খাবার আর তরকারী এনে সামনে রাখল। বলল—আপনাদের হয়তো খেতে অসুবিধা হবে।

বাউল মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল—কোমল মুখখানি। রঙের প্রখরতা নেই, গঠনের কারুকার্য নেই—তবুও মুখখানি বড় সুন্দর। পদ্ম পাপ্‌ড়ির মত বড় বড় চোখ তুখানি চল্ চল্ করছে সুন্দর মুখের উপর। একখানি স্তব্ধ সংগীত যেন।

মেয়েটি হেসে বলল—কি দেখছেন মুখের দিকে তাকিয়ে?

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বাউলের নাক দিয়ে। বলল—দেখছি চক্রবর্তী মশায়ের সঙ্গে আপনার কতখানি পার্থক্য। ভাবছি, বিবাহ আপনাদের মত তুটি ভিন্ন, তুটি আলাদা মানুষকে একত্র করে—

যেটা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল বাউলের মেয়েটিই তাই সম্পূর্ণ করে দিল। বলল—কিরকম একটা কলহ ও অশান্তির সংসার করে তুলেছে এই ত। কিন্তু এক নিমেষে কি করে বুঝলেন যে আমাদের অশান্তির সংসার? তাছাড়া আমাদের লাভ ম্যারেজ—হাসিমুখে তাকাল ওর দিকে।

বাউল মুখের লুচিটা গলাধঃকরণ করে বলল—কিছু মনে করবেন না কিন্তু। আমার মনে হয় এর থেকে জগাই-মাধাইকে প্রেম বিলান সহজ ছিল।

মেয়েটির মুখখানি হঠাৎ কালো হয়ে উঠল। বলল—আপনারা ভুল করেছেন। ওর বাইরেটাই খুব রূঢ় কিন্তু ভিতরটা বড় কোমল। যা একদিন সহজেই সাধারণভাবে চোখে পড়ত, বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকায়, আত্মীয়ের শঠতায়—নানা দিক দিয়ে নানা আঘাত খেয়ে এমন তলে পড়ে গেছে যে আজ আর মাথা খুড়লেও তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। আবার যখন প্রকাশ পায় তখন সুপ্ত ভিসুভিয়াসের মত জেগে ওঠে—উচ্ছ্বসিত প্রেম ভালবাসা লাভার মতই ছিটকে পড়ে আর্তের ওপর।···সে দিনই পাওয়া যায় তার আসল পরিচয়—সত্যিকারের তাকে—ও দেবতার থেকেও বড়। শ্রদ্ধার প্রণাম জানাল স্বামীর উদ্দেশ্যে।

বাউল লজ্জায় আর কিছু বলতে পারল না। বাঁশরী বিনীতভাবে বলল—কিছু মনে করবেন না আপনি। ওর পক্ষে আমিও ক্ষমা চাইছি। আমরা ওঁর ব্যবহারে কিছুটা ব্যথা পেলেও আপনার ব্যবহার দেখে বুঝেছিলাম ওঁর প্রকৃত পরিচয় আমরা পাইনি হয়তো।

মেয়েটি শান্তভাবে বলল—আপনাদের ক্ষমা করতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। আমাকেই আপনারা ক্ষমা করবেন। গ্রামের যে বিপদের মাঝে আপনারা সেবার ব্রত নিয়ে এসেছেন, সেই গ্রামবাসীদের তরফ থেকে আমাদের কাছ থেকে যে রূঢ় ব্যবহার এবং অনাত্মীয়তা ও অসৌজন্যের আঘাত পেয়েছেন সেজন্য আমরা লজ্জিত—আমাদের ক্ষমা করবেন। একি, আপনার পাতে লুচি নেই? খেয়াল করিনি, দাঁড়ান একটু।

ব্যস্তভাবে ঘর থেকে থালায় করে লুচি আর বাটিতে করে গরম দুধ এনে দিল। পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে ওরা দাঁড়াল। মেয়েটি গোটা দুই পান সামনে রেখে বলল—পান খানতো? বাউল কিছুই বলল না।

বাঁশরী হেসে বলল—খাওয়ার অভ্যাস নেই, তবে কেউ কোনদিন এমনি যত্ন করে দেয় নি। দিলে হয়ত অভ্যস্ত হয়ে উঠতাম। এই বলে একটা পান তুলে নিয়ে মুখে পুরল।

মেয়েটি বাউলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—আপনি নেবেন না?

বাউল কিছুই বলল না। একবার ইতস্ততঃ করল তারপর মাথা নত করে পানটা তুলে নিল।

মেয়েটি দরদী কণ্ঠে বলল—আপনি রাগ করলেন আমার কথায়? ছোট বোন যদি কিছু বলে থাকে তা বলে কি রাগ আপনার চলে? তাহলে কার উপর জোর করব বলুন? আমার নিজের ভাইবোন কেউ নেই—গরীবের মেয়ে নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে পড়তে পড়তে আপনার ঐ নিবাস ভগ্নিপতিটির সঙ্গে প্রেমে পড়ি। তারপর সংসারের হলাহল আকণ্ঠ পান করে এখানে উনি বিশ্বম্ভর, আমি—যাক আমার কথা, যদি বোনের কথায় রাগ করেন তাহলে—অভিমানে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে উঠল।

ওর কথা শুনতে শুনতে বাউলের মন অভিভূত হয়ে উঠেছিল। সস্নেহে বলে উঠল—আমি রাগ করিনি বোন?

—রাগ আমি করতে কেন দেব বলুন। কতদিন মনে হয়েছে যদি দাদা থাকতো তাহলে খবর নিত—দুটো দিনের জন্যেও হয়ত নিয়ে যেত।

বাউল ম্লান হেসে বলল—তোমার পাতান দাদাটিরও কোন ঘর নেই যে দুটো দিন তার বোনকে নিয়ে যাবে।

মেয়েটি বাঁশরীর দিকে তাকিয়ে বলল—আপনারও কি ঐ গোত্র?

বাঁশরী গম্ভীরভাবে বলল—গোত্র এক তবে মেলটা আলাদা।

মেয়েটি হেসে বলল—তার মানে?

—তার মানে দুজনেই প্রায় গৃহহারা, তবে মায়ের অনুপস্থিতে আমি বর্তমানে গৃহের কর্তা। আর উনি জনৈকা তাপসী দেবীর দোলায় ওদের সংসারের অতিথি।

মেয়েটি কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকাল—তাপসী দেবী কে ওঁর?

বাঁশরী বলল—তাপসী দেবী আমাদের গ্রামের মেয়ে, তবে ওর সঙ্গে তার Relationটার কোন Term নেই বা এ যাবৎ ঠিক করে উঠতে পারি নি।

মেয়েটি হেসে বলল—তাহলে বুঝলাম আমাদের বৌদি গোছের?

বাউল বলে উঠল—না। আপাতত: বৌদি অর্জন করে উঠতে পারে নি।

—একদিন পারবেন নিশ্চয়ই।

—কোন দিনই না। সে আলেয়া। আলো আছে কিন্তু সে আলো মানুষের থেকে দূরে থকে।

মেয়েটি ম্লান হাসল। বলল—কি জানি, সে কেমন? কিন্তু আমি এই গৃহধর্মকে অগ্রাহ্য করবার কোন যুক্তিই পাই না।

বাউল কিছুই বলল না। বাঁশরী শুধাল—আপনি খেয়েছেন?

মেয়েটি মৃদু হেসে বলল—আমরা খেয়েই তো ঘুমাচ্ছিলাম। মনে নেই বুঝি? চলুন আপনাদের বিছানা পেতে দিইগে। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের। খাটের উপর দুজনার বিছানা পেতে দিয়ে বলল—এবার শুয়ে পড়ুন, আমি আসি।

বাউল বলল—হাঁ আসুন।

মেয়েটি বলল—আপনারা বুঝি ছোট বোনকে আপনি বলেই থাকেন?

বাউল উদাসভাবে বলল—আমার ছোটবোন নেই।

—তাই শেখেনও নি ডাকতে! এবার থেকে যেন তুমি বলে ডাকবেন।

বাউল মাথা নেড়ে জানায়—হাঁ।

বাঁশরী বলে উঠল—কিন্তু নাম ত জানি না। কি বলে ডাকব?

—আমার নাম সুনীতি। আমি যাই। আপনারা বাতি নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ুন। ভয় নেই আবার ভোরেই চা নিয়ে আসব। ভোরেই উঠতে পারেন, না বিরক্ত হবেন?

বাঁশরী হেসে বলল—অভ্যাস-টভ্যাসের বাইরে। যেমন করে চালাবে তোমার এই দাদাজোড়াটি তেমনি ভাবেই চলবে।

মেয়েটি আবার বিদায় জানাল—আসি তাহলে। তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল।

ওরা বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। পাশের ঘরের থেকে দেওয়াল ঘড়িটা আপন মনে বেজে উঠল—ঢং ঢং। দূর থেকে শেয়াল চীৎকার করছে, রাস্তার কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে—ঝিল্লি ডাকছে ঝিঁ-ঝিঁ-করে। থেকে থেকে দূরের থেকে ভেসে আসছে কাদের চীৎকার। কিন্তু নিদ্রায় ওদের চোখ জড়িয়ে আসছিল। তাই কখন ঘুমিয়ে পড়ল।

সুনীতিকে ঘুম ভাঙাতে হ'ল না। চা নিয়ে যখন সে ঘরে ঢুকল, দেখল, ওরা দুজনেও জেগেছে।

সুনীতি হাসিমুখে বলল—আপনারা জেগেছেন দেখছি?

বাউল বলল—হঁা। কে গান গাইছে?

সুনীতি স্মিতহাস্যে বলল—কে বলুন দেখি?

—গানটা যেন তোমার ঘরের থেকে আসছে, অথচ প্রাণী বলতে তোমরা দুটো। বড় সুন্দর কিন্তু গলাখানা!

বড় বড় চোখদুটি বিস্ফারিত করে সুনীতি প্রশ্ন করল—গলাটা চিনতে পারছেন না তাহলে?

—কি করে চিনব বল? এ গলার কথাত জানা ছিল না আগে। মানুষের গলা যে এত মিষ্টি, এত সুন্দর হতে পারে কানে না শুনলে হয়তো বিশ্বাস করতাম না।

—কেন মানুষের গলা বুঝি মিষ্টি হয় না?

—হয়, কিন্তু কিন্নরীর মতো Proverbial নয়। এও যেন তাই—

বাঁশরী কান পেতে ভেসে আসা গানটা শুনছিল। কোন কথাই সে বলেনি। এবার বিরক্ত হয়ে বলল—প্রশংসাপত্রটা না হয় পরেই দিও, কিন্তু এখন চুপ করত, গানটা শুনি!

বাউল চুপ করল। সঙ্গীতে অভিভূত যুবক দুটির দিকে তাকিয়ে রইল সুনীতি। পাশের ঘর থেকে গান আসছিল সুরের ঢেউ-এ ঢেউ-এ।

সুরে লয়ে মূর্চ্ছনায় সঙ্গীত যেন মনকে এক কল্পলোকে টেনে নিয়ে যেতে চায়, এক ভাবরাজ্যে পৌঁছে দেয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে গান শুনছিল, হঠাৎ গান থেমে গেল। ওদের স্বপ্নের ঘোর গেল ভেঙে। চমকে উঠল বাস্তবের ছোঁয়ায়। ওরা এক সঙ্গে বলে উঠল—চমৎকার!

নিরবে সুনীতি হাসল ওদের ভাব দেখে।

বাউল বলল—সত্যই এ গান আপনার বাড়ির মধ্যেই হচ্ছে? আশ্চর্য, এ গলা কার? আপনিও এখানে, কর্তা বাড়ি নেই, আর থাকলেও—

—তাঁর রূঢ় কণ্ঠে এমন সুন্দর মিঠে সুর বের হ'ত না—এইতো?

বাউল বলল—হাঁ, তাইতো ?

—কিন্তু এ গলা তাঁরই।

বাউল বিস্ময়ে অবিশ্বাসে বলে উঠল—তাঁরই ? তাই যদি ধরে নেওয়া যায় তিনি এলেন কখন ?

—আর একটু আগে।

—কিন্তু আমরা কই জানলাম না তো ? অবিশ্বাসের ভাবটা ফুটে উঠল চোখে মুখে। সুনীতি অবিশ্বাসের কারণটা বুঝতে পেরে বলল—এছাড়া ঘরে ঢুকবার আর একটা পথ আছে। নিজের সুবিধের জন্যে অপরের অসুবিধা করা তিনি পছন্দ করেন না; তাই এ পথ দিয়ে বাইরে গেলেও পিছনের দরজায় ঘর ঢুকেছেন।

বাউল হেসে বলল—তা না হয় হ'ল। তাঁর সেই কণ্ঠ মোলায়েম হতে পারে কিন্তু এত অতুলনীয় হতে পারে তা বিশ্বাস করাবেন কি করে ?

—তা বিশ্বাস করার তাগিদও আমার নেই। একটু চুপ করে বলল—তবে বোধ হয় আমি যাদু বলে করেছি বললেই বিশ্বাস করবেন ?

বাউল হেসে বলল—তুমি হয়তো রাগ করবে কিন্তু তাই বললেও বোধ হয় এত বিস্মিত হতাম না। বরঞ্চ মনে লাগতো কথাটা।

এমন সময় ভিতর থেকে ঘড়িটা বেজে উঠল—ঢং—ঢং—ঢং—ঢং—ঢং—

বাঁশরী কান পেতে শুনল কটা বাজল—বাজা বন্ধ হ'তেই উঠে দাঁড়াল।

—পাঁচটা বাজছে, এবার সব নিশ্চয়ই উঠবো ?

সুনীতি প্রশ্ন করল—রোগী দেখতে যাবেন ?

—হাঁ দেখিগে কে কেমন আছে। বাবাজীকে বলে দিও আমি রোগী দেখতে যাচ্চি।

সুনীতি মাথা নেড়ে জানাল—হাঁ। ওদের বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখে বলল—অন্য কোথায় যেন আটকা পড়বেন না। এখানে যখন উঠেছেন তখন খাওয়ার ব্যবস্থা আমিই করব। আসবেন, ভুলে যাবেন না যেন।—পরম আগ্রহ ফুটে উঠল সুনীতির কণ্ঠে।

রোগী দেখে ফিরবার পথেই বাবাঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

বাবাঠাকুর আনন্দে দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন—রাত্রে কোন কষ্ট হয়নি ত ?

—আমি চক্রবর্তীদের ওখানে খোঁজ করে আসছি।

বাঁশরী বলল—রোগী দেখতে গেছলাম ত।

—কেমন আছে? ভালতো?

—হাঁ ভালই। রোগ সেরে গেছে।

—ভাল হবে না? নিশ্চয়ই হবে।—আনন্দে লাফিয়ে উঠল বাবাঠাকুর—আমি ভোর বেলায় মাকে দেখলাম।

বাউল চমকে উঠল—মাকে দেখলেন?

—হাঁ, মাকে দেখলাম। কাল রাত্রে আপনাদের ওখানে রেখে ফিরে গিয়ে বসে বসে খানিক গান করলাম, ঘুম আর আসছিল না। ভোরের সময় সামান্য ঘুম এল। দেখলাম মা শ্মশান থেকে লাল পেড়ে শাড়ি পরে হাতে খাঁড়া নিয়ে গ্রামের দিকে ছুটে আসছেন। আমি তা দেখে ভয়ে কাঁপছি আমার ঘরে বসে। মা নাচতে নাচতে এসে আমার দরজায় দাঁড়ালেন, ডাকলেন আমার নাম ধরে—উদাসবাবাজী। আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়ালাম। হাত জোর করে বললাম—কি মা? মা খল্ খল্ করে হেসে উঠলেন, বললেন—আমি বলি চাই—পূজা চাই—রক্ত চাই—কাল শ্মশানে আমার পূজা দে—বলি দে—না হলে মহামারীতে গ্রাম উজার করে দেব। কাল তুই জানিয়ে দে আমার আদেশ।—আমি মাথা নেড়ে বললাম—হাঁ মা। মা আর গ্রামে গেলেন না। নাচতে নাচতে আবার শ্মশানের দিকে ছুটে গেলেন।—আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেলাম। অমনি ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। তখন ভোর হয়ে গেছে—বট গাছটার ঝুরির ফাঁকে ফাঁকে উষার আলো এসে গেছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। বুঝলাম একেবারে ভোরের স্বপ্ন।

বাউল বলে উঠল—আমারও শুনে ভয় হচ্ছে বাবাঠাকুর। সবাইকে সংবাদটা দিয়েছেন ত?

—হাঁ। তখনই বেরিয়েছিলাম। সবাইকে ডেকে বললাম। ঠিক হ'ল, গ্রাম শুদ্ধ সবাই উপোস থেকে শ্মশান কালির পূজা করে পাঁঠা বলি দেব। সেই রান্না করে ভোগ নিবেদন করে সব প্রসাদ খাব। আপনারাও আজ ওখানে খাবেন। চক্রবর্তীর ঘরে বলে এলাম ওঁরাও ওখানে খাবেন। আপনারা ওঁর সঙ্গেই যাবেন। আমি ব্যবস্থা দেখিগে। এই বলে বাবাজী ব্যস্ত ভাবে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই ঢাক গর্জে উঠল—ড্যাং—ড্যাং—ডেডেং ড্যাং। বুঝা গেল পূজা খুব ধুমধামেই হবে।

ধুম করে হ'লও। চারটা ঢাক, চারটা বড় পাঁঠা। বড় বড় হাঁড়িতে করে খিঁচুরি আর মাংস রান্না করে ভোগ দেওয়া হ'ল। উৎসব শেষ হতে বেলা হয়ে গেল। যখন বাঁশরী আর বাউল ফিরল তখন সন্ধ্যা। সুনীতি প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে দেবতাকে, বাউল প্রশ্ন করল—তুমি গেছলে সুনীতি? সুনীতি হাসিমুখে বলল—হাঁ গিয়েছিলাম বৈকি।—ঘোমটার আড়ালে ছিলাম ত।

—কই চক্রবর্তী মশায়কেও ত দেখলাম না আসবার সময়?

—তিনি এসে গেছেন তো, আর কোথায় দেখা পাবেন? তিনি আমার সঙ্গেই এসে গেছেন।

—কই তাঁর অস্তিত্বত অনুভব করছি না?

সুনীতি হেসে বলল—কি করে করবেন তিনি এখন সন্ধ্যা আহ্নিক করতে বসেছেন। এখনও আধঘণ্টা তিনি ধ্যানমগ্ন, তারপর সঙ্গীত আলাপ।

বাঁশরী আনন্দিতভাবে বলল—তাহলে গানটা শুনব।

কিন্তু গান আর শোনা হ'ল না। একটা লোক এসে দাঁড়াল—ডাক্তার বাবু?

—হাঁ আছি। বাঁশরী সাড়া দিল। সুনীতি ভিতরে গেল। লোকটি পেরিয়ে এল।

গৌর বর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী। কিন্তু আতঙ্কে মুখখানার সৌন্দর্য অনেকখানা নষ্ট হয়ে গেছে। লোকটি ভাঙাভাঙা গলায় বলল—একবার যেতে হবে আপনাকে।

বাউল উদ্বিগ্নভাবে শুধাল—কি ব্যাপার?

—আমার স্ত্রীর দুবার ভেদবমি হ'ল এই মাত্র।

—খেতে গেছলেন তো? বাঁশরী প্রশ্ন করল।

—না। আজ উপাস করেছিল। যখন মেয়েরা সব খেতে গেল তখন শরীরটা খারাপ লাগছিল বলে ও শুয়েছিল। এই সন্ধ্যা থেকে হঠাৎ—

বাঁশরী ছোট ঔষধের বাক্সটা হাতে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল—চলুন।

খড়ের চালিতে একখানা মাদুরে এক গৌরবর্ণা নারী। অন্ধকার নেমেছে। মাথার কাছে একটি মাটির প্রদীপ জ্বলছে। একটি কিশোরী ডোরা দেওয়া

শাড়ি পরে মায়ের মাথায় হাত বুলাচ্ছে। ওরা প্রবেশ করতেই করুণভাবে বলল—মা আবার করলে বাবা ? ওর কথা শেষ হবার আগেই ওর মা আর একবার বমি করল। কিশোরী ভক্তিভাবে বলল—দেখলে বাবা ?

ভদ্রলোক বাঁশরীর দিকে তাকিয়ে বললেন—কি বুঝলেন ?

বাঁশরী কোন উত্তর না দিয়ে কিশোরীকে বলল—কাঁচের গ্লাস করে একটু জল আন। জল এলে এক ফোঁটা ঔষধ দিয়ে মুখে ঢেলে দিল তারপর নাড়ি পরীক্ষা করল। মেয়েটি আবার বমি করল।

কিশোরী কাঁদকাঁদ হয়ে বলল—কি হবে ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু ওরেফে বাঁশরী আর এক ফোঁটা ঔষধ খাইয়ে দিয়ে বাউলকে বলল—নাও পরিষ্কার কর। কিশোরীকে বলল—তুমি ভয় পেয়েছ, তুমি খাওয়া দাওয়া করে শোওগে। আমারাই তোমার মায়ের সেবা করব। তাছাড়া তোমার বাবা রইলেন।

ভদ্রলোক মেয়েকে সস্নেহে বললেন—তাই যাও মা, তুমি শোওগে। ডাক্তারবাবু যখন রইলেন তখন ভয় নেই।

কিন্তু ডাক্তারবাবুও মৃত্যুকে রোধ করতে পারল না। বাঁশরী ঘন ঘন ঔষধ দেওয়া সত্ত্বেও রোগের কোন উপশম হ'ল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগী মারা গেল। গ্রামের সকলে এসে জুটতেই বাউল ব্যস্তভাবে বলে উঠল—চল।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া ঘটল না। শোকার্ত গৃহস্বামী হঠাৎ পড়ে গিয়েই মহামারী কবলিত হলেন। বার কয়েক বমি করে বাঁশরীর বাক্স খোলার আগেই কোন এক অজানা দেশে পাড়ি দিলেন। ক্রন্দনের বেদনা আরও গভীর হয়ে উঠল, আরও মর্মন্তুদ হয়ে উঠল কিশোরীর বুক-ফাটা ক্রন্দন।

বাঁশরী বাউলকে বলল—চল আর নয়।

বাউল যেন আর সহ্য করতে পারছিল না। বলল—চল। দ্রুত পদে তারা সেখান ছেড়ে পথের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। বাউল একবার ভাল করে কান পেতে শুনল, বলল—না আর শোনা যাচ্ছে না। উঃ, কি করুণ বলতো ? মনে হচ্ছিল এখুনিই পাগল হয়ে যাব।

বাঁশরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল—পরপারে যাবার বিদায় অভিনন্দনটাই ত মৃত্যুকে এত কুৎসিত, এত রুদ্র, এত ভীষণ করছে—

বাউল বলল—হয়তো তাই। সংসারে মৃত্যুটা এত বড় আঘাত আর

সন্ন্যাসে মৃত্যু মুক্তি। সংসারের লোক ভয়ে ভাবনায় যাকে দেখে কৃতান্ত, মহাকাল, সেই মৃত্যুকে ত্যাগীরা দেখে সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিতে—মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান। কত সুন্দর, কত অমৃতময় সেই অজ্ঞাত অজানা মৃত্যু। সেই অমৃতের সন্ধান না পেলেও এমনি কোন একটা বেদনার ছবি যখন চোখে পড়ে হৃদয় যেন ফাঁকা হয়ে যায়। সেখানে যেন কিছুই নেই—স্নেহ নেই, প্রেম নেই—ভয় নেই—ভরসা নেই—আক্ষেপ নেই—একটা বিরাট মহাশ্মশান যেন—শুধু দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই দাবানলে পুড়ে পুড়ে মন খুব হাল্কা হয়ে যায়, কিম্বা এই ছবিকে হৃদয় থেকে মন থেকে মুছে ফেলতে সেই আগুন নিভিয়ে দিতে মানুষ শান্তির সন্ধানে ফেরে। যেমন বুদ্ধ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার আগ্রহে নিয়েছিলেন সন্ন্যাস—চেয়েছিলেন মুক্তির অনন্ত পরিধি।—

কথা কইতে কইতে যখন চক্রবর্তীদের ঘরে এসে পৌছল রাত তখন বারটার কম নয়। কিন্তু দরজা খোলা। চক্রবর্তীমশায় ও সুনীতি দুজনই জেগে। ওদের বিষণ্ণ মুখ দেখে সুনীতি শুধাল—গৌরীর মা এখন কেমন আছে—একটু ভালত? বাউল কোন উত্তর দিল না।

বাঁশরী বলল—সে এখন আমাদের হাতের বাইরে।

সুনীতি চমকে উঠল—মারা গেল? রায়ঠাকুর বড় আঘাত পাবেন।

বাউল ম্লান হেসে বলল—তাঁকেও আর আঘাত পেতে হবে না।

—তারও কি শেষ হ'ল? চক্রবর্তী মশায় হো হো করে হেসে উঠলেন। চমৎকার method আপনাদের চিকিৎসার। একেবারে দুটোকে export করে এলেন যমালয়ে? তবে ভালই হয়েছে, বৈধব্য যন্ত্রণাটা ভোগ করতে হ'ল না রায়মশায়কে। একেবারে সহমৃত। যাই বল সুনীতি, তোমরা যেমন পুরুষের আসন দখল করতে কুচকাওয়াজ করতে শুরু করে দিয়েছ, সেই সুযোগে পুরুষেরা টুপ করে তোমাদের আসন দখল করে বসেছে।—মায় সহমৃত পর্যন্ত—বলতে বলতে চক্রবর্তী মশায় হো—হো করে হেসে উঠলেন।

মানুষের দুঃসংবাদ শুনে যে তার বেদনায় সহানুভূতি না জানিয়ে আনন্দে উচ্ছ্বাসে রহস্যে কৌতুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সে কেমন লোক? কতটুকুই বা তার দরদ আর কতটুকুই বা তার প্রাণ? বিস্মিত দৃষ্টিতে বাউল একবার তাকাল ওর দিকে আর একবার তাকাল সুনীতির দিকে।

সুনীতি কিন্তু মোটেই লজ্জিত হ'ল না স্বামীর ব্যবহারে। শান্তভাবে

বলল—কিন্তু ওদের সেই অসহায় মেয়েটা গৌরীর কথা মনে পড়ে না বুঝি ?

বাউল ভাবল, সংবাদটা শুনে হয়তো মেয়েটাও মারা যায় নি জেনেই কিছুটা বিমর্ষ হবেন চক্রবর্তী। কিন্তু সুনীতির কথা শুনে মুহূর্তে ওর সমস্ত আনন্দ যেন নিভে গেল। মুখখানা কালো হয়ে উঠল। বলল—গৌরী বড় ভাল মেয়ে, আহা মা আমার কত কাঁদছে। চোখ দুটো ছলছল্ করে উঠল, বলল—না—আমি যাই। দ্রুতপদে চক্রবর্তী বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

বাউল ভেবেছিল—মেয়েটি জীবিত সংবাদেই উনি কিছুটা বিমর্ষ হলেন কিন্তু হঠাৎ তাঁর একটা নূতন রূপ ওর চোখের সামনে খুলে গেল। সে অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না। অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

সুনীতির ডাকে চেতনা হ'ল। বলল—কি বলছেন ?

—খাবেন না ?

বাউল শান্তভাবে বলল—না আমি আর খাব না।

বাঁশরী হেসে বলল—তুমি অনাহারে মরলেও গৌরীর আঘাত কিছু কমবে না।

বাউল উদাসভাবে বলল—কারু আঘাত কমাবার জন্যেত আমি খাব না বলছি না, আমার বর্তমান মানসিক অবস্থায় খেতে রুচবে না।

—রুচি না হলেও খেতে হবে কারণ খালি পেটে এসব রোগের পাশে যাওয়া উচিত নয়।

—উচিত না হলেও ত তুমি খালি পেটে রোগী attend কর।

বাঁশরী বিরক্ত হয়ে বলল—তুমি না খেলে সুনীতিও খেতে পারবে না।

সুনীতি হেসে বলল—আপনারা খেলেও আমি খেতে পারব না কারণ এতক্ষণ অতিথির অপেক্ষায় থেকে এইমাত্র খালি পেটে উনি গেলেন।

বাঁশরী অপ্রসন্ন মুখে বলল—ভুল করলেন।

সুনীতি হাসিমুখে বলল—সে সময় তাকে খাওয়ান যেত না। তাছাড়া আপনারাও যখন অনেক সময় খালি পেটেই যান—।

বাঁশরী বলল—তার জন্যে মনের দৃঢ়তা চাই—

—যেখানে দুর্বলতা সেখানেই দৃঢ়তা। কিন্তু যেখানে দুর্বলতা নেই, রোগকে যারা আমল দেয় না ? গ্রামের মানুষও আছে যারা এই মহামারীকে সামান্য

পেটের পীড়াই মনে করে। তারা ভয়ই বা করবে কেন বলুন ত, আর মনকে দৃঢ় করবার প্রশ্নই বা কি করে উঠবে ?—

সুনীতির যুক্তির খণ্ডন দেখাবার প্রবৃত্তি বাঁশরীর ছিল না। নিরুৎসাহিতভাবে বলল—তবে আজ না খাওয়াই ভাল।

সুনীতি বিস্মিতভাবে তাকাল—কেন ? আমি খাব না বলে ?

বাঁশরী চিন্তিতভাবে বলল— না। খাবার প্রবৃত্তি আমারও নেই—ক্ষিধেও নেই। তোমাকে অনুমতি দেবার জন্যই খেতে বসব ভেবেছিলাম।

সুনীতি বিস্মিতভাবে বলল—অতিথি উপোস আছে শুনলে তিনি যে রাগ করবেন।

বাউল কিছুই বলতে পারল না। নিরবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে বাঁশরী বলল—দাঁড়িয়ে থেকে রাত কর না সুনীতি। তুমি শোওগে। আমরাও শুচ্চি—

—খাবেন না একেবারে ?

—না বোন, তুমি শোওগে। সুনীতি আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে গেল।

ভোর বেলায় ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাউল বমি করল দুবার। সুনীতি চা হাতে নিয়ে এ ঘরে প্রবেশ করতেই বাঁশরী সঙ্কুচিতভাবে বলল—হঠাৎ ইনিও ভোর থেকে বমি করতে আরম্ভ করেছেন—কি করি বলুন তো ? ভয়ে সুনীতির মুখখানা কালো হয়ে গেল, সেও প্রতিধ্বনির মতো বলে উঠল —কি করি বলুন তো ? তারপর কিছুটা সামলে নিয়ে প্রশ্ন করল—ওষুধ দিলেন কিছু ?

—না, এখনও দিইনি। সামান্য জল নিয়ে এস—

সুনীতি বিলম্ব না করে বেরিয়ে গেল।

বাউল আর একবার বমি করে বলল—এখান থেকে অন্য কোথাও গেলে হ'ত না! এঁদের বাড়িতেও তো মহামারী ছড়িয়ে দেওয়া হচ্চে—

—সে সব চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। যা করতে হয় আমিই করব।

সুনীতি কাপে করে ঠাণ্ডা জল নিয়ে প্রবেশ করল—জলটা বাঁশরীর কাছে নামিয়ে দিয়ে রোগীর দিকে এগিয়ে গেল। বাঁশরী দেখে চমকে উঠল —ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?

—বমিগুলো পরিষ্কার করে ফেলি। সুনীতি বাঁশরীর দিকে তাকাল।

বাউল ম্লান হেসে বলল—তুমি পারবে না বোন। বাঁশরীই সব ঠিক করে দেবে।

—অন্য কাজে মেয়েরা অক্ষম হতে পারে, কিন্তু সেবাধর্মে পুরুষ আমাদের পিছনেই থাকবে। এই বলে বাউলের দিকে একবার তাকাল, তারপর হাতে করে বমি পরিষ্কার করতে আরম্ভ করল। বাঁশরী বাউলকে ঔষধটা খাইয়ে দিয়ে বলল—ভাল হচ্চে না সুনীতি।

—কি ভাল হচ্চে না সুনীতি? চক্রবর্তী মশায় ঘরে এসে ঢুকলেন—গৌরীকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। সুনীতির উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন—কি হ'ল? কি পরিষ্কার করছ? খাটের উপর তাকাতেই ব্যাপারটা অনুমান করলেন, বললেন—কখন থেকে?

বাঁশরী সঙ্কুচিত হয়ে বলল—এই ভোরেই—হঠাৎ—

—হঠাৎ নয়তো কি মশায় নোটিশ দিয়ে আসবে—অমি যাচ্চি বলে।

—মানে, সেইজন্যই remove করা হয়ে উঠেনি। দেখি কোথাও যদি—

চক্রবর্তী মশায় ম্লান হেসে বললেন—কেন, এখানে অসুবিটা হচ্চে কি?

—না। মানে আপনার বাড়িতে এই সংক্রামক রোগীকে নিয়ে—

বাঁশরীর কথা শুনে চক্রবর্তী মশায় অসন্তুষ্ট হলেন, গম্ভীর গলায় বললেন—সংক্রামক? কই, তার জন্তেত কোন সাবধানতা নেননি দেখচি। আমার স্ত্রী ত দেখছি দুহাতে বমি নেপছে।

বাউল ওর অপ্রসন্ন মুখখানা দেখবার ভয়ে চোখ বুজে ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগল।

বাঁশরী বিনীতভাবে বলল—আমি নিষেধ করেছিলাম ওকে বমি ঘাটতে কিন্তু—

—কিন্তু উনি তা শুনলেন না, এই তো?

—আজ্ঞে হাঁ। আমি এখনই removeএর ব্যবস্থা করছি।

চক্রবর্তী গর্জে উঠলেন—আর একবার বলুন ত কথাটা শুনি। ভাবছেন আপনারই মানুষ আর সব ভেড়া ছাগল। তারা দুধ সেবা আর অনুগ্রহ পাবারই যোগ্য, না? এই জন্তই আপনাদের মতো সভ্য মানুষের উপর আমার এত রাগ। আপনারা যাই ভাবুন এই রোগীকে নিয়ে বাড়ির চৌকাঠ যদি ডিঙিয়েছেন তাহলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব।

সুনীতি এতক্ষণ বমি পরিষ্কার করছিল বলে সে কোন কথাই বলে নি। এবার হেসে বলল—তুমি রাগ করছো কেন, কে ওদের এ দুঃসময়ে যেতে দিচ্চে ? তুমি ততক্ষণ একটু বস যা করতে হয় করবে, কিন্তু চেঁচামেচি কর না যেন। আমি একটু সরবৎ করে আনিগে। আয় গৌরী।—এই বলে গৌরীর হাত ধরে ভিতরে চলে গেল।

চক্রবর্তী মশায় বাউলের মাথার কাছে বসলেন—এখন কেমন বোধ করছেন ?

বাউল আস্তে আস্তে বলল—একটু ভালই। বাহ্য হয়নি তো।

—না।

কিন্তু একটু পরেই বাহ্য বমি এক সঙ্গেই শুরু হ'ল। চক্রবর্তী মশায় দুহাত দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগলেন।

বাঁশরী ঔষধ ঢেলে বলল—মুখটা একটু হাঁ করতো।

—আর কেন ? ওষুধ খেতে আর ইচ্ছে হচ্চে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখটা হাঁ করল বাউল। বাঁশরী ঔষধটা মুখে ঢেলে দিল। বাউল ডাকল—বাঁশরী—

বাঁশরী শান্তভাবে বলল—বল।

—ভাবছি কোথায় আমি যাচ্ছিলাম আর কোথায় এসে মরছি ! এখানে বোধ হয় আমার মাটি কেনা ছিল।

চক্রবর্তী মশায় মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—ছিঃ কেন ওসব যা-তা ভাবছেন। ভাল হবেন, ঠিক ভাল হয়ে যাবেন।

বাউল ম্লান হেসে বলল—আপনার তাই বিশ্বাস হয়।

বাঁশরী ধমকের সুরে বলল—কেন বিশ্বাস হবে না ? ভাল ত সবাই হচ্চে !

—কিন্তু গৌরীর মা আর বাবা ?

—তাদের আয়ু ছিল না। মিথ্যে ভয় পাচ্ছ কেন ?

বাউল হাসল, বলল—ভয় আমি করিনি বাঁশরী। মরণকে ভয় আমার একটুও হয় না। কিন্তু আজ কেমন যেন ভাল লাগছে, মনে হচ্ছে, কতকালের চেনা, কত অন্তরঙ্গ, কত আপনার হচ্চে এই মরণ—

সুনীতি ছানার জল আর সরবৎ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল—কি বাজে বকছেন। ঘুমান না একটু চেষ্টা করে। গৌরী গ্লাস হাতে করে সুনীতির পিছনে এসে দাঁড়াল। বাউল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে—সত্যই গৌরী !

সুনীতি বলল—মুখটা হাঁ করুন, ছানার জলটা ঢেলে দিই। জলটা মুখে ঢেলে দিয়ে শুধাল—বমির ভাবটা গেছে?

—গেছে।

তবে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন এবার।—এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। গৌরী ওর পিছু পিছু চলে গেল।

—গৌরী বড় সুন্দর তো?

চক্রবর্তী হাসলেন—আপনার কবি মন রোগ শয্যাতেও সক্রিয় দেখছি? বিয়ে করবেন? ব্রাহ্মণের মেয়ে—পিতৃমাতৃহীনা, দরিদ্রা। তাহলে আপনি সেরে উঠুন, শ্রাদ্ধের পরদিনই বিয়ে দিয়ে দেব।

বাউল হাসল—সম্ভব হ'লে করতাম চক্রবর্তী মশায়। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন আমি কিন্তু—সত্যই বাঁচব না। কিন্তু আমার ইচ্ছা বাঁশরী যেন ওকে বিয়ে করে। ও ত অবিবাহিত।

বাঁশরী হেসে বলল—বেশ তাই হবে, কিন্তু তুমি বক্‌বক্ না করে ঘুমাও।

—ঘুমোলেও কিছু হবে না ভাই। আমি বুঝেছি আমার শেষ।

চক্রবর্তী মশায় সস্নেহে বললেন—রোগ হলে ওরকম মনে হয়, ও কিছু না। শরীরটা বেশ ভাল বোধ হচ্চে ত? বমির ভাবটা গেছে ত?

—হাঁ। গা-বমির ভাবটা আর নেই তবে মনটা ভাল লাগছে না। মনে হচ্চে আলো। আবার মনে হচ্চে সব অন্ধকার। আলো আঁধারের ঢেউ এসে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্চে। আমি ভাসতে ভাসতে চলেছি—একবার ডুবছি একবার উঠছি। সব বাতাস যেন ফুরিয়ে যাচ্চে—পৃথিবী যেন চুরমার হয়ে যাচ্চে। ঘরবাড়ি গাছপালা সব পড়ে গেল, মানুষ-গুলো কোথায় চলেছে? ধূ-ধূ করছে বালু। জ্বলছে একখানি চিতা।

চক্রবর্তীমশায় বিমর্ষভাবে প্রশ্ন করলেন—মনের এরূপ সিমটমস্‌-এর কোন ঔষধ নেই বাঁশরীবাবু? বাঁশরী কিছু বলল না। বাউলের মুখের কাছে মাথা নিচু করে শুধাল—তাপসীকে খবর দেব?

—দিলে ভাল হয়।

বাঁশরী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চক্রবর্তী মশায়ের দিকে তাকাল। বলল—আমাদের গ্রামে একটা লোক পাঠাতে পারবেন?

—খুব পারবো, চিঠিটা লিখে ফেলুন। দাঁড়ান কাগজ কলম এনে দিই। কাগজ কলম আনতেই বাউল উঠে বসল—দাও আমি লিখচি।

বাঁশরী ব্যস্ত হয়ে বলল—তুমি চুপ করে ঘরে শুয়ে থাক বাউল। রোগটাকে একটু আমল দাও। আমিই লিখে দিচ্ছি যা দরকার—

—না-না-তুমি পারবে না। তাছাড়া এখন না জানালে সে কথা হয়তো আর জাননই হবে না কোনদিন।

চক্রবর্তীমশায় সস্নেহে বললেন—তাকে আসতেই লিখে দেওয়া হচ্চে যখন তখন যা বলবার তাঁর কাছেই বলবেন। তাছাড়া নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবেন। ভয় পাবেন না।

—ভয়? ভয় আমি মোটেই পাইনি। কেমন যেন আনন্দ হচ্চে—আমি চলে যাচ্চি একথা ভাবতে। ভেবে মনে দুঃখ হচ্ছে যে আপনারা মনে আঘাত পাবেন, তাপসীও খুব ব্যাথা পাবে। সুধীর শুনলে সেও দুঃখ করবে। আমার তারের একতারাটা আপন মনে মরচে ধরে ধরে একদিন ছিঁড়ে যাবে।

—খুব হয়েছে। হেগো রুগীর থুতিসার প্রবাদটাই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে তোমার বোলচালে। এখন শুয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি আরোগ্য হতে, না হয় এমনি বাড়াবাড়ি করলে আবার relapse করতে পারে। তুমি শোও। আমি লিখছি।

—না বন্ধু তা হয় না। আমি বেশ বুঝতে পারছি এখন না লিখলে আর কোনদিনই একথাটা লেখা হবে না।—এই বলে বাঁশরীর হাত থেকে কাগজ কলম কেড়ে নিয়ে লিখতে বসল। ওরা নিরবে বাউলের দিকে তাকিয়ে রইল। গতিহীনভাবে ওর কলম এগিয়ে চলল।

অনেক্ষণ পরে বাঁশরী প্রশ্ন করল—কি লিখচ এত?

বাউল হাসি মুখে বলল—সে কথা এখন বলতে পারব না। দেখ, লুকিয়ে যেন জানতে চেষ্টা কর না।

সুনীতি ঘরে ঢুকে বিস্মিতভাবে বলল—একি? তোমরা আচ্ছা ত? রোগীকে বসিয়ে গল্প জুড়েছ।

চক্রবর্তীমশায় হেসে বললেন—আমরা কি করব বল! উনি একাই একশ। আমরা কথা বলিনি বলে সেই রাগে একপাতা লিখেই ফেললেন।

সুনীতি রেগে বলল—বেশ হয়েছে, তোমরা এঘর থেকে যাওত। গৌরী তোমাদের জন্তে খাবার নিয়ে বসে আছে। আমি দেখচি একবার উনি ঘুমান কিনা।

চক্রবর্তীমশায় উঠে দাঁড়ালেন—চলুন বাঁশরীবাবু পত্রটা পাঠিয়ে দিইগে আর পেটেও কিছু দিইগে।—উনি দেখুন যদি ঘুম পাড়াতে পারেন।

—চলুন। বাঁশরীও যাবার জন্তে উঠে দাঁড়াল।

সুনীতি প্রশ্ন করল—আর কিছু ওষুধ দিতে হবে এখন?

—না এখন আর কিছু দিতে হবে না—এই বলে বাঁশরী চক্রবর্তী মশায়ের পিছু পিছু বেরিয়ে গেল। সুনীতি বাউলের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে প্রশ্ন করল—এখন কেমন বোধ হচ্চে?

—কেমন? সে আর নাইবা শুনলে বোন, তবে গাবমিটা নেই।

—বেশ, চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়ুন।

সুনীতির যত্নে ঘুম ধরে গেল। কিন্তু ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে রোগেরও ঘুম ভেঙে গেল। রোগ এবার আপন রূপ নিয়ে জেগে উঠল—ঘন ঘন কয়েকবার বাহ্য বমির সঙ্গেই বাউলের জ্ঞান লোপ পেল। বাঁশরী একদাগ ওষুধ খাইয়ে দিয়ে ওর পায়ের নিচে মাথা নিচু করে বসল। সুনীতি ময়লা পরিষ্কার করতে করতে শুধাল—কেমন বুঝছেন?

বাশরী ম্লান হেসে বলল—মন যাকে আগেই দেয় দেহের পিছু ধাওয়া করে তার নাগাল পাওয়া ভারি শক্ত।

সুনীতি কিছুই বলল না আর। চোখ দুটো থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। চক্রবর্তী বাউলের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডাকল—ও বাউলদা, বাউলদা। বাউলের সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি ম্লান মুখে বাঁশরীর দিকে তাকিয়ে বললেন—সাড়া দিচ্ছেন না যে?

বাঁশরী উদাসভাবে বলল—জ্ঞান একবার হবে, আর মরলেও এখনও দুতিন ঘণ্টা বাঁচবে।

চক্রবর্তী মশায়ের চোখদুটো ছলছল করে উঠল। ভাঙা গলায় শুধাল—আশা কি একেবারে নেই?

—খুব অল্প। শুনে চক্রবর্তী মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বাউল মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে আর একবার ডাকল—বাউল ভাই।

বাউল চোখ খুলল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—কে আপনি? বড় ভুল বুঝেছিলাম চক্রবর্তী মশায়। ভাবলাম, আপনার হৃদয় নেই; কিন্তু মরবার আগেই ভগবান আমার সে ভুল ভেঙে দিলেন। বাউল আবার চোখ বুজল।

চক্রবর্তীর চোখদুটো দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

সুনীতি প্রশ্ন করল—জ্ঞান ফিরেছে?

বাঁশরী অন্যমনস্কের মতো বলে উঠল—হাঁ, প্রদীপ নিভবার আগে যেমন জলে ওঠে। কথাগুলো শুনলেন তো, যেন উদ্ভ্রান্তের মতো। এরপর বিকারের Stage আসবে।

অল্পক্ষণ পরেই বাউল চেঁচিয়ে উঠল—সুধীর এসেছ—you are too late—একদিন তুমিই টেনে এনেছিলে, আজ তুমিই বিদায় দিচ্ছ?

বাঁশরী ডাকল—বাউল, কোথায় সুধীর? চেঁচাচ্ছ, কেন?

বাউল চুপ করল, সাড়া দিল না। বাঁশরী এক কৌটা ঔষধ মুখে ঢেলে দিল। কিছুক্ষণ পরে বাউল আবার চোখ খুলল—তাপসী এসেছে বাঁশরী?

—না এখনও আসে নি।

—কতক্ষণ পাঠিয়েছ? এতক্ষণে পাবেত?

—হাঁ এতক্ষণে পাবে। আর দুতিন ঘণ্টার মধ্যেই চলে আসবে।

বাউল হাসল—তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ, কিন্তু দেখা আর হবে না। বাউল আবার চোখ বুজল।

সুনীতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল বাঁশরীর দিকে।

—এক একবার জ্ঞান হচ্ছে—

বাঁশরী সংক্ষেপে বলল—হুঁ।

চক্রবর্তী প্রশ্ন করলেন—বাহ্য বমিত বন্ধ হয়েছে—কেমন বুঝছেন বাঁশরীবাবু?

বাঁশরী চিন্তিতভাবে বলল—বাহ্যে হবার কিছু নেই। এখন যদি বেশি রকম বিকার না হয় তাহলে গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁচতে পারে।

বাউল আবার চোখ খুলল—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি—তুমি এসেছ? আমাকে আর ফেলে যেও না···অনেকদিন তোমারই অপেক্ষা করেছি মনো।···চল ঐ কালো জলে ঢেউ দুলিয়ে দুলিয়ে চলে যাই—দুজনে ঐ কালো পাহাড়ের ঐ চুড়োটায় বসব। তুমি গান করবে, আমি শুনব—হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—আমি ডুবে গেলাম—আমাকে তোল—তাপসী—তাপসী—তা—প—সী—

আবার শান্ত হয়ে গেল। এতটুকু স্পন্দন নেই।

সুনীতি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল বাঁশরীর দিকে। বাঁশরী শান্তভাবে বলল—বিকারের ঝোঁক এখন।

চক্রবর্তী মশায় চিন্তিতভাবে শুধালেন—কেমন বুঝছেন?

বাঁশরী ম্লান হেসে বলল—এখন বুঝব কি করে বলুন! এমনি করতে করতে যদি আজ কাটে তাহলে আশাপ্রদ বলব।

সুনীতি সজল চোখদুটি মেলে তাকাল—আর ওষুধ দেবেন না?

—এরপর কোন ঔষধ দিলে তিনিই দেবেন। তবে আমাদের হাত যতটুকু তা নিশ্চয়ই করব। এই বলে এককৌটা ঔষধ ওর মুখে ঢেলে দিল।

বাউল আবার চোখ খুলল। এবার চোখ মুখ অনেকটা প্রকৃতিস্থ।

বাঁশরী ডাকল—বাউল। বাউল বাঁশরীর দিকে তাকাল, শুধাল—তাপসী আসে নি?

—না এখনও এসে পৌঁছায় নি।

—তাহলে আর দেখা হ'ল না। সুনীতির দিকে তাকিয়ে বলল—বড় কষ্ট দিলাম তোমাকে সুনীতি।

—ও আর কষ্ট কি! আপনি ভাল হয়ে উঠুন। এক চামচ ডাবের জল মুখে ঢেলে দিল—আর একটু দেব?

—না। মাথায় হাত বোলাচ্ছে কে? মাথা ঘুরিয়ে তাকাল—ও চক্রবর্তী মশায়!

—হাঁ। কিছু বলছিলেন?

— না। আর ত বাঁচব না। আমার একটা গান শুনতে ইচ্ছে যাচ্ছে বড়।

—শুনবেন?

চক্রবর্তী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল বাঁশরীর দিকে। বাঁশরী মৃদু হেসে বলল—তা একটা গানই শুনান।

চক্রবর্তী সুনীতিকে বললেন—তানপুরাটা আন ত।

সুনীতির হাত থেকে নিয়ে চক্রবর্তী তানপুরাটা হাতে দিয়েই প্রশ্ন করলেন—কিছু বরাত্তি গান গাইব, না ইচ্ছা মত?

—আপনি বরাত্তি গান গাইতে পারবেন?

—বলুন। দেখি গানটা জানি কি না?

—জানেন নিশ্চয়ই, কিন্তু বরাত্তি গান গাইবেন কিনা সেইটাই ছিল ভয়। একটু চিন্তা করে বলল—তবে গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই গানটা যেটা তিনি তাঁর মৃত্যু শয্যায় শুনেছিলেন—সম্মুখে শান্তি পারাবার—

চক্রবর্তী মশায় গান ধরলেন—

সম্মুখে শান্তি পারাবার

ভাসাও তরণী হে কর্ণধার—

গান গাইতে গাইতে আত্মমগ্ন হয়ে উঠলেন চক্রবর্তী। বাঁশরী এবং সুনীতিরও কোন দিকে খেয়াল ছিল না। গানটা যখন থামল চক্রবর্তী চোখ খুলে বাউলের দিকে তাকালেন—কেমন লাগল?

চমকে উঠলেন—একি?

বাউলের চোখদুটো জলে ভরে গেছে। মুখের শিরায় শিরায় বেদনার স্পষ্ট ছাপ।

বাঁশরী ডাকল—কোন কষ্ট হচ্ছে বাউল?

অনেকক্ষণ ডাকার পর বহুকষ্টে বলল—বাতাস যেন ফুরিয়ে গেছে।

সুনীতি চামচে করে এক চামচ জল খাইয়ে দিল। সেটুকু খেয়ে বাউল চোখ বুজল। সৌম্য শান্ত মুখ; কোথাও এতটুকু বেদনা নেই, ক্লান্তি নেই—আশঙ্কা নেই।

বাঁশরী ডাকল—বাউল? সাড়া দিল না।

সুনীতি ডাকল—দাদা। চক্রবর্তী মশায় ডাকলেন—বাউলবাবু। কিন্তু চোখ খুলল না, সাড়া দিল না।

সুনীতি বিহ্বলভাবে তাকাল বাঁশরীর দিকে—আর একটু ওষুধ দেবেন কি?

বাঁশরী ম্লান হেসে বলল—আর কিছু ও খাবে না। ওর মর্ত্যের সব স্পন্দন, সব মায়া ছিন্ন হয়ে গেছে।

শুনে সুনীতি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।

বাঁশরী চক্রবর্তীকে বলল—আর কেন? চলুন ব্যবস্থা দেখিগে।

চক্রবর্তী শ্রান্ত চরণে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাঁশরী বেদনাহীন ক্লান্তিহীন পার্থিব দেহটার দিকে তাকিয়ে ছিল—তখনও তার কানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজছিল তার কথাগুলো—ছিন্ন কথাগুলো—তাপসী এল না, তাহলে আর দেখা হ'ল না···সত্যই দেখা হ'ল না। এমনি এক একটা কথা ওর কানের গোড়ায় তারই কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল। তখনও ধ্বনিত হচ্ছিল গানের সুর—সম্মুখে শান্তি পারাবার—এতক্ষণে দৃঢ়চিত্ত বাঁশরীর চোখেও দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

—তাপসী ?

—কি মা ? কি যেন একটা আবেগ ফুটে উঠল ওর গলার স্বরে। তবে কি সে···গেছে ?

—সকালে তোর বাবা তাই শুনে এলেন।

—সেখানে যে মহামারী হচ্ছে ? ছল্‌ছল্‌ করে উঠল তাপসীর চোখ দুটো। ওর মা সস্নেহে মাথায় হাত রেখে বললেন—মন খারাপ করিসনে মা, সে আসবে। বাঁশরীও ত গেছে—ওরকম অনেকেই যায়। তাপসী মাথা নত করে রইল। ওর মা বললেন—ভয় নেই, আমি বলছি সে আসবে। একটু চুপ করে আবার আরম্ভ করল—দুনিয়ার সবার জন্মই যদি অমনি করে না খেয়ে ভাবতে থাকবি তাহলেত মুস্কিল ?

তাপসী ক্ষুণ্ণ মনে বলল—আমি জগতে সবার জন্মেত ভাবছি না মা ?

—সে আমিও জানি। কিন্তু যার জন্মে মন এত অশান্ত হয়ে ওঠে তাকে তেমনি করে বেঁধে রাখতে হয় মা। নাহলে এমনি ভোগ করতে হয়—শেষের কথায় একটা অসহিষ্ণুতার ভাব ফুটে উঠল।

তাপসী শান্তভাবে বলল—আমার ভুল হয়েছিল মা। এবার আমি মনকে তৈরী করেছি। তাপসী লজ্জায় আর কিছুই বলতে পারল না। মাথা নত করল। তাপসীর সুমতিতে ওর মায়ের মনটা আরও বেশি স্নেহার্দ্র হয়ে উঠল। তাঁরও চোখ দিয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি সস্নেহে বললেন—যা স্নান করে মায়ের পায়ে ফুল দে গিয়ে। মা সর্বমঙ্গলা ঠিক মঙ্গল করবেন।

তাপসী লালপেড়ে পাটের শাড়ি পরে পূজা শেষে যখন মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়াল তখন দরজার বাইরে একজন বৈষ্ণবীর গান শুনতে পেয়ে শুধাল—কে গান গাইছে মা ?

—ঐ যে আমাদের দরজায় দাঁড়িয়ে একজন বৈষ্ণবী গাইছে। বড় সুন্দর গাইছে। যা না একটু শোন গে দাঁড়িয়ে।

তাপসী এসে দরজায় দাঁড়াতেই গান শেষ হয়ে গেল। বৈষ্ণবী হেসে বলল—শুনবে মা, দাঁড়াও গাইছি—

বৈষ্ণবী মিঠে গলায় কীর্তন ধরল—

ধীরে চলো গো রাজনন্দিনী

গানটা শেষ হতেই তাপসী চমকে উঠল—গাঢ়স্বরে বলে উঠল—শেষ হয়ে গেল ?

বৈষ্ণবী ওর দিকে তাকিয়ে বলল—আমার রাজনন্দিনীই যে হাজির হয়েছে মা আমার গানে, তাইত গান থেমে গেল।

তাপসী বৈষ্ণবীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল উদাসভাবে, হঠাৎ দুফোঁটা উষ্ণ অশ্রুর কণা গড়িয়ে পড়ল ওর চোখ দিয়ে ।

বৈষ্ণবী বলল—মায়ের চোখে জল কেন ? স্বামী কি বিদেশে ? সিঁথিতে চোখ পড়তেই বলল—বিয়ে হয়নি বুঝি ? তাপসী কিছুই বলল না।

বৈষ্ণবী বলল—আমি অনেক মেয়ে দেখেছি মা, কিন্তু এমন সুন্দর কখনও দেখিনি। রাজনন্দিনীর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে তুলি দিয়ে এঁকেছে। তোমার চোখে জল দেখে মনে হচ্চে কত বর্ষ ধরে মা তুমিও অপেক্ষা করছ সেই বংশীধারীর ।

তাপসী চমকে উঠল। চোখের জলটা মুছে নিয়ে বলল—দাঁড়াও তোমার জন্যে চাল এনে দিই। গোটাকয়েক তামার পয়সা আর এক সরা চাল থলিতে ঢেলে দিতেই বৈষ্ণবী একবার ওর দিকে তাকাল। বলল—আর একদিন এসে তোমাকে গান শুনিয়ে যাব মা। আজ হয়ত তোমার মনটা ভাল নেই। এই বলে সে ফিরল।

তাপসী এক দৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। বয়েস হয়েছে ঢের কিন্তু বার্দ্ধক্য এখনও ওর দেহে আসন পাততে পারেনি। শুধু এইটাই তাপসী লক্ষ্য করল না, দেহ মনের এক গভীর পবিত্রতা ও স্নিগ্ধতাও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল ওর দৃষ্টির সামনে। যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারল না। শেষে সে ষ্টির আড়ালে চলে গেল। তাপসীর বুক থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে পড়ল। চোখ দুটো ভাল করে মুছে নিয়ে ভিতরে ফিরল।

ঠিক এমনি সময় দরজায় একটি নূতন লোক এসে দাঁড়াল।

—কে রয়েছেন ?

তাপসী মুখ ফিরিয়ে তাকাল—কি চাই ?

লোকটি একটু এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বলল—তাপসী কি আপনিই ?

তাপসী বিস্মিতভাবে ওর দিকে তাকাল—হাঁ আমিই। কি বলছ?

লোকটি একবার ইতস্তত: করল। তারপর কাপড়ের খুঁট থেকে একটি চিঠি বের করে তাপসীর হাতে দিল।

তাপসী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল—কার চিঠি?

লোকটি আস্তে আস্তে বলল—দেখুন।

অজানা আশঙ্কায় তাপসীর হাতটা কেঁপে উঠল একবার। তারপর তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল চিঠিটা।

প্রিয় তাপসী।

তোমাকে একটা কথা বলি বলি করেও বলা হয়নি। হয়ত তোমার আগ্রহশীল মনের অভাব অথবা আমার সংকোচ আমাকে বাধা দিয়েছে বারবার। সে কথাটা আমার শৈশবের কথা। কালের আবর্তে একদিন একথাটা সম্পূর্ণ ভুলেই গেছলাম; কিন্তু তোমার সংসর্গে এসেই আমার শৈশবের সেই পুরাতন স্মৃতিটা মনে পড়ে গেছল। এবং তোমার ঘরে তোমার দিদির ছবিটা দেখে সেই পুরাতন স্মৃতিটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আমার মনে। মনে পড়ে যায় আমি দীর্ঘদিন আগে কোন এক শৈশবে খেলার ছলে বিয়ে করেছিলাম একটি কিশোরীকে, এক ছোট্ট বালিকাকে। সেদিন তাকে চিনলেও নামটা মনে পড়েনি, কিন্তু আজ মনে পড়ছে। তার নাম ছিল 'মনো'—ডাক নামই হয়ত। অন্য নাম আমার জানা ছিল না। ও গেছল ওর মামার বাড়ির গ্রামে। আমিও দৈবচক্রে গৃহত্যাগী হয়ে সে সময় ওর মামাদের গোপালক। তাদের সেই অমানুষিক পরিবেশে সেই ছোট্ট মনো একদিন তার হৃদয়ের স্নেহ ডালি ভরে এনেছিল আমার জন্যে। কিন্তু সে সুখ বেশি দিন রইল না। একদিন সে জানাল সে ফিরে যাবে নিজের পিত্রালয়ে। আমি তাকে ছেড়ে দিতে চাইনি। তাকে ধরে রাখব বলে তার কপালে সিঁদুর দিয়ে এঁকে দিলাম আরেকটা চিহ্ন। কিন্তু অধিকারের ফতোয়া দিয়েও তাকে ধরে রাখা গেল না। ভয়ে ভয়ে আমিও পালালাম সেখান ছেড়ে, আর সেও বোধ হয় গিয়েছিল তার পিত্রালয়েই ফিরে।

তারপর অনেক দিন কেটে গেল। ঘটনার আবর্তে, চিন্তার ধারায়, কর্মপ্রবাহে ও কালের স্রোতে সে স্মৃতির এক কানাকড়িও মনে ছিল

না, একটুকরো কালো মেঘের মতও ছিল না মনের কোথাও। তারপর বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল সন্ন্যাসী বাউলের। কিন্তু তোমার আকর্ষণ আমাকে সন্ন্যাস জগৎ থেকে টেনে তুলল, আমি তোমাকে ভালবাসলাম। সেদিন সে পথ ছেড়ে প্রেমের পথে এলাম তোমার খোঁজে, কিন্তু তোমাকে পেলাম না। তোমার সূত্র ধরেই, তোমাকে ভালোবেসেই ঘোলা আবর্তে খুঁজে পেয়েছিলাল আমার শৈশব জীবনের সেই স্মৃতি, কিন্তু নামটা সেদিনও মনে পড়েনি, মুখখানাও কল্পনার সাহায্যে গড়তে পারিনি। তার মুখখানা স্মৃতিপথে হঠাৎ একদিন খুঁজে পেলাম যেদিন তোমার বোনের সেই ঝুলানো ছবিটা দেখলাম। সেই মুখ, সেই নাক, সেই চোখ। সেদিন মিলিয়ে নেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তোমার তরফ থেকে তেমন আগ্রহ ছিল না, প্রাথমিক সম্ভাবনাতেই ছিল অনেকটা অনৈক্য। তাই খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে রেখায় রেখায় মিলিয়ে নেবার প্রেরণা পাইনি। তবুও কেমন যেন সন্দেহ ঐ বুঝি আমার মনো। মনে হচ্ছে শৈশবে তুমিও ত অমনি ছিলে। যদি তুমিই তোমার মাতুলালয়ে গিয়েছিলে, তোমারই তখন নাম ছিল মনো, তুমিই আমার গলায় মালা দিয়েছিলে—কেন এমন কি হয় না? এমন কি হতে পারে না? আমি তোমায় ভালবাসি তাপসী! তোমারই টানে আমি আবার ফিরে এসেছিলাম মানুষের মধ্যে, কিন্তু তোমার নাগাল পেলাম না। হয়ত মনটা তোমার একদিন পাল্টাবে, কিন্তু আমি হয়তো তখন থাকব না। আমি চললাম। কোনদিন আর দেখা সম্ভব হবে না বলেই আজ সব কথা খুলে লিখছি।

আর একটা কথা জেনে রেখো, মনো যেই হোক, যেখানেই থাক তার উপর আজ হয়তো কোন জোরই খাটবে না সেই স্মৃতিকে অবলম্বন করে। সে হয়তো নূতন সংসারে নূতন গৃহিনী। তাছাড়া আমি সেই স্মৃতিকে অক্ষয় মনে করলেও খুব বড়ও মনে করি না। কিন্তু প্রেম সকলের বড়। সেই প্রেম দিয়েই আমি তোমাকে ভেঙেছি তোমাকে গড়েছি। আজ সেই স্নিগ্ধ শুভ্র অপার্থিব প্রেমেই তোমাকে জানিয়ে যাচ্ছি পরপারে যাবার আগে—

জানি তুমিও ভালবাস। তুমি যে সুর শুনেছিলে আমার একতারায়, আমি সেই সুর শুনেছি তোমার প্রাণে তোমার প্রেমে। তোমার সেই গান, সেই প্রেম আমার শয্যাকে যেন ঘিরে রয়েছে। তুমি এসো।

জানি, তুমি আমার অন্তিম ডাকে আসবে কিন্তু দেখা হয়তো আর হবে না। মহামারী আমাদের উপর একটা মহামারীই করে গেল। মৃত্যু শয্যায় পড়ে তবুও বলছি, তুমি এসো। ভগবানকে বলছি. তিনি যেন আমাদের শেষ দেখাটা করান। ভালবাসা নিও। বিদায় দিও।

ইতি—বাউল।

স্খলিত হয়ে চিঠিটা তাপসীর হাত থেকে পড়ে গেল। চোখ দুটো অন্ধকার হয়ে উঠল অশ্রুর কানায় কানায়। শিউরে শিউরে উঠল ওর দেহটা। হয়তো পড়েই যেত উল্টে। সামলে নিয়ে বলল—বেঁচে আছে ত?

তাপসীকে কাঁদতে দেখে বৃদ্ধ সস্নেহে বলল—ভাল আছে মা—কাঁদতে হবে না। কে হয় তোমার?

—স্বামী !! ঝর্ ঝর্ করে কেঁদে ফেলল তাপসী।

লোকটি সান্ত্বনা দিল—কাঁদতে হবে না মা, আমি নিজে দেখে এসেছি তিনি ভাল আছেন, গল্প করছেন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। তিনি নিজে হাতেই চিঠি লিখে দিলেন। একটু থেমে আবার বলল—মা, তাহলে আমি যাই।

তাপসী সজল চোখে বলল—কি বলব, তুমি যে দুঃসময়ে রহস্য সমাধানের সংবাদ আনলে তোমাকে ঠিক মতো অভ্যর্থনা করতে পারছি না।

বৃদ্ধ সংকুচিত হয়ে উঠল—আমি যাই মা।

তাপসী ব্যস্ত হয়ে বলল—আমি যাব তোমার সঙ্গে।

বৃদ্ধ বিস্মিতভাবে তাকাল—বাড়িতে না জানিয়েই যাবে মা? এতদূর রাস্তা হেঁটে যেতে পারবে?

—খুব পারব। তুমি চল, দেরী কর না। তাপসী ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তাপসীর মা এদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে এগিয়ে এলেন—কে তাপসী? কে এসেছে? ওকি, তুই কাঁদছিস কেন?

—মা! তাপসী ওর মাকে জড়িয়ে ধরল। উষ্ণ অশ্রুতে বুকটা ভিজিয়ে দিল ওঁর। বলল—তুমি পড়ে দেখ মা চিঠিটা, যদি ইচ্ছা হয় যেও। যার জন্যে যার প্রতীক্ষায় আমি বিয়ে করিনি সেই আমার স্বামীই হ'ল তোমাদের সেই বাউল। কিন্তু সে শুভ সংবাদ যেদিন সে জানিয়েছে সেদিন সে মৃত্যু শয্যায়। মা আমি যাই—

—কোথায় যাবি তুই? বিস্মিতভাবে তাকালেন ওর মা।

—তোমার জামাইয়ের কাছে। আশীর্বাদ করো যেন তাকে ফিরে পাই।

—অপেক্ষা কর মা, আমি গাড়ি দেখি। আমিও যাব—

—না মা দেরী আমি করতে পারব না। আমি হেঁটেই যেতে পারব। বাধা দিও না মা—না হয় তুমি পিছুতে গাড়ি নিয়ে এস। এই বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে বেরিয়ে পড়ল লোকটির পিছু পিছু।

যত তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে ভেবেছিল তাপসী তত তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারল না। প্রকৃতির সৌন্দর্য, সৌরভ, বৈচিত্র্য—মাঠের শ্যামল শস্য, বৃক্ষরাজির স্নিগ্ধ ছায়া তার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ না করলেও পদে পদে পথের বন্ধুরতা, মাঠের শক্ত মাটি তার গতিকে প্রতিহত করছিল। মধ্যাহ্ন সূর্য মধ্য গগনে উঠল—বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিল ওর চোখে মুখে। তৃষ্ণায় ওর গলা শুকিয়ে উঠল, তবুও চলার বিরতি দিল না ওরা।

লোকটি মৃদুভাবে বলল—মা তুমি আর চলতে পারছ না, তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি কিছু খাওয়া হয়নি। ঐ সামনের পুকুরটায় জল খেয়ে খেজুর গাছটার নিচে একটু জিরিয়ে নেবে মা।

তাপসী ম্লান মুখে, শান্ত কণ্ঠে বলল—না আমার তেষ্টা পায়নি।

বৃদ্ধ সস্নেহে বলল—না মা, তা হয় না, তোমার মুখ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।

তাপসী চলতে চলতে অশ্রুপূর্ণ চোখদুটো মেলে তাকাল লোকটির দিকে বলল—আমি সেখানে না পৌঁছান পর্যন্ত কিছুই মুখে দিতে পারব না। তুমি আমাকে শিগগির নিয়ে চলো সেখানে—তাপসী পরম ব্যাকুলতার সঙ্গে বলল কথাগুলো।

লোকটি আর কোন অনুরোধ করতে পারল না। ব্যাকুলভাবে এগিয়ে চলল তাপসী। পথ, ঘাট, মাঠ কোন কিছুই সে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল না। যে গ্রামের উপর দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিল সেই গ্রামবাসীদের মন্তব্য পর্যন্ত কানে পৌঁছাল না ওর। ক্লান্তি, শ্রান্তি—সব ব্যর্থ হয়ে গেছে ওর একাগ্রতার কাছে। শুধু অবিশ্রান্তভাবে এগিয়ে চলল।

যখন তারা গ্রামের মাঠে এসে পৌঁছাল তখন বেলা যায় যায়। দিনমণি অস্তাচলের পথে। তার রক্তিম আলো জানায় বিদায় সম্ভাষণ। লোকটি বলল—ঐ যে এসে গেছি মা। ঐ যে বটগাছটার পাশ দিয়ে রাস্তাটা গ্রামে গিয়ে ঢুকেছে।

তাপসী ব্যগ্রভাবে বলল—ঐ ঝোঁপঝাড়টাই বুঝি গ্রাম ?

যখন বটগাছটার কাছে এসে পড়ল তখন দেখল বাইরেটায় বসে তানপুরার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাবাঠাকুর গান গাইছে—

মন, জান না কি ঘটবে ঠেলা।
যখন উর্দ্ধবায়ু রুদ্ধ করে পথে তোমার দিবে কাঁটা।
আমি দিন থাকতে উপায় বলি দিনের সুদিন বেটা।
ওরে শ্যামা মায়ের শ্রীচরণে মনে মনে হওরে আঁটা।
পিঞ্জরে পুষেছ পাখী, আটক করবে কেটা।

লোকটিকে দেখে বাবাঠাকুর প্রশ্ন করলেন—তাপসী মা এলরে ?

—হাঁ বাবাঠাকুর। ঐ যে আসছেন পিছনে। আঙুল দিয়ে পিছনের দিকে দেখাল। একখানি লালপেড়ে গরদের শাড়ি পরে মূর্তীমতী দেবী। পথক্লান্ত শীর্ণ উদ্বিগ্ন মুখখানায় এমন এক স্বর্গীয় রূপ প্রকাশিত হয়ে উঠেছিল যে মুগ্ধ বিস্ময়ে বাবাঠাকুর তাপসীর দিকে তাকিয়ে ছিল।

তাপসী এগিয়ে এসে প্রণাম করল—বাবা !

—মা এলি ? বাবাঠাকুরের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল—কিন্তু তাকে যে আর ধরে রাখা গেল না মা। বড় দেরী হয়ে গেল। তুই এলে সে নিশ্চয়ই বাঁচতো। তুই যে দেবী। তোর হাতে কি সে মরতে পারে কখনো ? কিন্তু সমস্ত কথাটা শুনবার আগেই তাপসী চেতনা হারিয়ে লুটিয় পড়ল।

মুখে চোখে জল দিয়ে ঝাপ্‌টা মারতেই তাপসী চোখ মেলল—তাকে কি আর দেখতে পেলাম না ? দর দর করে চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুর কোঁটা।

—বাবাঠাকুর প্রশ্ন করলেন—কে হয় মা তোমার ?

—স্বামী।

—স্বামী ? চমকে উঠল বাবাঠাকুর। যার এমন স্ত্রী সে কেন মরল মা ? কেন মা তাকে ছেড়ে দিয়েছিলি এখানে আসতে ?

উদাস দৃষ্টি মেলে তাকাল তাপসী।

—কি করবো বাবা, সে যে আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই চলে এসেছিল ?

—বুঝেছি মা। নিয়তির ডাক। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাবাঠাকুর।

—তাপসী প্রশ্ন করল—বাঁশরী কোথায় ?

—সে শ্মশানে গেছে—বাউলকে নিয়ে গেছে।

—এখন গেলে কি দেখতে পাব না ?

—কেন মা, তুমি কি ওখানে যাবে ?

—হাঁ।

—তবে চল।

যখন তারা শ্মশানে পৌঁছাল চিতা তখন সাজান হয়ে গেছে—মৃতদেহ একধারে নামান। বাঁশরী, চক্রবর্তী এরা সব তাপসীর অপেক্ষায় বসেছিল। তাপসীকে দেখেই বাঁশরী উঠে দাঁড়াল—তাপসী এলে!

তাপসী কোন উত্তর দিল না, ব্যগ্রদৃষ্টি মেলে একবার চারদিকটা দেখল। বাউলের মৃতদেহটা চোখে পড়তেই উন্মাদের মতো ছুটে গেল। নতজানু হয়ে মুখের কাছে মুখ রেখে বসে বলল—তুমি অপেক্ষা করতে পারলে না! চিঠি পেয়ে তোমার তাপসী এসেছে।—এই বলে কোলের উপর তুলে নিল ওর মাথাটা। বলল—দেখ, একবার শুধু দেখ, তাপসী তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্তে এসেছে। ওগো ওঠ, ওগো চোখ খোল—ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল তাপসী।

বাঁশরী পিছনে এসে দাঁড়াল। বলল—আর কেন, ওকে ছেড়ে দাও। অনেক্ষণ এরা অপেক্ষা করে বসে আছেন। তাপসী ওর কথায় কান দিল না, সে আপন মনেই বলে চলল—তোমার চিঠিতে যা জানতে চেয়েছো আমি তাই বলতে এসেছি, একবার শুধু উঠে বস। একবার শুধু চোখ মেল—একবার শুধু শুনে যাও, তোমার মনো মরেনি—সে বেঁচে আছে···সে আমিই—সে তোমার এই তাপসীই। কেন তুমি এতদিন একথা গোপন করেছিলে ? কেন—কেন—কেন ? কি দোষ করেছি আমি ? তাপসী ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল আবার।

চক্রবর্তী মশায় বললেন—বড মর্মন্তুদ হয়ে উঠছে বাঁশরীবাবু।

বাঁশরী তাপসীর হাতটা ধরে টানল—তাপসী!

কি ?—অশ্রুকণার অন্তরালে চোখের মণিদুটো ঝক্‌ঝক্ করে উঠল।

—আর কেন ?—ওকে ছেড়ে দাও।

—তুমি জ্ঞানী, তুমি সব জান, তবু কেন মিথ্যে দেহকে আঁকড়ে থাকবো বাঁশরী ? ওর কোল থেকে টেনেনিয়ে ওরা ধরাধরি করে চিতায় চাপিয়ে দিয়ে বাঁশরীকে প্রশ্ন করল—মুখাগ্নি কি হবে ? উনি কে হন ?

বাঁশরী তাপসীকে প্রশ্ন করল—মুখাগ্নি কে করবে?

—স্ত্রীর কোন কর্ত্তব্যই তো বেঁচে থাকতে করিনি, এটাও কি করব না বলছ?

বাঁশরী বিস্মিতভাবে তাকাল—তুমি ওর স্ত্রী?

—হাঁ। সে অনেক কথা। ছোট বেলায় ও আমাকেই বিয়ে করেছিল সিঁদুর আর গঁড় ফুলের মালা দিয়ে।

—চিঠিতেই বুঝি সে রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে।

—হাঁ।—মুখাগ্নি করতে অগ্রসর হলেও মুখের দিকে তাকিয়ে মুখে আগুনটুকু আর ঠেকাতে পারল না। বলল—না—না—আমি পারব না?

বাঁশরী সস্নেহে বলল—মনকে দৃঢ় কর, রাই।

তাপসী জোর করে হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে মুখে আগুনটুকু ছুঁইয়ে দিল। তারপর চীৎকার করে চিতার উপর পড়ে গেল। তাপসীর যখন জ্ঞান হ'ল চিতা তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। চক্রবর্ত্তী মশায় প্রজ্বলিত চিতাবহ্নির পানে তাকিয়ে তাকিয়ে একমনে গান গাইছেন,—

আজ কোন ধন হতে বিশ্বে আমারে
কোন জনে করে বঞ্চিত
তব চরণ কমল রতন রেণুকা
অন্তরে আছে সঞ্চিত।
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে
মর্ম মাঝারে শল্য বরষে
তবু প্রাণ মন পীযুষ পরশে
পলে পলে পুলকঞ্চিত।

গান যখন থামল তখন চিতাও নিভে এল। তাপসী চোখের জলে ভাসছিল, নির্বাপিত বহ্নির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অস্ফুট স্বরে বলে উঠল—সব শেষ হয়ে গেল!

বাঁশরী পাশেই বসেছিল। বলল—হ্যাঁ রাই, এজগতের সব শেষ হয়ে গেল ওর। তবে যদি পরলোক বলে কিছু থাকে—

—সে জন্তে আমার দুঃশ্চিন্তা নেই।

বাঁশরী বলল—চল এবার একটু করে জল চেয়ে নিভিয়ে ফেলি।

তাপসী একবার প্রদক্ষিণ করে দাঁড়াল। হাতের চুড়ি কগাছা চিতায়

ফেলে দিয়ে শাকের উপর আঘাত মেরে ভেঙে ফেলল, তারপর এক কলসী জল এনে চিতার উপর ঢেলে দিয়ে বলল—ওঁ শান্তি!—ওগো নিষ্ঠুর, শুধু নিজের বুকের আগুনটুকু নিভিও না, আমার বুকের আগুনটুকুও নিভিয়ে দিও।—এই বলে এক মুঠো ছাই নিয়ে নিজের সারা অঙ্গে ভরে নিল।

বাঁশরী বিস্মিতভাবে বলল—ওকি করছ রাই।

তাপসী ম্লান হেসে বলল—এরপর এইতো আমার ভূষণ হ'ল।

বাঁশরী কিছুক্ষণ নিরব থেকে বলল—আর কেন, এবার ফিরে চল।

—কোথায়?

—কেন এখানেই। চক্রবর্তী মশায়ের বাড়িতে।

চক্রবর্তী মশায় বললেন—হাঁ। তাপসীদেবী আজ বড় ক্লান্ত আপনি।

—এ ক্লান্তি আমার কোন দিনই ঘুচবে না চক্রবর্তী মশায়—মিছেমিছি আপনাকে কষ্ট দেব না। অঙ্গে যখন ছাই মেখেছি তখন ঘর আর বাঁধবো না। তবে মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে।

বাঁশরী বিস্মিতমুখে বলল—কিন্তু আজকের রাতটা?

—পথে। গ্রামে ফিরবার পথে যেতে যেতেই রাত কেটে যাবে।

—তুমি আবার এত পথ হাঁটতে পারবে

—না পারলে মরব। তুমিও চল না সঙ্গে। বাউলকে ত চিতায় তুলে দিলে, যদি পার আমাকেও দিও দয়া করে। বেদনার অভিমানে চোখ দুটো ছলছল করে উঠল—যাবে আমার সঙ্গে?

এক মুহূর্তে কি ভাবল বাঁশরী। তারপর বলল—না রাখ, আমি যেখানের মাটিতে বাউলকে রাখলাম সে মাটি ছেড়ে একদিনের জন্যেও আর কোথাও কোন কারণেই যাব না।'

বিদ্রূপ করে উঠল তাপসী—আদর্শের কি মোহ যে সে সত্য তুমি রক্ষা করতে পারবে বাঁশরী? তা হয় না।

বাঁশরী ম্লান হেসে বলল—সে আমিও বুঝি, রাই। এখানের এক পিতৃমাতৃহীনা গৌরী নাম্নী এক কিশোরীকে আমি বিয়ে করছি।

—আশীর্বাদ করি সুখী হও। বাঁশরীর দিকে তাকিয়ে বলল—তবে আমি যাই।

—একাই যাবে?

—সঙ্গে আর কে যাবে বল?

যে বৃদ্ধটি সঙ্গে করে এনেছিল সেই বলল—মা আমিই যাব। তাপসী খানিকটা এগিয়ে গিয়ে, আবার ফিরল।

—বাঁশরী, আমার যে কোন কথাই জানা হ'ল না ?

বাঁশরী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল—কি জানবে ?

—কখন মারা গেল, কে সেবা করল, কোন কষ্ট পেয়েছিল কিনা ?

বাঁশরী সস্নেহে বলল—কোন অযত্নই তার হয়নি, রাই। সুনীতি প্রাণ ঢেলে তার সেবা যত্ন করছে।

—সুনীতি কে ?

—চক্রবর্তী মশায়ের স্ত্রী। বড় ভাল মেয়ে। তুমি আজ থেকে যাও না, তার সঙ্গে পরিচয় করে যাবে। সব শুনে যাবে তার কাছে।

তাপসী ম্লান হেসে বলল—কি আর শুনব বল, আমার আশা আকাঙ্খা, স্বপ্ন সাধ সবই যখন ছাই হয়ে গেল তখন আর ঘরে ঢুকব কোন সাহসে বল। সুনীতিকে দেখবার ইচ্ছা হয়ত ছিল, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজনও আমার ছিল, কিন্তু তার আর সাহস হ'ল না। সে আমার হয়ে চক্রবর্ত্তীমশায়ই জানিয়ে দেবেন।

চক্রবর্ত্তীমশায় বিস্মিতভাবে বললেন—বোধ হয় আজ থেকে গেলেই ভাল হ'ত।

—না, তা হয় না চক্রবর্ত্তীমশায়। আমি যাই—

কিন্তু যাওয়া হ'ল না। তাপসীর মায়ের গাড়ি এসে পৌঁছাল। ব্যস্তভাবে তিনি নেমে এলেন—তাপসী !

—মা ! ভাঙ্গা গলায় বলল তাপসী।

মা শুধালেন—সে কেমন আছে মা ?

—সে আর নেই মা। থর থর করে ওর ঠোঁট মুখ চোখ কেঁপে উঠল। বলল—এইমাত্র তার শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে আসছি মা।

ওর মা ব্যাকুল ভাবে ডেকে উঠলেন—তাপসী !

—মা !

মা তাপসীকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। নিরীক্ষণ করে হাতমুখ দেখলেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—তোর অলঙ্কার কি হ'ল মা ? গায়ের ছাই উঠিয়ে শুধালেন—ছাই মেখেছিস কেন মা ? এই দেখব বলেই কি বেঁচে ছিলাম। আমার কত আদরের তুই তোর এ বেশ আমি

কেমন করে সইব। না-না তাপসী আমি তোকে এবেশে কেমন করে দেখব! তুই এ-রূপ নিয়ে আমার কাছে আসিস না। আমি তোকে ফুল দিয়ে অলঙ্কার দিয়ে—না-মা তাপসী—তাপসীকে বক্ষে জড়িয়ে সোহাগ স্নেহে নিষ্পেষিত করে তুললেন। নয়নের জলে ওর রুক্ষ চুলগুলো সিক্ত করে তুললেন। হাত দিয়ে তাপসীর ম্লান মুখখানি তুলে ধরে ডাকলেন—মা তাপসী।

—কি মা?

—বল, তুই অলঙ্কার পরে আবার তেমনি করে সাজবি?

তাপসী ম্লান হেসে মাকে বলল—পারবে মা সাজাতে?

—তাই কি কেউ পারে মা হয়ে! কিন্তু আর এখানে কি, চল বাড়ি যাই এই গাড়িতেই।

তাপসী নীরবে গাড়িতে চড়ে বসল। চক্রবর্তী মশায় গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—আজ আর ফিরে যাওয়া হয় না মা।

—কিন্তু তাপসীর কি আর মন টিকবে এখানে এক মুহূর্তও। তাপসীই দেখুক ভেবে।

তাপসী কিছু বলার আগেই চক্রবর্তী গ্রামের দিকে গাড়ি ফিরিয়ে দিলেন।

বাঁশরী বলল—কই রাই আপত্তি করলে না বড়। যেখানটায় শুয়ে তিনি দেহ রেখেছেন, যাঁর হাতে এককোঁটা জল খেয়ে পৃথিবীর সব খাওয়াই বন্ধ করেছেন সেই তীর্থক্ষেত্র সেই দেবীকে দেখবার সৌভাগ্য হয়ত আর হ'ত না কোনদিনই!

তাপসী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বাঁশরীও আর কিছুই বলল না। ঘুন্টি বাজিয়ে গাড়ি গ্রামে ঢুকল।

সকাল বেলায় তাপসীর মা গাড়ি ছাড়বার হুকুম দিলেন। সুনীতি পথ আগলে দাঁড়াল—না মা এখন যাওয়া হবে না আপনার। সারারাত না ঘুমিয়ে না খেয়েই কেটেছে, আজ সকাল সকাল চারটি কিছু মুখে দিয়ে তবে যেতে পাবেন।

তাপসীর মা বললেন—তোমার মত মেয়ে যেখানে সেখানে ত দুদিন শান্তিতে কাটিয়ে যাবারই কথা মা, কিন্তু এখানে আর থাকতে বলো না মা। আমি যাই।

তাপসী ম্লান হেসে বলল—মাকে যেতে দিন দিদি, আমিত রইলাম আমাকে ভাল করে খাওয়াবেন কিন্তু।

তাপসীর কথা শুনে সুনীতির চোখদুটো বেদনায় ছলছল করে উঠল। ওর মা বিস্মিতভাবে শুধালেন—তুই আবার কার জন্যে থাকবি। তোর বাবা এতক্ষণে অস্থির হয়ে উঠেছেন তোর জন্তে।

তাপসীর চোখদুটো ছলছল করে উঠল—বলল, তা জানি মা, তোমরা দুজনেই আমার হাতে-পায়ের শেকল।

—তবে চল্। দেরী করিসনে। ওঠ।

কিন্তু তাপসীর উঠবার লক্ষণ দেখা গেল না। সুনীতি সকরুণ দৃষ্টি মেলে তাকাল ওর দিকে। তুমিও উঠছ কেন ?

—তুমিও আমাকে তাড়িয়ে দিচ্চো দিদি ?

সুনীতি এগিয়ে এসে চুমো খেয়ে বলল—তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছা হয় না। মনে হচ্চে, যাকে চোখের সামনে চলে যেতে দেখলাম তারই স্বপ্নঘেরা আমার এই পরম আদরের বোনটিকে আমার হৃদয় ঘিরে আটকে রাখি। বলতে বলতে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল সুনীতির চোখ থেকে।

তাপসী সুনীতির বুকে মাথা রেখে বলল—আমি এখন তোমার হৃদয় জুড়েই রইলাম দিদি।

ওর মা গাড়ীর ছইয়ের ভিতর থেকে ডাকলেন—তাপসী!

তাপসী সুনীতিকে ঠেলে দিল—বল না দিদি।

সুনীতি শান্তভাবে জানাল—ও আমার কাছেই এখন রইল মা।

—তবে তাই রেখ মা। তোমার কাছে রেখে আমি নিশ্চিন্তেই যেতে পারব। মা তুমি আমার মেয়ের চেয়েও বড়, যেন কোথায় তোমাকে একদিন হারিয়ে ছিলাম মা! চোখ দুটো থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

তাপসী সুনীতির কানে কানে বলল—মায়ের চোখে জল পড়ল যে বড়।

—আমার জন্তে। মা যে আমার—

তাপসী হাসল—হয়েছে। মা কাঁদল তার মেয়ের জন্তে, অবশ্য আমার জন্তে নয়, মায়ের আর একটি মেয়ে ছিল। সে ডুবে মরেছে জলে। সে ছিল অনেকটা তোমারই মতো। ঐ চোখ—ঐকথা—

সুনীতি হেসে বলল—সেতো আমিই গো।

—সে আমিও চিনেছি। তাপসী ও মুখখানি কোলের কাছে টেনে নিয়ে চুম্বন এঁকে দিল ওষ্ঠে।

সুনীতির নয়নাশ্রুর মাঝে ফুটে উঠল এক ঝিলিক শুভ্র হাসি।

তাপসীর মা শেষবারের মতো জানালেন তার বিদায় সম্ভাষণ—মা তাপসীকে দেখো, বড় খেপা মেয়ে ওটা।

সুনীতি ঘাড় নেড়ে জানাল—হাঁ।

গাড়ি ঘুন্টির শব্দ করতে করতে এগিয়ে গেল।

তাপসী অপস্রয়মান গাড়িটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল। তার চোখের কানায় কানায় জমে উঠেছিল অশ্রু।

সুনীতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—আর কেন বোন, এবার ঘরে চল।

তাপসী ঘুরে দাঁড়াল—চল যাই।

বিকাল বেলায় তাপসী সুনীতির সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে পাটের লাল পেড়ে শাড়ি, গায়ে মুখে ছাই, হাতে বাউলের পরিত্যক্ত একতারা। সুনীতি কাজ বন্ধ করে তাপসীর দিকে তাকাল বিস্মিতভাবে—একি বোন—একি করেছ? তাপসীর হাতে একতারাটার দিকে তাকিয়ে হাসল—মাথা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি?

তাপসী শান্তভাবে বলল—না—আমি বিদায় নিতে এলাম।

—বিদায়? কোথায় যাবে তুমি? হাসল সুনীতি।

—রহস্য নয় দিদি। তাপসী স্পষ্ট করে বলল—সত্যই আমি যাব।

—কিন্তু আমার অনুমতি না নিয়েই? ছলছল্ করে উঠল সুনীতির চোখ দুটো।

—তোমার অনুমতিই তো নিতে এসেছি।

—কিন্তু অনুমতি ত নাও পেতে পার? যাও অনুমতি পাবে না।

—না দিদি আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে। আমাকে মিথ্যে ধরে রাখতে পারবে না।

—কিন্তু মা কি মনে করবেন? চিন্তিত হয়ে উঠল সুনীতি—তখন যে বড় বললে, যাব না। দাঁড়াও তোমার দাদাকে গাড়ি দেখতে বলি।

তাপসী হাসল—গাড়ি কি হবে? কতদূর যাবে?

—কেন? বিস্মিতভাবে তাকাল সুনীতি।

—আমি ঘরে যে যাব না দিদি, এবেশে কি ঘরে যাওয়া যায়!—দীর্ঘশ্বাস ফেলল তাপসী। একটু থেমে আবার আরম্ভ করল—বহুদূরে চলে যাব আমি। পথ ঘাট মাঠ সব পিছে ফেলে নদী পেরিয়ে কালো পাহাড়ে সেইখানে চলে যাবো সেখানে দুঃখ নেই, ভয় নেই, আশঙ্কা নেই—দেহ নেই—কিছু নেই—আছে শুধু আনন্দ।—বলতে বলতে ঝক্ ঝক্ করে উঠল তাপসীর চোখ দুটো।

সুনীতি বলল—কিন্তু সেখানেও শান্তি খুঁজে পাবে না। সেত তোমার হৃদয়েই আছে, তোমার মনেই আছে। মনের আকাশে, মনের বাতাসে আর মনেরই বন্ধুর উর্বর উচ্চ নীচ বিস্তৃত পরিধির মধ্যেই তাকে খুঁজে নিতে হয় ভাই। তার জন্য ছাই মেখে বাইরে বেরুতে হয় না।

—দিদি? অসহায়ভাবে তাকাল তাপসী।—আমাকে বাধা দিও না, আমাকে যেতে দাও দিদি। বুকে যে আগুন জ্বলছে বাতাসে ছুটাছুটি করে সে জ্বালার একটু নিবৃত্তি করতে দাও দিদি।

সুনীতি হাসল—আগুন তাতে আরও জ্বলে উঠবে ভাই। জ্বালাও তাতে বাড়বে। তাপসী ছল ছল করে তাকাল ওর দিকে অসহায় দৃষ্টিতে।

সুনীতি হাসিমুখে বলল—তাহলে কি হবে ভাই। যেতে তোমাকে কিছুতেই দেব না।

—না, না, দিদি আমাকে সংসারের এই কারাগার থেকে মুক্তি দাও। ভুলতে দাও তোমাদের বাউলকে—মাকে-বাবাকে—এই বেদনাক্লিষ্ট সমাজকে, সংসারকে। যেন তাঁকেই ডাকতে পারি, তাঁরই পায়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পন করতে পারি।

—পারবে তুমি ? সুনীতি জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

—যদি না পারি, কথা দিচ্ছি আবার তোমার কাছে ফিরে আসব।

—তুমি নিশ্চয়ই যাবে ? আমাদের সবাইকে ছেড়ে ?

—হাঁ দিদি।

—কিন্তু তোমাকে আমার কাছে রেখেইত মা নিশ্চিন্ত মনে গেছেন বোন ? সে বিশ্বাস আমি কেমন করে ভঙ্গ করব বল ? রুদ্ধ বেদনায় চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল সুনীতির গলার স্বর গাঢ় হয়ে উঠল। বলল—তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর তাপসী। আমার কথা শোন।—তাপসীর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল আবেগে।

তাপসী ম্লান হেসে বলল—তোমার কাছে আর থাকছি না কোথায় দিদি ? তোমার হৃদয়তো শুধু ঐ পাঁজরার হাড় কখানার নিচে আবদ্ধ নেই—আর এখানের মাটিতেই সীমাবদ্ধ নয়। তোমার হৃদয় জগৎ জুড়ে আসন পেতে আছে।তুমি হেসে উড়িয়ে দিলেও আমার বিশ্বাস তাতে কিছুমাত্র নষ্ট হবে না। তোমাকে এত ছোট করে আমি কোন দিনই ভাবতে পারবো না দিদি।

সুনীতি কিছুই বলল না।

তাপসী বলল—কি, যেতে পারি তাহলে ?

সুনীতি কেঁদে ফেলল—তোমাকে কি দিয়ে বাঁধব বল ? স্রোতকে বাঁধ দিয়ে বাঁধা যায় কিন্তু মুক্তিকে যুক্তি দিয়ে বাঁধা যায় না। প্রার্থনা করি তোমার যাত্রা শুভ হ'ক।

তাপসী মাথা নত করে সুনীতির পায়ের ধুলো নিল।

সুনীতি প্রশ্ন করল—তোমার দাদার সঙ্গে দেখা কর, দেখ তিনি আবার কি বলেন ?

তাপসী হাসল—ভয় আমার তাঁদের নয়, ভয় ছিল তোমাকেই।

—ভয় আবার কিসের ? চক্রবর্তী মশায় বলতে বলতে এসে দাঁড়ালেন ওদের আলোচনার মধ্যে। হেসে বললেন—তাপসীদেবীর দর্শন প্রার্থী হয়ে জনৈক অনিমেষবাবু ও রমাদেবী এসেছেন। তাঁদের কি এখানেই নিয়ে আসব ?

তাপসী হেসে বলল—না। তিনি নিজেই বাইরে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

—তথাস্তু। চক্রবর্তী মশায় ফিরতে উদ্যত হলেন।

সুনীতি প্রশ্ন করল—ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিলে বুঝি?

তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন—কেন?

—তাপসীর নব বেশটাও চোখে পড়ল না?

চক্রবর্তী মশায় তাপসীর দিকে একবার তাকালেন, হেসে বললেন—একি বেশ তাপসীদেবী? তাপসী মাথা নত করল।

সুনীতি বলল—তাপসী সংসার ত্যাগ করছে।

—কবে? কোথায় উঠবে?

—যদি উঠবেই কোথাও তবে যাবে কেন? ও শুধু চলবে আর চলবে। যাত্রার কোন বিরতি থাকবে না ওর সেই চলা পথের পথিকের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত।

চক্রবর্তী মশায় কোন প্রতিবাদ করলেন না। শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ওর দিকে। বলল—সত্যি যাচ্চ?

—হ্যাঁ। নত হয়ে প্রণাম করল তাপসী। বলল—বিদায় দিন।

—বিদায়? চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল চক্রবর্তী মশায়ের। একটু থেমে বলে উঠলেন—হাঁ বিদায়। তুমি এসো, ওঁরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যস্তভাবে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

তাপসী সুনীতির সঙ্গে যখন পথে এসে দাঁড়াল অনিমেষ আর রমা এসে ওর পায়ের ধূলো নিল।

তাপসী সংকুচিত হয়ে উঠল—পায়ের ধূলো কেন অনিমেষবাবু?

—আপনি কোথায় যাচ্চেন?

—তাও জানি না।

—তবে কেন যাচ্চেন?

—মন কেন বলছে, কে তোমাকে ডাকছে বহুদূরে-বহুদূরে। থেকে থেকে কানের কাছে শুনছি, সেই সুর যা একদিন শুনেছিলাম বাউলের একতারায় সেই সুরই যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, ডাকছে আমাকে বহুদূর থেকে বহুদূরে পায়ের নিচে ফেলে যেতে এই নিরানন্দময় পৃথিবীকে—মৃত্যুর রুদ্ধ কপাট ভেঙে ঘন অন্ধকারময় ঐশ্বর্যের মাঝে চির অমৃতের সন্ধানে। আজ বাউলের মাঝেই আমি তাঁকে দেখেছি আমার বাউলকে। আমার কানের কাছে ধ্বনিত হচ্চে বার—বার—

সৎ অসৎগময়ো—
অসতো তমসো মাজ্যোতির্গময়
অমৃতং মৃত্তগময়—

থেকে থেকে কেবলই মনে হচ্চে আমি যাই—কে যেন ডাকছে আমাকে সেই মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করবার জন্তে।

অনিমেষ হঠাৎ বলে উঠল—আপনার মতো নারী সংসার ছাড়লে সংসারের বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে তাপসীদেবী।

তাপসী হাসল—তা আর কই হচ্চে অনিমেষবাবু। হঠাৎ ব্যস্তভাবে বলে উঠল—না আমি যাই। দেরী হয়ে যাচ্চে।

তাপসী সবাইকে পিছে ফেলে হাঁটতে শুরু করল।

পিছন থেকে রমা ডাকল—তাপসীদি ?

তাপসী ঘুরে দাঁড়াল—ডাকছ ?

—আমাদের আশীর্বাদ কর। এক সঙ্গে দুজনে প্রণাম করল।

তাপসী ম্লান হেসে বলল—অনিমেষবাবু, রমাকে কেউ গ্রহণ করেনি জেনে গেলে হয়তো মনটা চঞ্চল হ'ত ওর কথা মনে পড়লে। সুধীরকে অনুরোধও করেছিলাম, সে রাজিও হয়েছিল। ইতিমধ্যে তোমরা দুজনে যে পরস্পরকে গ্রহণ করেছ তা জেনে সুখী হলাম। সুধীর এলে বলো তাপসী যাবার আগে তার আদেশ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারপর সুনীতির দিকে তাকিয়ে বলল—দিদি এবার তুমি ফিরে যাও। আর এদেরও ফিরে যেতে বল।—এই বলে তাপসী আবার হাঁটতে শুরু করল। কেউ আর সঙ্গে যেতে সাহস করল না। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুনীতি একদৃষ্টে তাকিয়েছিল তাপসীর দিকে—অবিন্যস্ত কেশকলাপ, পরনে গৈরিক রঙের পট্টবস্ত্র, হাতে বাউলের একতারা। খালি পায়ে পথের ধুলো উড়িয়ে উড়িয়ে এগিয়ে চলল তাপসী। ক্রমেই যেন ওর চলার গতি বাড়ছে।

ক্রমেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে উঠছে তাপসী ওর চোখের সামনে। আকাশে একখানি চাঁদ উঠেছে—ম্লান আলোয় এগিয়ে চলেছে তাপসী দ্রুতপদ-ক্ষেপে। বাতাসের মুখে ওর চুলগুলো নাচছে, কাপড়ের [illegible] গৈরিক পতাকার মতো উড়ছে ওর পেছনে। যেন মহাপ্রস্থা[illegible] নবীনা তাপসী। সুনীতি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল [illegible] কালে ওর দৃষ্টি অস্পষ্ট হয়ে উঠল।